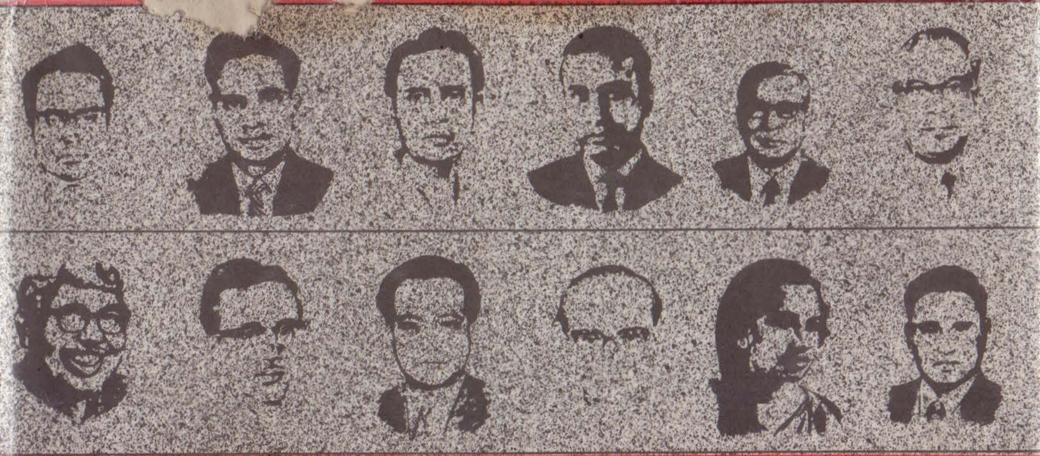


বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি



ISBN 984-401-025-0

প্রথম প্রকাশ
ফাল্‌গুন ১৩৯৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

প্রকাশক
ওসমান গনি
আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন ২৮২৩৯৮

বর্ণবিন্যাস
সুন্দরম
৮ নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

মুদ্রণে
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
৬/১০ পি. সি. ব্যানার্জী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ১০০ টাকা

BUDDHIJIBI HATYA KANDER NEPATHEY. (Behind the Assassination of Intellectuals—An analytical review.)
By: Major (Rtd.) Rafiqul Islam. psc
Published by Osman Gani Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka 1100. Phone 282398

প্রয়াত ফরাসি বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মালরো,
যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে
অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন
এবং বাংলাদেশের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সামরিক জান্তার রাজনীতি
১৯৭১ ঢাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ
একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে
প্রতিরোধের প্রথম প্রহর
এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী
বাংলাদেশঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট
স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-১৯৯০
রূপালী চন্দ্রাতপে
গোলকের কাহিনী
Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh.
Genocide in Bangladesh: Harrowing Accounts of Some Eye-witness and the Press (Edited).

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর। আনন্দের ঢল নেমেছে সারা বাংলাদেশে। রাজধানী ঢাকা পরিণত হয়েছে বিজয় মিছিলের নগরীতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, বাংলার মাটিতে পরাজিত হয়েছে দখলদার পশুশক্তি। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ বিজয় ছিনিয়ে এনেছে বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণেরা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছে বাংলার আকাশ-বাতাস। দীর্ঘ নয় মাসের অবরুদ্ধ জীবনের সকল নির্যাতনের অবসান হয়েছে, ভীত-সন্ত্রস্ত জনগণ ফেলছে পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস। সমগ্র দেশবাসী যখন বিজয়ের আনন্দে বিভোর, ঠিক তখনই এলো সেই মর্মান্তিক খবর।

১৮ই ডিসেম্বর সকাল। বিজয় দিবসের মাত্র দু'দিন পরে। রায়েরবাজারের কাঁটাসুরে ও মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে আবিষ্কৃত হলো মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস বধ্যভূমি। শতাব্দীর জঘন্যতম এই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের খবরে বিজয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে সমস্ত ঢাকায় নেমে এলো বেদনার অতলান্ত ছায়া। স্বাধীনতার আনন্দকে গ্রাস করলো কান্নার রোল।

ঢাকা শহরের কয়েক শত বুদ্ধিজীবীকে ঘাতকেরা মুক্তির পূর্বক্ষণে ধরে নিয়ে যায়। পরাজিত হওয়ার আগে, আত্মসমর্পণের আগে, মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ এই নরপশুরা শেষ কামড় দিয়েছে বিষধর সরিসৃপের মতো। বাঙালী জাতির উত্থানে প্রতিহিংসা আর নির্মম আক্রোশের বশবর্তী হয়ে নরঘাতকেরা এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে।

রায়েরবাজার ও ধানমণ্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত থেকে অসংখ্য লাশ উদ্ধার করা হলো। অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশ। বেশির ভাগ লাশই বিকৃত—চেনার উপায় নেই। এক সপ্তাহ আগে থেকেই এঁদের অনেকেই নিখোঁজ ছিলেন, আল-বদর এঁদেরকে বাড়ি থেকে ধরে এনে বন্দি করে রেখেছিলো।

রায়েরবাজার ও মিরপুরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে সারা বিশ্বাবাসী এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের জনগণ বিজয়লগ্নে এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিন এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে লিখলেনঃ

...বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এক খাদে মরে পড়ে আছেন... বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরে মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমণ্ডির কাছে একটি ইটখোলা। এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা, যদিও নীলচে সাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়। শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন মৃত

দেহগুলো দেখার জন্য। কাদামাটির পাড় ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।

...এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা শুয়ে আছেন। তাঁদের শরীরের ওপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাঁধের ওপর একটি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটাকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে। বাঙালী জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোম্মত্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গীর্জা পরিদর্শন রত পর্যটক।

নিকোলাস টোমালিনের মূল ইংরেজি প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপঃ

BENGAL'S ELITE IN A DITCH

by Nichilas Tomalin from Dacca

Before they surrendered at Dacca on Thursday, the Pakistani Army arrested and then shot more than 50 of the city's surviving intellectuals, scientists and businessmen. It was a closely planned elimination of elite Bengali citizens, carried out as a sudden military operation. It must therefore have been done with the full knowledge of the Pakistan high command, including the commanding officer, General Niazi,

The discovery of the bodies can only increase tensions in Dacca, make revenge Killings and riots more likely, and possiiblv even cause friction between the Mukti Bahini guerrillas and the Indian Army,

If the occupying forces have to clamp down on the liberated Bangalis, they could come to resent even Indian occupation, and there are small signs of this ominous development already in Dacca.

The murdered intellectuals were discovered in some isolated clay pits on the outskirts of the town, at a place called Rayar Bazar. I actually saw 35 bodies there, in a decomposed condition which indicates they were killed four or five days ago, There are probably many more and from kidnap reports, some in Dacca are putting the number of killed as high as 150.

UPI reports that among the victims were Dr. F. Rabbi, chief cardiologist of Dacca Medical Gollege, and Dr. Munir Chowdhury, head of the Department of Bengali Language at Dacca University.

The killing ground is a brick-field beyond the middle-class Dacca district of Dhanmondi. It is an oddly desolate place, despite the water hyacinths which float on the blue-white clay pools.

Hundreds of Dacca citizens came here today, walking along the mud dykes to view the bodies, many of them looking for their own relatives.

The Kidnapping was apparently done early in the morning last Tuesday, when squads of Punjabi soldiers drove to selected addresses and took away men and women under armed guard. Probably they were taken to the Rayar Bazar brickfields and immediately shot, lined up along the mud dykes so as to fall into the pools.

There they still lie, with clay dust on them, beginning to decompose. There is one skeleton in a dyke picked dramatically bare by the Dacca dogs.

The Bengali crowds are circulating among these pools in a strange, gentle fashion, They don't seem angry here. Elsewhere they are wild. But here they were walking, talking in a gentle murmur, like tourists in a cathedral.

At one pool there was a particular large crowd and the biggest pile of corpses. Here a moslem, his mouth wrapped in his wool scarf was howling and keening. It sounded like the muezzen call to prayer.

We asked the man his name. He said he was Abdul Malik, a Dacca businessman. In the water before him he had recognised the bodies of his three brothers, Badruzzaman, Shahjahan, and Mulluk Jahan, They lay side by side. They too were Dacca businessmen. It was a family firm. He had no other brothers.

"The Pak army came for them at seven o'clock in the morning on Tuesday," he said. "Just by chance, I had gone out early."

At this moment my companion began to cry, He was a Dacca student named Najiur Rahman, who brought me to the brick-fields. He was looking for his brother-in-law.

Dr. Aminuddin is head of the Bengal Research Laboratories, with an Oxford Ph.D, and he was last seen at 7 o'clock on Tuesday morning when the Pakistan army took him away.

"I'm sorry, I must leave you, and look," said Rahman. His woollen scarf was now also around his face.

I was in Dacca for only three hours yesterday and during that time the news had scarcely spread. The crowds were excited but quite good-natured, still waving to Indian troops and racing up and down in cars. But there has been a great deal of shooting, particularly at night. Correspondents at the Intercontinental Hotel confirm that atmosphere is explosive. The Bengalis allege that the hated Biharis, those "foreigners" from across the border who long ago came to settle here because they were muslims, have been helping the Pakistani troops to murder Bengalis.

This was precisely what led to a riot and massacre of Bihari civilians in Jessore when I was there eight months ago.

This murder of Dacca intelectuals is infinitely worse than anything that happened at Jessore. Therefore some kind of retribution is almost inevitable.

Apart from swiftly gathered hearssay in Dacca, and the evidence of other journalists in Dacca that such killings have been taking place, I can offer only the evidence of the two boys who drove me back to Dacca airport. Both were Mukti Bahini. One Parvej Mamasalek, told me proudly he had been Bihari-hunting the day before.

"We heard shooting," he said,"We knew it was those Bihari bastards killing our boys. We closed in on them in a circle. Two of us with stens rushed into their house." The Biharis had climbed a tree in the garden. They shot down like crows from a branch.

১৯৭২ সালের ২রা জানুয়ারী হামিদা রহমান প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিতে গিয়ে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত ''কাঁটাসুরের বধ্যভুমি'' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেনঃ 'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে, হাত পা বাঁধা। দু'দিন পর্যন্ত লাশ দুটো ওখানে পড়েছিল, সনাক্ত হয়নি। ফর্সা বড় বড় দুটো মানুষের বীভৎস বিকৃত চেহারা এখনও ভেসে ওঠে। পরে ওখানখার বাসিন্দারা মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে।'

'আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিপিটা ছিল, তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটের চোখ বাঁধা। গামছা দুটো আজও ওখানে পড়ে আছে। পরনে কালো ঢাকাই শাড়ী ছিল। এক পায়ে মোজা ছিল। মুখ ও নাকের কোন আকৃতি নেই। যে কোন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। চেনা যায় না। মেয়েটি ফর্সা এবং স্বাস্থ্যবতী। স্তনের একটা অংশ কাটা। লাশটা চিৎ হয়ে। বীভৎস চেহারার দৃশ্য, বেশিক্ষণ দেখা যায় না। তাকে আমি চিনতে পারিনি। পরে অবশ্য সনাক্ত হয়েছে যে মেয়েটি সেলিনা পারভীন। 'শিলালিপি'র এডিটর। তার আত্মীয়রা খবর পেয়ে লাশটি তুলে নিয়ে গেছে।'

'আর একটু দুরে যেতেই দেখতে পেলাম একটি কঙ্কাল, শুধু পা দুটো আর বুকের পাঁজরটিতে তখনও অল্প মাংস আছে। বোধহয় চিল শকুনে খেয়ে গেছে কিন্তু মাথার খুলিটিতে লম্বা লম্বা চুল। চুলগুলো ধুলো কাদায় মিশে যেয়ে নারী দেহের সাক্ষ্য বহন করছে।'

'আর একটু এগিয়ে যেতেই একটা উচু স্থানে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। আমি উপরে উঠতেই একজন ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। সামনে যেয়ে দেখি নিচু জলাভুমির ভিতর এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য। সেখানে এক নয়, দুই নয়, একেবারে বারো তের জন সুস্থ সবল মানুষ। একের পর এক শুয়ে আছে। পাশে দুটো লাশ, তার একটির হৃৎপিণ্ড কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সেই হৃৎপিণ্ড ছেঁড়া মানুষটি হলো ডাঃ রাব্বি। পাশের গাদাটিতে রমনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলী আর ইত্তেফাকের সিরাজউদ্দিন হোসেন। পাশের একজন বললেন, মুনীর চৌধুরীর লাশও এখানে ছিল। কবীর চৌধুরী সকাল বেলা এসে দেখে গিয়েছেন।'

'প্রায় ঘন্টা খানেক। একে একে সবাই এসে এখানে হাজির হচ্ছে। ডাঃ রাব্বির লাশটা তখনও তাজা। জল্লাদ বাহিনী বুকের ভেতর থেকে কলিজাটা তুলে নিয়েছে। তারা জানতো যে তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তাই তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় কাৎ হয়ে দেহটা পড়ে আছে। পাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। রাব্বি সাহেবের পা দুখানা তখনো জ্বলজ্বল করে তাজা মানুষের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাক মুখ কিছুই অক্ষত ছিলো না। দস্যু হায়েনার নখের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত।'

'সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম রমনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলীকে। প্যান্ট ও গেঞ্জিতে তখনও তাজা রক্তের দাগ। কোন মানুষের গায়ে শার্ট ছিলো না, খুলে ফেলে সবাইকে গেঞ্জি পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর নৃশংস অত্যাচার করে মানুষগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পরে বুকের মাঝে গুলি ছুঁড়ে

ফেলে দিয়েছে। এক বছর এক সাথে ইয়াকুব সাহেবের সাথে কাজ করেছি। কিন্তু তাঁকেও আমি প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে পারিনি। অনেক লক্ষ্য করার পর চিনলাম, তিনি ইয়াকুব সাহেব। তিনি তো মুসলিম লীগের লোক। তবে এরা তাঁকে হত্যা করলো কেন?'

'সবাই বলে এটা সিরাজউদ্দিন হোসেনের লাশ। আত্মীয় স্বজন এই বীভৎস কঠোর বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। আজও আশা করে আছে সিরাজউদ্দিন হোসেন ফিরে আসবে। বিকেল বেলা ওখানে এক ভদ্র মহিলা এসে আমাকে বললেন, দেখুন দেখুন এটা নিশ্চয়ই সিরাজ ভাই-এর লাশ। সিরাজ ভাই ডান হাতে একটি মাদুলি পরতেন। ঐ দেখুন সিরাজ ভাই-এর হাতে মদুলিটা রয়েছে। আমাদের বাড়ির কলতলায় স্নান করতেন। এটা ঠিকই সিরাজ ভাই। তাঁর একজন সহকর্মী সম্পাদকও ঐ একই সঙ্গে সিরাজের লাশ বলে সনাক্ত করেন।'

'ঐ স্থানটি থেকে বিকেলের দিকে পর পর তিনটা লাশ তুলে পাশাপাশি চাদরে রাখা হয়েছে। তারা তিন ভাই। গোপিবাগে তাদের বাড়ি। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার আর একজন মেম্বার। তিনটি তাজা কালো পাথরে খোদাই করা সবল মানুষ। একেবারে তাজা। যেন ঘুমিয়ে আছে। এদের দেহগুলো এত বিবৃত নয়। একজনের হাতে তখনও লম্বা লাল পাথরের আংটি রয়েছে। ভদ্রলোকদের দোষ তাদের ভাগ্নে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।'

'তখনো দলে দলে নারী পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজনকে। আর একটু দূরে যেতেই আর একটা গর্তের মধ্যে প্রায় ৭-৮টা লাশ। ঠিক চেনা যায় না কার লাশ। বিকৃত বীভৎস এই লাশগুলো। প্রত্যেকটির গায়ে তখনো অত্যাচারের দাগগুলো ঘায়ের মতো দগদগ করে জ্বলছে। এমন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড যে এই বিংশ শতাব্দির যুগে ঘটতে পারে তা সভ্য মানুষের বুদ্ধির অগোচর। দু'তিন বছর আগে প্রেস ক্লাবে ভিয়েৎনামে আমেরিকান সৈন্যদের অত্যাচারের ছবি দেখেছিলাম। সে অত্যাচার মনে হলো এই বদর বাহিনীর অত্যাচারের কাছে কিছুই নয়। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে অনেক ভিয়েৎকং প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু বদর বাহিনীর মতো তারা এমন বেছে বেছে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেনি।'

'ডাঃ আলিম চৌধুরীর মতো চক্ষু বিশেষজ্ঞ একদিনে তৈরী করা যাবে না। আর শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো সাংবাদিক-সাহিত্যিকও একদিনে তৈরী করা যাবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লগ্নে এমন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত হবে একথা কেউ ভাবতে পারেনি।'

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোককে যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের যে নৃশংসতা এবং বিকৃত উল্লাসের সাথে হত্যা করা হয়েছে, ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। মৃত্যুর পূর্বে আল-বদর বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র ও বন্দিশালা মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের ওপর নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়।

মিরপুরে আজ যেখানে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে, সেই শিয়ালবাড়ি বধ্যভুমিতে নারকীয় হত্যা সংঘটিত হয়। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী বুদ্ধিজীবীদের কুচি কুচি করে কাটা হাড়ের ছবিসহ দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত হয় আনিসুর রহমানের নিচের প্রতিবেদনটি,

''সত্যি আমি যদি মানুষ না হতাম। আমার যদি চেতনা না থাকতো। এর চেয়ে যদি হতাম কোন জড় পদার্থ তাহলে শিয়ালবাড়ির ঐ বধ্যভুমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী এই দ্বিপদ জন্তুদের সম্পর্কে এতটা নীচ ধারণা করতে পারতাম না। মানুষ যত নীচই হোক তবু ওদের সম্পর্কে যে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা এমনভাবে উবে যেতো না। আর মানুষ কেন, কোন প্রাণীই কি পারে এত নির্মম, এত বর্বর, এতটা বোধহীন হতে?'

'অথবা যদি না যেতাম সেই শিয়ালবাড়িতে। তাহলে দেখতে হতো না ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায়কে। অনুসন্ধিৎসু হিসেবে যা দেখাও কোন মানুষের উচিত নয়। ওখানে না গেলে গায়ে ধরতো না এমন দহনজ্বালা। সহ্য করতে হতো না ভয়-ক্রোধ, ঘৃণামিশ্রিত এমন তীব্র অনুভুতি। সে অনুভুতি বলে বুঝাবার নয়। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়েছে ভয়ে ভয়েই বুঝি হার্টফেল করবো। ধ্বংসস্তূপের মাঝে কতক্ষণ পর পরই চোখ বুজতে হয়েছে। না, না, এ সত্যি নয়, এ স্বপ্ন, বলে দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্থিত করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আর দেখতে চাই না বলে মাটি, ভুল বললাম, মানুষের হাড়ের উপর বসে পড়তে হয়েছে। সারা এলাকায় মানুষের হাড় ছাড়া অবিমিশ্রিত মাটি কোথায়!'

'কাটাসুরের হত্যাকাণ্ডকে মোটামুটি একটা থিওরিতে ফেলা যায়। একে যে কোন হিসেবে কোন থিওরিতে ফেলা যায় না। এ তো বুদ্ধিজীবী হত্যা নয়। নয় আওয়ামী লীগের অথবা বাছাই করা আন্দোলনকারী হত্যা। ক'হাজার লোককে সেখানে হত্যা করা হয়েছে? যদি বলি দশ হাজার, যদি বলি বিশ হাজার, কি পঁচিশ হাজার তাহলে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন?' (আমাদের দূর্ভাগ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওখানে যাঁরা আত্মহতি দিয়েছেন তাদের পরিচিতি তো নয়ই, এমনকি সংখ্যা নিরূপণ করতেও কেউ আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি)। শুনেছি আর সর্বত্রই দেখেছি শুধু নরকঙ্কাল আর নরকঙ্কাল। পা বাঁচিয়ে হাড়হীন মাটির উপর পা ফেলতে পারিনি। (ক্ষমা কর শহীদ ভাই বোনেরা, দেশের জন্য আত্মদান করার পরও তোমাদের হাড় মাড়িয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। কেউ আজ পর্যন্ত তোমাদের সৎকারে এগিয়ে এলো না)। দেখেছি কুয়ায় কুয়ায় মানুষের হাড়। মাংসহীন পায়ের হাড়ে এখনও লেগে রয়েছে জুতো। কোমরের হাড়ের সংগে লেগে রয়েছে জাঙিয়াসহ টেট্রনের প্যান্ট। কঙ্কালের পাশে পাশেই পড়ে আছে আমার সতী সাধ্বী মায়ের বোরখাটি পর্যন্ত।'

'ইতিহাসে পৈশাচিকভাবে হত্যা করার অনেক কাহিনী পড়েছি কিন্তু শিয়ালবাড়িতে ঐ পিশাচরা যা করেছে এমন নির্মমতার কথা কি কেউ পড়েছেন, শুনেছেন বা দেখেছেন? কসাইখানায় কসাইকে দেখেছি জীবজন্তুর গোশতকে কিমা করে দিতে। আর শিয়ালবাড়িতে গিয়ে দেখলাম কিমা করা হয়েছে হাড়। একটা মানুষকে দু'টুকরো করলেই যথেষ্ঠ পাশবিকতা হয়। কিন্তু তাকে কিমা করার মধ্যে কোন পাশবিক উল্লাস? লাশের পাশে দেখেছি বর কনের গলায়

পরার মালা। এ থেকে এবং স্থানীয় লোকদের তথ্যাবলীতে মনে হয়েছে হত্যার আগে পিশাচরা অনেককে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে নওশা দুলহার মত সাজিয়ে এনেছে। হয়তো সেই হতভাগ্যরা ছিল সাধারণের চাইতে একটু উপরে। হয়তো বুদ্ধিজীবী, হয়তো রাজনীতিক। তাই তাদেরকে হত্যাও করা হয়েছে অসাধারণ পাশবিকভাবে।'

'নৃশংসতার বিগত ইতিহাস—তুমি হেরে গেছো ওদের কাছে। হিট্‌লার চেঙ্গিস হালাকু তোমরাও লজ্জা পেয়েছো এই পিশাচদের কাছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস তুমিও হতে পারবে না এর চাইতে নির্মম। সর্বকালের সবচাইতে মসীলীপ্ত অধ্যায়টি রচনা হয়ে গেছে এই বাংলায় এই কয়দিনে।'

'ওখানে গিয়ে প্রথমেই একটা জিনিস মনে পড়ে। কত নরপশু এই হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত ছিল? হাজার হাজার লোককে এমন ঠাণ্ডা মস্তিস্কে তো দু'দশ বা বিশ জনে হত্যা করতে পারে না। তাহলে ওরা গেল কোথায়? শিয়ালবাড়ির হত্যাযজ্ঞে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করার কোন খবরও আজ পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অনেকের ধারণা এরা এখনও ঐ এলাকায়ই রয়ে গেছে। রয়ে গেছে সশস্ত্র অবস্থায়। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, স্বাধীনতার মাস খানেক পরেও ওখানে যেতে হয়েছে পুলিশের প্রহরাধীনে। আইন যতই তাড়াতাড়ি এসে ওদের পাকড়াও করবে এমন কি আইনের জন্য হবে মঙ্গলজনক।'

আল-বদরদের অবিশ্বাস্য নৃশংসতার আর একটি দৃষ্টান্ত হল ১৯ জানুয়ারী ৭২ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটিঃ

'হানাদার পাকবাহিনীর সহযোগী আল-বদরের সদস্যরা পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর যখন পালিয়ে গেল তখন তাদের হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল এক বস্তা বোঝাই চোখ। এদেশের মানুষের চোখ আলবদরের খুনীরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।

ঘটনাটির কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের বৃদ্ধ নেতা মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল ইঞ্জিনিয়ার ইন্সিটিটিউট আয়োজিত এক সভায় তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, 'সেদিন বদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের পাশে এক বাড়িতে গিয়েছিলাম। তোলাবায়ে আরাবিয়া ও ইসলামী ছাত্রসংঘের ছেলেদের দ্বারা গঠিত এই আল-বদর বাহিনী যে অত্যাচার চালিয়েছে তার অনেক কাহিনী শুনেছি।'

বৃদ্ধ মাওলানা বলেন, 'খুনীদের এই সংস্থার নাম দেওয়া হলো আল-বদর বাহিনী। একি কোন মনঃপূত নাম? যে বদর যুদ্ধ ছিল আদর্শের জন্যে ইসলামের প্রথম লড়াই। সেই যুদ্ধের সাথে কি কোন সংযোগ এই নৃশংসতার মধ্যে ছিল?' মাওলানা বলেন, 'হানাদারদের সহযোগী এই বদর বাহিনী শুধু ইসলামের শত্রুই নয়, এ হলো জালেম।'

আল বদরদের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবীদের লাশের অজস্রতার কারণে তা দাফন করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ২০ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় কালো বর্ডার দেওয়া হেডিংয়ে মোটা হরফে লেখা একটি আবেদনে বলা হয়—'জামাতে ইসলামীর বর্বর বাহিনীর নিষ্ঠুরতম অভিযানে যাঁরা শহীদ হয়েছে তাঁদের অসংখ্য লাশ

এখনও সেই সব নারকীয় বধ্যভূমিতে, সনাক্তহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাঁরা সবাই শহীদ, তাঁরা সবাই অমর। অথচ এ'পর্যন্ত তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করা যায়নি। বর্বরদের নৃশংস অভিযানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের লাশ সনাক্তর অপেক্ষায় না রেখে অবিলম্বে দাফনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এঁরা সনাক্তের অযোগ্য হলেও লাওয়ারিশ নন এবং লাওয়ারিশ লাশের জন্য যেমন ডোম বা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম দিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়, এঁদের জন্য তা বাঞ্ছনীয়ও নয়।'

শুধু রাজধানী নয়, বাংলাদেশের সর্বত্র বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দেয়ার একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যে বাংলাদেশ আর দু'একদিন অবরুদ্ধ থাকলে কার্যকর করা হত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে একটি ইঙ্গিত প্রদানের জন্য ২৭/১২/৭১ তারিখের দৈনিক আজাদ বিরাট হেডলাইনে বড় বড় হরফে লেখে 'আর একটা সপ্তাহ গেলেই ওরা বাঙালী ·বুদ্ধিজীবীদের সবাইকেই মেরে ফেলত—বদর বাহিনীর মাষ্টার প্লান' শীর্ষক দীর্ঘ প্রতিবেদনটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

'পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যায় সাহায্যকারী দলগুলির মধ্যে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য। মওদুদী-গোলাম আজম-আবদুর রহিমের নেতৃত্বে পরিচালিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতার শুধু ঘোর বিরোধিতাই করেনি—লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে পাইকারীভাবে হত্যা করার কাজে সক্রিয় সহযোগিতাও করেছে।' ....হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যায় সহায়তা করেই জামাতে ইসলামী ক্ষান্ত হয়নি— বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তারা গড়ে তুলেছিল এক সশস্ত্র গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, বদর বাহিনী নামে যা সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের শেষ মুহূর্তে এরা বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে রাতের আঁধারে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে—এ খবর এখন সবাই জেনে গেছে। কিন্তু আর মাত্র কয়েকটা দিন সময় পেলে এরা যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার কাজে ইতিহাসের জঘন্যতম বুদ্ধিজীবী নিধন অভিযানে কামিয়াব হতো সে সম্পর্কে যথেষ্ঠ তথ্য পাওয়া গেছে।'

'মুজিব বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বদর বাহিনীর যে মুষ্টিমেয় পাণ্ডা ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে তাদের জোর জিজ্ঞাসা চলছে। এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা গেছে যে, বাঙালী জাতিকে বুদ্ধিমত্তা এবং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কারিগরী উৎকর্ষের দিক থেকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বাংলার বুকে চিরকালের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে বদর বাহিনীর পাণ্ডারা বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল করার এক মহা পরিকল্পনা রচনা করেছিল।'

'মুজিব বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা এ পর্যন্ত যে কয়জন বদর পাণ্ডাকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এ মাষ্টার প্লানের তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। বদর বাহিনীর যে সমস্ত পাণ্ডা গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে তাদেরকে পাকড়াও করতে পারলে এই মাষ্টার প্লানের আরও

অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাবে বলে মুজিব বাহিনীর হাই কম্যাণ্ড সুত্রে জানা গেছে। তারা আমাকে একথাও জানিয়েছেন যে, ধৃত পাণ্ডারা এ পর্যন্ত অনেক গুপ্ত তথ্য এখনও পর্যন্ত ফাঁস করেনি এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুরো তথ্য পাওয়া গেলে বুদ্ধিজীবী নিধনের উদ্দেশ্যে রচিত মাষ্টার প্লানের পূর্ণ বিবরণ জানা যাবে। তবে এ পর্যন্ত ধৃত কতিপয় পাণ্ডা স্বীকার করেছে যে, আর মাত্র কয়েকটা দিন সময় পেলে এরা ঢাকাসহ দেশের সকল শহরের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করত। বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের এই মহা পরিকল্পনা রচনায় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত কতিপয় অফিসার সাহায্য করে। এছাড়া সৈন্য ও আল–বদররা যাতে বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতারের কাজে সাহায্য করে সে জন্য পাক সামরিক বাহিনীর সকল বিভাগের কমাণ্ডারদের বিশেষ সাংকেতিক বার্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়।'

'রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা থেকে এপর্যন্ত ধৃত পাণ্ডাদের কয়েকজনের কাছে বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের নামের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে এরা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে তাদের অনেকেরই নাম এই তালিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এই নামগুলোর শেষ দিকে লাল কালির ক্রস মার্ক রয়েছে। মুজিব বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রের জনৈক কর্মকর্তা উক্ত লাল কালির ক্রস মার্ক–এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, যাদেরকে ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে, তাদের নামের শেষেই কেবল ক্রস মার্ক পাওয়া গেছে।'

উক্ত কর্মকর্তা আরও জানান, 'ধৃত বদর পাণ্ডাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ কারো কারো নামের নীচে লাল কালির আণ্ডার লাইন রয়েছে। অবশিষ্ট নামসমূহে কোনরূপ লাল কালির চিহ্ন নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাকে কাকে আগে হত্যা করতে হবে, তার নিশানা হিসেবেই লাল কালির আণ্ডার লাইন রয়েছে।'

'ঢাকার এক বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারকে গভর্ণর হাউসে এক সভায় আমন্ত্রণ করে নির্বিচারে হত্যা করার একটি মহা পরিকল্পনা পরবর্তীতে ফাঁস হয়ে যায়।। কোন অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারেনি। এই একই কৌশলে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে সার্কিট হাউস বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসে বিশিষ্ট নাগরিকদের আক্রমণ করে ঘেরাও করার মাধ্যমে গুলি করে হত্যা করা হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যা রহস্য তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর অন্ততঃ ২০ হাজার জনকে হত্যা করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

এ ছাড়া, আল বদর বাহিনী গেষ্টাপো কায়দায় মুখোশ পরে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করার ঘটনাও ঘটেছে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত শহরে। দেশের অন্যান্য শহরে এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের নমুনা হিসেবে ২৫/১২/৭২ তারিখের দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার একটি সংবাদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—'কুখ্যাত জামাতে ইসলামীর সংগঠন ততোধিক কুখ্যাত আল–বদর বাহিনীর হাতে কেবল ঢাকার শত শত বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার,

ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রাণ হারান নি, তাদের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত বিশিষ্ট নাগরিকও রেহাই পাননি। অন্যান্য যে সকল স্থান থেকে এ পর্যন্ত হত্যালীলার খবর আসছে, তম্মধ্যে আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়, সিলেট জেলার মৌলভীবাজার, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগাম প্রভৃতি।

'সাতই ডিসেম্বর দস্যু পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর হাতে চরম পরাজয় বরণ করার আগের দিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিভিন্ন বাড়ীতে হানা দিয়ে ডাক্তার, অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক ও উকিলসহ ৪০জন বুদ্ধিজীবীকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

'মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে শত্রুমুক্ত করার পর কুরুলিয়া খালের পাড়ে ৪০টি মৃতদেহ পান। পরের দিন আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়ে লাশগুলি যথারীতি সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। নিহত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের তরুন ও জনপ্রিয় অধ্যাপক লুৎফর রহমান এবং ঢাকা হাইকোর্টের তরুণ এডভোকেট সৈয়দ আকবর হোসেন অন্যতম।'

'এছাড়া গত ঈদুল ফিতরের পরের দিন রাতে পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যরা রাজাকার ও বদর বাহিনীর সহায়তায় ৫৫ জন তরুণ ও অন্যান্য তথাকথিত সন্দেহভাজন লোককে গ্রামের কাছে হত্যা করে।'

'দুর্বৃত্ত পাষণ্ডদের হিংস্র থাবায় বাংলাদেশ জাতীয় লীগের তরুণ কর্মী ফারুক আহমদের মৃতদেহ পরের দিন সকালে লাশের স্তুপ থেকে সনাক্ত করা হয়।'

'সিলেট জেলার মৌলভীবাজার থেকে পলায়নের পূর্ব মূহূর্তে হানাদার ও তাদের অনুচররা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করে গেছে বলে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়।'

এই খবরটি প্রেরিত হয়েছিল ২৪ ডিসেম্বর তারিখে। তারপর ক্রমশ সারা বাংলাদেশের সমস্ত শহর থেকে পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের খবর ঢাকায় এসে পৌঁছাতে থাকে।

১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে চূড়ান্ত বিজয়ের পরও দেশবাসী জানতে পারেনি এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চোখ ও হাত বাঁধা বিকৃত লাশা খানাখন্দে পড়ে আছে। ১৮ ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক পূর্বদেশে—'কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর হাত থেকে এঁদের বাঁচান'—শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'ফ্যাসীবাদী জামাতে ইসলামীর পাণ্ডাদের দ্বারা গঠিত কুখ্যাত আল-বদর বাহিনী গত কয়েকদিন ঢাকার বুকে বুদ্ধিজীবদের মধ্যে ত্রাসের রাজস্ব সষ্টি করেছিল। গত এক সপ্তাহ যাবত এই সব গণ দুশমনদের দল অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের ধরে নিয়ে মোহাম্মদপুরে তাদের সদর দফতরে আটক রেখেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।' এরপর অপহৃত বুদ্ধিজীবীদের নাম দিয়ে লেখা হয়, 'ঘৃণ্য আল-বদর বাহিনীর ঠগেরা বহুসংখ্যক সাংবাদিক অধ্যাপক প্রমুখের বাসভবনে হানা দিয়ে তাদের বাসায় না পেয়ে বাসার লোকদের ওপর অত্যাচার করে। আল-বদর গুণ্ডাদের অত্যাচারের খবর পেয়ে যেসব অধ্যাপক, সাংবাদিক বাসা থেকে অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন, তারা কোন মতে রক্ষা পেয়েছেন। নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয় স্বজনরা এসময়

পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁদের প্রিয়জনদের। অনেকেই ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে খোঁজ নেন, কেউ কেউ ১৫, পুরানো পল্টনে, ইসলামী ছাত্রসংঘের অফিসে। তাঁদের মনে ক্ষীণ আশা তখনও ছিল, হয়ত তাঁদের আপন জনেরা এ সমস্ত স্থানে বন্দী হয়ে আছেন।'

ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংস্থা ইসলামী ছাত্র সংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর এই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এক সপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়। বধ্যভূমিগুলোর ছবিগুলো দেখলে এবং বর্ণনা পড়লে মনে হয়, সে সময় এঁরা মানসিক সুস্থতা হারিয়ে উম্মাদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের সেই বর্বরতার বিবরণ সুস্থ মানুষের না পড়াই উচিত, কারণ—তাতে যে কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজেকে মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে ঘৃণাবোধ করবে। তাদের নিষ্ঠুরতার নমুনা প্রদর্শনের জন্য সে সময়কার সংবাদপত্র থেকে কয়েকটি প্রতিবেদন এখানে উল্লেখ করা হল।

সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে রাজাকার বাহিনী প্রধান ও শান্তি কমিটির লিয়জোঁ অফিসারকে নিয়ে গোলাম আজম মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে যে রাজাকার ও আল-বদর শিবির পরিদর্শন করেছিলেন, সেটি ছিল আল-বদরদের হেডকোয়ার্টার। স্বাধীনতামনা বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগকে আল-বদররা প্রথমে চোখ বেঁধে এখানেই নিয়ে আসে। নির্যাতনের পরে তাঁদেরকে রায়েরবাজার ও মীরপুরে শিয়ালবাড়িসহ অন্যান্য বধ্যভুমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। এই নির্যাতন কেন্দ্রে বন্দি ছিলেন ঢাকার গ্রীনল্যাণ্ড মার্কেন্টাইল কোম্পানি লিমিটেডের চীফ একাউনটেন্ট মোহাম্মদপুরের দেলওয়ার হোসেন। একমাত্র তিনিই রায়ের বাজার বিলের বধ্যভুমি থেকে প্রাণ নিলে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা' শীর্ষক তাঁর জবানীটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হলঃ

'১৪ ডিসেম্বর সকাল নয়টা। শান্তিবাগের আমার বাসায় আমি শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাইরে ভারী পায়ের শব্দ পেলাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন রাইফেলধারী লোক আসছে। রাস্তার দরজায় এসে তারা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল। কর্কশ স্বরে তারা বলছিল—ঘরে কে আছে, দরজা খোল।'

'তারপর নানা কথাবার্তার পর তারা আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বাসার পাশের একটি মেসের একটি ছেলেকেও তারা ধরে নিয়ে এলো। আমাদের তারা মালিবাগের মোড়ে দাঁড় করানো একটি বাসে নিয়ে তুললো। বাসে তুলেই তারা আমার গায়ের জামা খুলে ফেললো এবং একটি কাপড় দিয়ে কষে চোখ বেঁধে ফেললো। এছাড়া হাত দুটো নিয়েও পেছনের দিকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তারপর বাস ছেড়ে দিলো। পথে আরও কয়েক জায়গায় তারা বাসটি থামালো। মনে হলো আরও কিছু লোককে বাসে ওঠানো হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। অনুমানে মনে হল, বাসটি মোহাম্মদপুর দ্বিতীয় রাজধানী বা ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে।'

'এমনিভাবে ঘন্টাখানেক চলার পর বাস এক জায়গায় এসে থামলো। তারপর আমাদের হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ততক্ষণে কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছি যে, আমি বদরবাহিনীর হাতে পড়েছি। খানিকক্ষণ পর আমাকে ও অপর আরেকজনকে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এলো উপর তলায়। দরজা খুলে একটি রুমের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মেঝের ওপর। ঠিক পাকা মেঝের ওপর নয়। গিয়ে পড়লাম কিছু লোকের ওপর। অনেক কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কক্ষের আর সব লোকেরও আমার মতো হাত ও চোখ বাঁধা কিনা, শুধু বুঝতে পারছিলাম ঘরে আমার মতো আরো বেশ কয়েকজন লোক রয়েছে। এদিকে কষে বাঁধার দরুণ আমার চোখ ও কানে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে শুরু করেছি। মাথায় শুধু একটি চিন্তা—কি করে এই বর্বর পশুদের হাত থেকে আমি বাঁচতে পারি। আমি কি সত্যি বাঁচতে পারবো?'

'আল্লা' আল্লা বলে, আমি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। ভাবছিলাম বদরবাহিনীর লোকরা তো শুনেছি মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা লাইনের ছেলে। আল্লাহর আহাজারিতে যদি বদর বাহিনীর লোকদের কিছু দয়া হয়। যদি দয়াপরবশ হয়ে চোখের ও হাতের বাঁধন একটু খুলে দেয়, নিদেন পক্ষে একটু ঢিলে করে দেয়। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কে যেন আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফিসফিস করে সে বললো—'সাবধান, হাত খোলা দেখলে কিন্তু আপনাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে।' কচি কণ্ঠ। বুঝলাম অল্প বয়সী কোন ছেলে এবং সে বদর বাহিনীর কেউ নয়। আমি তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন ঢিলে করে দিলাম। বাঁধন এমনিভাবে রাখলাম, যাতে আবছা আবছা দেখা যায়। এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি, যে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল সে আট নয় বছর বয়সী একটি ছেলে। তার দুহাতের চামড়া কাটা। হাত ফোলা। সারা কক্ষে শুধু রক্ত আর রক্ত। এখানে সেখানে ইতস্তুতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে রক্তে রঞ্জিত জামা ও গেঞ্জি। আমার মত প্রত্যেকের গায়েই গেঞ্জি। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে কাটা ছোঁড়ার দাগ। হাতের বা পায়ের আংগুল কাটা, কারো দেহে দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত, কারো হাত পায়ের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

ছেলেটিই আমার হাতে আবার কাপড় জড়িয়ে বাঁধনের মত করে দিল। আমি ভাবছিলাম—আমি কি করে এই জল্লাদদের হাত থেকে বাঁচব। কক্ষটিতে শুধু একটি কাঁচের জানালা, তবে মনে হল বেশ মজবুত। এল টাইপের ত্রিতল অথবা চারতলা বাড়ি। বিরাট এলাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটি সম্ভবতঃ মোহাম্মদপুরের নিকটবর্তী এলাকার কোথাও হবে।

'এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বদর বাহিনী বা রাজাকারের দলের লোকজন আরও কিছু লোককে ধরে নিয়ে এল। সন্ধ্যার পর তিন চারজন লোক আমাদের কক্ষে এল জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এক এক করে সবাইকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করল। শুনলাম, কেউ বলছে—আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেউ বলল—আমি ডাক্তার, আমি সাংবাদিক, আমি চীফ একাউনন্টেন্ট, আমি কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালের সার্জনের ছেলে।

লোকগুলোর একজন বলে উঠলো, 'শালারা সব ইণ্ডিয়ান স্পাই আর ইন্টারন্যাশনাল স্পাই।' একজন আবার বলল,—'শালা, তুমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে এদ্দিন মন্ত্র পড়িয়েছ, আজ আমি তোমাকে পড়াব। তুমি তো গভর্ণমেন্ট অফিসার, সরকারের টাকা খেয়েছ আর গাদ্দারী করেছ। এবার টের পাবে'।

'জিজ্ঞাসাবাদের পর শুরু হল প্রহার, এমনি ধুম ধাম মার দেওয়া শুরু হল যেন নিশ্বাস ফেলারও জো নেই। সবাই চিৎকার করে কাঁদছে। কেউ জোরে জোরে দোয়া দরুদ পড়ছে, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, কিন্তু পশুগুলোর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। মারধোর করে প্রায় আধ ঘন্টা পরে লোকগুলো চলে গেল। মার খেয়ে অনেকেই অচেতন হয়ে পড়েছে। রাত তখন অনুমান দশটা। এক অধ্যাপক সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,—ভাই, আপনার হাত কি খোলা? আমার হাতের বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দেন, লুঙ্গিটা হাঁটু থেকে নীচে নামিয়ে দেন, খানিক পরে কোন ক্রমে দেয়াল ঘেঁষে বসে তিনি আচ্ছন্ন অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।'

'রাত দশটা থেকে অনুমান একটা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার বদর বাহিনীর জল্লাদেরা এসে আমাদের খানিক পর পর দেখে গেল। রাত প্রায় সাড়ে ১২ টায় আমাদের উপরতলা থেকে কয়েকজন মহিলার আর্তনাদ ভেসে এল। সেই আর্তনাদের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। মারের চোটে প্রায় সবাই অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি জ্ঞান হারাইনি। আমি আল্লাহকে ডেকে যাচ্ছি—শেষবারের মতো আল্লাহর কাছে আমার যদি কোন গুনাহ হয়ে থাকে তার জন্য পানাহ চাইছি।'

'রাত প্রায় একটার সময় পাশের ঘরে রাইফেলের গুলি লোড করার শব্দ এবং লোকজনের ফিস ফিস করে আলাপের শব্দ শুনতে পেলাম। সারা শরীরে আমার ভয়ের হিম স্রোত চকিতে ভরে উঠলো। খানিক পর একটা লোক এসে আবার আমাদের দেখে গেল। তার খানিক পর কয়েকজন লোক আমাদের ঘরে ঢুকলো। তারাই আমাদের ঘরের বাইরে নিয়ে এল।'

'এরপর বদরবাহিনীর একেকটি পশু আমাদের দুজন দুজন করে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে আনল। তিনটি বাসে তারা আমাদের সবাইকে নিয়ে তুলল। তাদের হাবভাব, ফিস ফিস করে কথাবার্তা শুনে মনে হল—আর রক্ষা নেই। বাস ছেড়ে দিল, বাসের সব কটি জানালা উঠানো। বুঝতে পারলাম, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাস এসে থামল কতগুলো ঘরের পাশে। ঘরের দরজা বেশ বড় বড় এবং কোণাকুণি লাঠি দিয়ে আটকানো কিন্তু তারা আমাদেরকে ঘরে না ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে চলল। কৌশলে চোখের বাঁধন আলগা রাখার কারণে দেখলাম সম্মুখে একটা বিরাট বিল, মাঝে মাঝে কোথাও পুকুরের মত রয়েছে। বটগাছের আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, ১৩০ থেকে ১৪০জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এর মাঝে এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে আমি আমার পরনের লুঙ্গি হাঁটুর ওপর উঠিয়ে রেখেছি। চোখ বাঁধা অবস্থায়ও যে আমি দেখতে পাচ্ছি তা বদর বাহিনীর লোকেরা বুঝতে পারেনি। বদর বাহিনীর লোকজনের হাবভাবে স্থির নিশ্চিত হলাম, আমাদের হত্যা করার

জন্য এখানে নিয়ে এসেছে। আমি তখন আমার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত করে ভাবছি—কি করে বাঁচা যায়।

'দেখতে পেলাম—বদর বাহিনীর পশুরা আমার সামনের লোকদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আমাদের মত বন্দি একজন চিৎকার করে বলে উঠলেন—'আপনারা বাঙালী হয়ে আমাদের মারছেন। কোন পাঞ্জাবী যদি মারত তাহলেও না হয় বুঝতাম, কেন আমাদেরকে হত্যা করতে যাচ্ছেন? আমরা কি অন্যায় করেছি? ভদ্রলোকের গায়ে রাইফেলের এক ঘা দিয়ে বদর বাহিনীর এক জল্লাদ গর্জে উঠল,—'চুপ্ কর শালা।' কে যেন একজন বলে উঠলো, 'আমকে ছেড়ে দিন, দশ হাজার টাকা দেব'। কোন একজন মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন—আপনারা আমার বাপ-ভাই। আমাকে মারবেন না।।' চারিদিকে মাতম, আহাজারি, তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সামনের লোকদের দলে দলে ভাগ করে তারা সামনের ফাঁকা মাঠে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। আমার সারা শরীর যেন ভয়ে জমে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি বাঁচার আশায় পালাবার সম্ভাব্য সব উপায় ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। মনে হচ্ছে—কোন উপায় আর নেই।

'আবার মনে হচ্ছে—বাঁচার কি কোন উপায় নেই; জল্লাদদের একজন আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমার পেছনের লোকের গেঞ্জির সাথে আমার গেঞ্জি সে ভাল করে বেঁধে দিল। হঠাৎ সে সময় পেছনের লোকটি বলে উঠলো—'আজিজ ভাই, তুমি! আমাকে মারতে নিয়ে এসেছে! তুমি থাকতে আমাকে মেরে ফেলবে! আপসোস।' রাইফেলধারী লোকটি কোন কথা না বলে চলে গেলো।

'বেয়নেট দিয়ে জল্লাদের দল তাদের হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে, ছুঁড়েছে গুলি। চারদিকে আর্ত চিৎকার, মাঝে মাঝে জল্লাদের দলের কেউ কেউ চিৎকার করে বলে উঠছে—শালাদের খতম করে ফেল্। সব ব্যাটাদের খতম করে ফেলবো। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আর্ত চিৎকারের সাথে পৈশাচিক হাসি। এমন নারকীয় তাণ্ডবলীলার মধ্যে আমি জীবনপন করে আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। আমার সম্মুখের প্রায় তিরিশজনকে ততক্ষণে সামনের ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে খতম করে ফেলেছে বদর বাহিনীর পশুরা। ত্রস্ত হাতে আমি গেঞ্জির গিঁট খুলে ফেললাম। বাম হাতের দড়ির বাঁধন খুলে দড়িটা হাতের নীচে চাপা দিয়ে রাখলাম। হাত আমার পেছনে দিয়ে রাখলাম। বদর বাহিনীর এক দস্যু আমার সামনের কয়েকজন লোক নিয়ে তখন ব্যস্ত। কে যেন বলে উঠলেন—'আমার কাছে তোরা দায়ী থাকবি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ। মাগো'....আমি চোখের বাঁধনের কাপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম। প্রায় হাত কুড়ি যাবার পর 'এই' এই' হাঁক ডাক শুনতে পেলাম। আমার তখন কোন দিকে খেয়াল নেই। শুনতে পেলাম—গুড়ুম গুড়ুম করে দুটি আওয়াজ। অন্ধকারে প্রায় ৪০ গজ যাওয়ার পর সামনে পড়লো কাদা। কর্দমাক্ত জায়গাটি পার হওয়ার সময় আবার দুটি গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু অন্ধকারে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমি কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রায় ৩ ফুট গভীর পানি। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আমি পানি ঠেলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর শুকনো জায়গা পেলাম। উঠে আবার দৌড়ানো

শুরু করলাম। দুর থেকে আমার দিকে টর্চের এক ঝলক আলো ভেসে এলো। আবার দুটি গুলির শব্দ। সাথে সাথে আমি কাত হয়ে পড়ে গেলাম। গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলাম আবার পানির মধ্যে। প্রাণপণে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললাম। এরপর শুকনো। বিল আর নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। গায়ে শক্তি নেই, কিন্তু আমি তখন দিকভ্রান্ত।'

'নিরাপত্তার জন্য নদীর পাড়ে না উঠে উজানে এগিয়ে চললাম। রাতের তখন বেশী দেরী নেই। খানিক পর উঠে পড়লাম নদী থেকে। বাকী রাত কাটিয়ে দিলাম নদীর তীরে এক ঝুপড়ির মধ্যে। সকালে রোদ ওঠার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না—কোথায় এসেছি। গ্রামের আভাস যেদিকে পেলাম সেদিক পানে চললাম এগিয়ে। খানিক চলার পর শুনতে পেলাম—কারা যেন আমায় ডাকছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। পরে বুঝতে পারলাম এরা গ্রামবাসী। তাদের কাছে সব কথা বললাম। বটগাছের বিবরণ দিতে তারা বলল—ওটা হলো রায়ের বাজার ঘাটের বটগাছ। সেখান থেকে পরে আমি আটির বাজারে মুক্তিফৌজের কমাণ্ডারের সাথে দেখা করি। তিনি আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দুদিন পর ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলার রাজধানীতে। তখনও বুঝিনি, এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সত্যি কি বেঁচে গেছি, আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছেন।'

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান। সমাজের অগ্রগতির ধারাকে চলমান রাখার প্রক্রিয়ায় যাঁর বুদ্ধি নিয়োজিত—তিনিই বুদ্ধিজীবী। সমাজের সমবেত বা ব্যক্তির সৃষ্টিতে নতুন মাত্রা যিনি যোগ করেন—তিনিই বুদ্ধিজীবী। নয়া উদ্ভাবনা ও আবিষ্কারে যিনি সাফল্য অর্জন করেন তিনিও অবশ্যই বড়মাপের বুদ্ধিজীবী। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক—তাঁদের সৃষ্টির সৌন্দর্যে জনচিত্তকে স্পর্শ করেন, উদ্বুদ্ধ করেন অতএব তাঁরা যে বুদ্ধিজীবী, সে বিষয়ে সংশয় কোথায়? স্ট্যালিন বুদ্ধিজীবীদের তাই খুব সঠিকভাবেই 'আত্মার কারিগর' বলে অভিহিত করেছিলেন।

লেনিন এবং চার্চিল—এই দুই খ্যাতিমান রাজনীতিকের বুদ্ধিজীবী সংক্রান্ত ভাবনাও বেশ সুচিন্তিত। লেনিন যা বলেছিলেন, তার সারাংশ অনেকটা এরকমঃ বুদ্ধিজীবী তিনিই, যাঁর একটি বিশ্বদৃষ্টি আছে এবং যিনি প্রায় সকল প্রধান বিষয়েই একটা পরিষ্কার ধারণা রাখেন। তবে লেনিনের চিন্তায় এ কথাটি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিল যে, শুধু চিন্তা বা বুদ্ধির বেহুদা কসরত নয়, বুদ্ধিজীবী জগৎটাকে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হতে হবেন। উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন যে, যিনি কোন ঘটনার বিশ্লেষণে কেন সে ঘটনা ঘটছে, অনুমান ও যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে তা বলতে পারেন এবং সে ঘটনা না ঘটলে বা অন্যরকমভাবে ঘটলে কেন তা ঘটলো না বা অন্যরকমভাবে ঘটল তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন তিনিই বুদ্ধিজীবী। এইসব মনীষীর সবার চিন্তার মধ্যেই বুদ্ধিজীবী সত্তা ও চারিত্র্য একটা প্রায় স্পষ্ট আদল পেয়েছে। তবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত চিলির কবি পাবলো নেরুদা প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে একটি মৌলিক প্রশ্নকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছেন। তাঁর কথা হলো, একজন

বুদ্ধিজীবীকে বিচার করতে হবে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ রাজনীতিই সামাজিক বিষয় ও সামগ্রিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন বুদ্ধিজীবী যদি নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখেন বা রাজনীতি-নিরপেক্ষ হয়ে যান তাহলে সৎ বুদ্ধিজীবী হলেও তিনি শেষ বিচারে প্রতিক্রিয়ার পক্ষভুক্ত হয়ে পড়বেন। রাজনৈতিক চেতনার অভাবে বহু দেশে বহু বুদ্ধিজীবী শেষ পর্যন্ত এমনটিই হয়ে গেছেন। অন্যদিকে আইনস্টাইন, চার্লি চ্যাপলিন প্রমুখ বুদ্ধিবৃত্তির এমন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন যে, মনে হতে পারে এঁদের রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার ন্যুনতম প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। সামাজিক দায়ের দিকটা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই এঁরা বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছেন। ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে ও স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে উন্নত দেশের বহু বুদ্ধিজীবীর নির্যাতন স্বীকার ও প্রাণদানের নজিরও আমাদের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস। ঠিক এই ধারাতেই বাংলাদেশর মহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চেয়েছিলেন ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মালরো।

ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীরা সম্প্রদায়গতভাবে এই চেতনাা থেকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেরুবন্ধন ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এইখানেই তাঁদের মিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে কখনো কখনো আর্থ-সামাজিক সমস্যার চেয়ে সাংস্কৃতিক সমস্যা প্রাধান্য পায়। অর্থনীতির ব্যাপারটা গোড়ায় বলে উপরিতলের সাংস্কৃতিক ব্যাপারটা চোখে পড়ে বেশি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সাংস্কৃতিক উপাদান বাংলাদেশের রাজনীতিকে কী পরিমাণ বারুদঠাসা করেছে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন একই সঙ্গে বাঙালী আত্মপরিচয় চিহ্নিতকরণ ও জাতিসত্তা উদ্ধারের আন্দোলন, গণতন্ত্র ও ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সুস্থ জ তীয় সংস্কৃতিক নির্মাণেরও আন্দোলন। এই আন্দোলনের তাত্ত্বিকরা ছিলেন বু দ্ধিজীবী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, মুনীর চৌধুরী, রণেশ দাসগুপ্ত, খোকা রায়, আবুল কাশেম এবং আরো অনেকে। এই আন্দোলনের সংস্কৃতি কর্মীও তাঁরা, তবে আন্দোলনের অগ্রবাহিনী ছিল ছাত্রসমাজ। মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণদানও করেছিল প্রধাণত: ছাত্ররাই।

সেকালের ছাত্রনেতাদের অনেকেই পরে বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন হাসান হাফিজুর রহমান, গাজিউল হক, জহির রায়হান এবং আরো অনেকে।

ষাট-এর দশকে সামাজিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে তার সঙ্গে যুক্ত হয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বিমুখী আন্দোলন। এর একটি সাংস্কৃতিক, অন্যটি অর্থনৈতিক। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রাধান্য প্রায় প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের রবীন্দ্র-বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনাকে বিকশিত করার লড়াই। এই আন্দোলনে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা দৃঢ়পণ সংগ্রামে ধীরে ধীরে বিপুল জনতার সমর্থন লাভে সক্ষম হন। আর রাষ্টবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদেরা তৎকালীন

পাকিস্তানের দুঃসহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেন 'দুই অর্থনীতি'র তত্ত্ব এবং তারই ফলে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয় দফা। এই দুই ধারার আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীও যুক্ত হয় এবং এতে কৃষক সমাজেরও সমর্থন পাওয়া যায়। এরই ফল ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান।

১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের প্রাক–পটভূমি রচনা করে। এই দুই আন্দোলনই ঐক্যবদ্ধ সকল বাঙালীর আন্দোলন, এর বিন্যাস ও প্রস্তুতিতে বুদ্ধিজীবীদেরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার ও তার দোসররা এদিকটিতে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল, আর সেজন্যই ১৯৭১–এ গণহত্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল গণতন্ত্রমণা ও বাঙালীদের জন্য একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রত্যাশী বুদ্ধিজীবীদের ওপর অমন বিনাশী আক্রমণ চালানো হয়। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে যুক্ত করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তুলতে।

বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন দেখানোর কাজ পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই করেছে। উদ্দেশ্যটা সহজ। সরকার চেয়েছে জনসাধারণকে শোষণ করতে। বুদ্ধিজীবীরা যদি জনসাধারণের অংশ হয়ে যায়, জনসাধারণের সঙ্গে থাকে, তবে তারা মানুষের চোখ খুলে দিতে পারেন, চোখ খুলে দিলে শোষণ করতে অসুবিধা। আর যদি বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে পাকিস্তান–এর মহিমা প্রচার করানো যায়, তা হলে শোষণ কার্যটা আরো নির্বিঘ্নে হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের জীবনে যেহেতু অভাব ছিল সচ্ছলতার এবং লোভ ছিল স্বাচ্ছন্দ্যের, তাই অল্পতেই তাঁরা আকৃষ্ট হতেন। চাকরিতে উন্নতি, পুস্তকের জন্য পারিশ্রমিক, পরবর্তীকালে তমঘা ও পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ—এ সবের সাহায্যে জনসাধারণ থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করবার প্রয়াস সরকার করেছে, সক্ষমও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। বুদ্ধিজীবী সমাজের লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক ব্যবহারজীবী—এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁরা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের প্রায় সকলের জীবনেই সমৃদ্ধি এসেছে। তাই পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধ না থেকে পারেনি। তাঁদের জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবন বিপরীত দিকে চলেছে, অনিবার্যভাবেই। তুলনামূলকভাবে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কম, তাঁদের পক্ষেও সরকারী বক্তব্য সমর্থন না করে উপায় থাকেনি। এর কারণ, তাঁদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবোধের অভাবটা ছিল আরো বেশি। তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে, সামান্য ধাক্কাতেই তাঁরা গড়িয়ে পড়বেন নিচের খাদে এবং ধাক্কার আশঙ্কা সব সময়েই ছিল—সরকার শুধু প্রলোভনই দেখায়নি, ভয়ও দেখিয়েছে এবং প্রলোভনের তুলনায় ভয় কিছু কম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেনি। ভয়ের জন্য ভুলকে ভুল, অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্তের মনেও অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল, কিন্তু সেই অসন্তোষ কিংবা তার চেয়ে বড় অসন্তোষ—সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে উম্মোচিত করার মতো পর্যাপ্ত সাহস বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়নি। ভয়টা কল্পিত ভয় ছিল না। বামপন্থী বলে পরিচিত যাঁরা—প্রয়োজনবোধে তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সরকার দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে অবাধে চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ বা স্বাধীনতা কোন দিনই ছিল না বাংলাদেশে। যেমন, পত্রপত্রিকা

প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যায়। এমনিতেই এই কাজটা দুরূহ ছিল অর্থনৈতিক কারণে। তদুপরি পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হত সরকারের। সরকারের অপছন্দ হলে চালু পত্রিকা যে কোন সময়ে বন্ধ করা হত। সম্পাদককে কারাদণ্ডাদেশ দেবার উদাহরণও অজানা নয়।

প্রলোভন ও ভীতির সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার কাজ পাকিস্তান আমলে অবিরাম চলেছে, এবং সফলতাও এসেছে—এই দরিদ্র দেশে, ভয়ের দেশে। তবে প্রলোভন ও ভীতির বাইরেও পাকিস্তান যে একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র এই রকম কথা কেউ কেউ বলেছেন নিজেদের বিশ্বাস থেকে। এঁরা হচ্ছেন আল-বদর বাহিনীর শিক্ষাগুরু। ভুল শিক্ষার কারণে, সংস্কারের বশে, প্রচলিত ধারণার প্রভাবে এঁরা ইসলামী সমাজব্যবস্থা নামে একটি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্করহিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরীক্ষাস্থল হিসাবে পাকিস্তানকে কল্পনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভয় একেবারে ছিল না তা নয়, ছিল অন্য এক ভয়, ঈশ্বরহীনতার ভয়। এই বিশ্বাস গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। গোঁড়ামি থেকে জন্ম হয়েছে আল-বদরের। সমাজতন্ত্রে প্রয়োজন জনসাধারণের, কিন্তু ইসলামের মায়া এসে এঁদের চিন্তাকে দূর আরবের এমন একটা মনগড়া রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসমূহ গণবিরোধী অর্থাৎ বাংলাদেশ বিরোধী শক্তিকেই পুষ্ট করেছে।

এঁরা বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। কিন্তু এই অংশেরও সকল সদস্য সকল সময়ে যে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করেছে, তা নয়। যখন তাঁরা বিরেধিতা করেছেন, তখন তার ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে ঠিক, কিন্তু তাঁদের সেই কাজের ফলে জনতার মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে জনতার স্বার্থ আবার এগিয়েও গেছে। কাজেই বিচ্ছিন্নতার এই ধারাও অনেক সময় নেতিবাচক উপায়ে অপ্রত্যক্ষরূপে নিজের স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশের আন্দোলনের অগ্রগামিতাকে সহায়তাদান করেছে।

বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্য যে অংশ জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে এক করে দেখতে পেরেছেন, তাঁদের কাজে স্বাধীনতার আন্দোলন লাভবান হয়েছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে। এই অংশটিই ছিল বৃহত্তর অংশ এবং এই অংশের বৃহত্তর অংশ এসেছিল তরুণ সমাজের মধ্য থেকে। তাঁরা তরুণ ছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে একটা নবীন আদর্শবাদ ছিল, ছিল প্রলোভন এবং ভীতির কাছে আত্মসমর্পণ না করবার সাহস। তদুপরি পূর্ববর্তীদের তুলনায় এঁদের অর্থনৈতিক ভিত্তিটাও ছিল কিছুটা শক্তিশালী।

জনসাধারণের আশা পূরণের ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে তার প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়েছিল ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্যি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেও দেশের সকল বুদ্ধিজীবীই যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, তা নয়। ঢাকাতেই 'বুদ্ধির মুক্তি' নামে একটি ক্ষুদ্র অথচ তৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠছিল অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে। এঁরা সংস্কারমুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার উপর গুরুত্ব দিতেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও এঁদের মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন উঠেছিল। নজরুল

ইসলামকে নিয়ে পাকিস্তানবাদীরা পরবর্তী কালে অনেক বাগাড়ম্বর করেছে, কিন্তু নজরুল ইসলাম কোনদিনই সাম্প্রাদায়িক রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না, তিনি বরং আস্থা রেখেছিলেন শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। এটা আগের কথা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে, এমনকি যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে মঙ্গলের প্রত্যাশা দেখেছিলেন, তাঁরাও কিছুটা চিন্তিত না হয়ে পারেননি। চিন্তিত হয়েছিলেন রাষ্টভাষা হিসেবে উর্দুকে চালু করবারে উদ্যোগ আয়োজন দেখে। ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকেই অধ্যাপক ও ছাত্রদের একাংশ দাবি তুললেন অন্যতম রাষ্টভাষা হিসাবে বাংলার পক্ষে। সরকারের দিক থেকে বিরোধিতা এল—প্রত্যাশিত বিরোধিতা। এবং তখনি, সেই সময়েই পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের জায়গায় নতুন এক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটলো, বাঙালী জাতীয়তাবাদের। ঘটনাটা তেমন কোন ঘটা না করেই ঘটল। অধিকাংশ মানুষই লক্ষ্য করল না। রাষ্টভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য যে কি, এ যে কোন পর্যন্ত যাবে—সেটা শাসকেরা তখন বোঝেনি, এমনকি তাঁরাও বোঝেননি যাঁরা শুরু করেন এই আন্দোলন।

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের যখন জন্ম হয়, তখন সেই জন্মের পেছনে একটি অতি প্রধান ভুমিকা ছিল ভয়ের। মুসলিম মধ্যবিত্ত ভয় পেয়েছিল অবিভক্ত ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ নেই মনে করে। সেই ভয় তারা সংক্রামিত করে দিয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে। প্রধানত: ভয়ের কারণেই—ইংরেজের ভয়, তারো চেয়ে বড় ভয় হিন্দুর। ভয়ের তাড়নাতেই মুসলমানদের প্রায় সব ভোটই গিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের বাক্সে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই এল এই নতুন ভয়—উর্দুর। অর্থাৎ উর্দূভাষাভাষীদের। আশঙ্কা হল উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বাঙালীরা চিরকালের জন্য বোবা হয়ে যাবে, তারা গোলাম হয়ে যাবে পাঞ্জাবীদের। বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো সেই ভয় জাগিয়ে দিল মানুষকে—প্রথমে বুদ্ধিজীবী—সমাজের একটি অংশকে—পরে ছাত্রদের এবং তারও পরে সমগ্র দেশবাসীকে। বড় ভয় এসে ছোট ভয়কে, নিরাপত্তার ভয়কে, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করতে না পারার ভয়কে জয় করে নিল। ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালী দেখলো তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তখন মরিয়া হয়ে ওঠা ভিন্ন অন্য কোন পথ রইল না। যে-শাসকেরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল, সেই শাসকেরাই আজ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সকল মানুষের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন সেই জ্ঞানটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে এনে দিল। শাসকদের স্ববিরোধিতার পুরাতন নাটক নতুন করে অভিনীত হল, স্বার্থরক্ষা করতে গিয়েই তারা স্বার্থ বিনষ্ট করল।

রাষ্টভাষা আন্দোলন শুধু রাষ্টভাষার জন্য আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না। থাকলে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হত না। এই আন্দোলন অনেক দুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত এর গতিধারা প্রসারিত। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্প্রদায়িতকতা এ দেশের পুরাতন ব্যাধি, ইংরেজ আমলে এই ব্যাধির প্রকোপে আমরা অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছি। পাশাপাশি থেকেও দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, নিজেদের স্বার্থকে এক করে দেখতে পারেনি। ইংরেজ যুগে সৃষ্ট অতিশয় সমৃদ্ধ

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবন ও লেখকদের উপস্থিতির সামান্যত্বটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, মুসলমান মধ্যবিত্ত সত্যি সত্যি পিছিয়ে পড়েছিল, এবং হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, যাতে করে সাহিত্যে মুসলিম জীবন অনায়াসে চিত্রিত হতে পারে। ১৯০৫-এর বঙ্গ- ভঙ্গ রদ করা সম্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৪৭-এর বঙ্গ-ভঙ্গ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বিভাগ—মুসলমান মধ্যবিত্ত তো চেয়েছিল বটেই, শেষ পর্যন্ত হিন্দু মধ্যবিত্তের পক্ষেও না চেয়ে উপায় থাকেনি। ১৯০৫-এ যাঁরা বঙ্গ-ভঙ্গর বিরোধী ছিলেন, ১৯৪৭-এ তাঁরা আর বিরোধী থাকতে পারেননি। এই রকমের একটা সাম্প্রদায়িক পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতার ফলে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রে এত তাড়াতাড়ি যে একটি অসাম্প্রদায়িক গণআন্দোলন গড়ে উঠতে পারল, এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তানের ব্যর্থতা ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং সেই ব্যর্থতা দেখে বাংলাদেশের মানুষ ভয় পেয়েছিল।

শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, রাষ্টভাষা আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও বটে। সমাজতন্ত্রের কথা আন্দোলনের কালে স্পষ্ট করে বলা হয়নি বটে কিন্তু সন্দেহ নেই এ আন্দোলন ছিল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার আন্দোলন। বাংলাদেশের সন্ত্রস্ত মুসলমানেরা একদিন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, এর সাহায্যে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করবে বলে। সেই অস্ত্র যখন বরং উল্টো কাজ করবে বলে ভয় হল, তখন তারা একে পরিত্যাগ করে অন্য একটা অস্ত্রকে শাণিত করে তুলতে চাইল—বাঙালী জাতীয়তাবাদের অস্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই অস্ত্র এই মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করেছে, যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে।

রাষ্টভাষা আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ নতুন ও অতিশয় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহ করেছে তরুণ ছাত্রদের জীবনে। সে অভিজ্ঞতা আত্মত্যাগের ও নির্য্যাতন ভোগের। বাংলাদেশের মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করেনি, পর্যাপ্ত পরিমাণের রক্ত দেয়নি বলে তরুণ সমাজের মনে লজ্জা ছিল। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারিতে যখন রক্ত বইল, যখন কারাভোগ এল, এল পুলিশের পিছু নেওয়া, তখন লজ্জা ঘুচল কিছুটা, দ্বিধা কাটল অনেক পরিমাণে, দৃঢ়চিত্ততা এল সঙ্গে সঙ্গে।

এ দেশের লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্রকর রাষ্টভাষা আন্দোলনের মধ্যে শিল্পের যে পরিমাণ উপাদান যত সহজে পেয়েছেন তেমন অন্য কোথাও পাননি। একুশে ফেব্রুয়ারী কোনদিন ম্লান হয়নি। ১৯৫২ সালের পর প্রতিটি বছর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। বাইরে, রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির আবেদন কমেনি, ক্রমশ বেড়েছে। তার কারণ এই আন্দোলন শক্তি পেয়েছে পাকিস্তানের ব্যর্থতা থেকে, যে ব্যর্থতার বোঝা দিনকে দিন বাড়ছিল, শক্তি পেয়েছে জনসাধারণের অসন্তোষ থেকে যে অসন্তোষ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের পুঞ্জিভূত রূপ হচ্ছে এই আন্দোলন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবিদার মুসলিম লীগকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দিয়ে সাধারণ মানুষ জানিয়ে দিল যে—মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানের হাতে তাদের স্বার্থ যে নিরাপদ নয়, এ সত্য তাদের কাছে আর

অস্পষ্ট নয়। পরে এই সত্য আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। যত প্রত্যক্ষ হয়েছে তত বেড়েছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ সব সময়ে প্রকাশের পথ পায়নি, যখন পায়নি তখন তা আরো বেশি দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান যোগাত এই কারণে যে, এই আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা অত্যন্ত বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের দৃষ্টি অনেক সময়ে ছিল পশ্চিমমুখো, তাদের মনে অভিমান ছিল, তাদের মাতৃভাষা বাংলা কিনা এ নিয়েও এক সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি বুদ্ধিজীবীদের দেশের সঙ্গে একাত্ম করে দিল। তাঁরা ঘরে ফিরে এলেন গভীর ভালোবাসা নিয়ে। তাঁরা দেশের মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এতদিন ধর্ম ছিল ঐক্যের বন্ধন, এখন সেখানে এল ভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারির পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী যখন দেশের কথা বলেছেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁরা আসলে বাংলাদেশের কথাই বলেছেন, পাকিস্তানের কথা নয়। দেশপ্রেম তাঁদের দেশদ্রোহী করেছে—এক অর্থে। বায়ান্নর পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মমতার ক্ষেত্রে, চর্চার ক্ষেত্রে বান ডেকে জোয়ার এসেছে। রচনার উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক পরিমাণে। এর ফলে শুধু যে ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তা নয়, মানুষের মধ্যে ঐক্যের বোধ বেড়েছে, বেড়েছে সচেতনতা, বেড়েছে সুন্দরতর জীবনের প্রতি আকর্ষণ। পাকিস্তানের শাসকরা একুশে ফেব্রুয়ারিকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছিল, তাই গণহত্যা শুরু করেই তারা ছুটে গিয়েছিল শহীদ মিনারের দিকে। মিনারকে ভেঙ্গে দিয়ে আক্রোশ মিটিয়েছিল তারা। আর মিনারের জায়গায় মসজিদ তৈরি করে তারা তাদের পুরাতন কৌশল নতুন করে প্রকাশ করেছিল ঃ কৌশলটা হল ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করে বিক্ষোভকে স্তিমিত করা।

বাংলা ভাষার ব্যাপারে পশ্চিমা শাসকবর্গ একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়েছে প্রথমটায়। হয়তো তার পেছনে ভয় ছিল—স্বার্থ নষ্ট হবার ভয়, কিন্তু পরে যখন তারা দেখেছে যে, এ আন্দোলন কিছুতেই স্তব্ধ হবার নয় তখন ১৯৫৬ সালের এবং পরে ১৯৬২ সালের সংবিধানে বাংলাকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ততদিন বাংলাদেশের মানুষ আরো অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, পাকিস্তানে যে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই এটা তাদের জানা হয়ে গেছে এবং জানা হয়ে গেছে বলে ততদিনে তারা শুধু ভাষার অধিকার নয়, পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করেছে।

এই ভাষার দাবিতে ঢাকার রাজপথে রক্তের ঢল নেমেছিলো '৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি। শহীদ রফিক, সালাম, বরকত এবং আরো নাম-না-জানা শহীদ বুকের রক্ত ঢেলে সূচনা করে গেলেন আন্দোলনের। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনই নয়, বাঙালীর, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের শিকড় অন্বেষণেরও আন্দোলন।

সে সময় আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র চলে। আর রেডিওতে সরকারী পত্র-পত্রিকায় যে বাংলা গদ্যরীতি ব্যবহৃত হতো, তার কিছু নমুনা পড়লে এখন হাসিই পায়। অথচ সে সময় এই ভাষাই শুনতে হয়েছে ভাষার দিক থেকে, জাতীয়তার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও—বাঙালীকে।

রেডিও পাকিস্তানের ভাষাঃ

'পিছলে এতোয়ার খান গাফফার খাঁর লড়কা গ্রেফতার হয়েছেন।...

হুকুমতে হায়দরাবাদ হুকুমতে হিন্দুস্থানের খেলাকে জং ও জেহাদের ইরাদা করেছেন।'

সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা মাহেনও–এ প্রকাশিত রচনার অংশবিশেষঃ

'গোজাশতা এশারাতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলাভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে বাংলাভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর ওমরাহদের নেক নজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান শওকত হাসিল করেছিল।.....সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব–তমুদ্দনের তায়ালূক বর্জিত বাংলাভাষা মাশরেকি পাকিস্তানের মাতৃভাষা নয় এবং হবে না, হতে পারে না।' বহু খ্যাত শিশু–কিশোরদের একটি প্রিয় কবিতার শুরু ছিলো এ রকমঃ

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরু জনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।'

এই কবিতাটি সেই সময়ে পাঠ্যপুস্তকে লেখা হলো এ ভাবেঃ

'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে মনে বলি
সারা রোজ আমি যেন নেক হালে চলি।
হুকুম করেন যাহা মোর মুরুব্বিজনে
আমি যেন সেই কাম কির দিলে মনে।,

ভাষার জন্য বাঙালী ছাড়া পৃথিবীতে কোন্ জাতি আর রক্ত দিয়েছে?

আইউব খান শেষে সইতে না পেরে বলেছিলেন, 'সারি জবান মিলিজুলি কর এক জবান বাননা চাহিয়ে, উয়ো উর্দু নেহি, উয়ো বাংলা ভি নেহি, উয়ো পাকিস্তানী জবান।'

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই, ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের প্রবল প্রতিরোধে পাকিস্তানী জবানের' খায়েশ মিটে গেল, বাঙালী তার ভাষাকে কেন্দ্র করে, সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ততক্ষণে আত্ম–আবিস্কারের মোহনায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সচেতনতা ও বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে তত বেশি চেষ্টা হয়েছে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবার। বুদ্ধিজীবীদের পেছনে আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, পুরস্কার পারিতোষিকের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয়েছে প্রলোভনের জালে অনেকেই ধরা দিচ্ছেন। ধরা দিয়েছেন কেউ কেউ, কিন্তু যাঁরা দিয়েছেনও তাঁরাও দেখা গেছে

আত্মসমর্পণ করতে পারছেন না। তার কারণ পাকিস্তানের কৃত্রিমতাটা তাঁদের কাছে ততদিনে ধরা পড়ে গেছে। পাকিস্তানের শাসকরা চিরকালই মানুষের কাছ থেকে দূরে ছিল, সেই দুরত্ব যে ক্রমশঃ বাড়ছে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সেটাও লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। সরকার টাকা দিল, কিন্তু মন পেল না। তমঘা দিল, সেই তনখা পরে কেউ কেউ পরিত্যাগ করলেন, করে বিব্রত করলেন সরকারকে। সরকার সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দিল, কিন্তু সেই পুরস্কার সরকার বিরোধীরা পাওয়া শুরু করলেন। এমন কি পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার উপর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপকারী রচনাও পুরস্কার নিয়ে গেল। সরকার টাকা দিল লেখক সংঘ গড়বার জন্য, কিন্তু বাংলাদেশে দেখা গেল লেখক সংঘ সরকারী নীতির সমর্থন তো করছেই না, পরন্তু প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছে।

সরকার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাস যে অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত তা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু ইতিহাস তো সরকারের কেনা গোলাম নয়, ইতিহাস ঐ কৃত্রিম ছকে আবদ্ধ হতে রাজী হয়নি। অতীতের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা সফল হয়নি, বাংলাদেশের মানুষ তাতে আস্থা রাখে না, এবং চলমান ইতিহাসের ধারা তো চোখের সামনেই দেখা গেছে দুই ভিন্ন দিকে চলেছে। চেষ্টা হয়েছে এটা প্রমাণ করার যে বাংলা ও উর্দু ভাষার মধ্যে সাধারণ ঐতিহ্য আছে, আছে নিকটবর্তিতা। কিন্তু এসব কথাতেও বাংলাদেশের মানুষ সাড়া দেয়নি, উর্দু যে বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এ কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারেনি। বাংলাভাষাকে শিক্ষা ও সরকারী কাজের ভাষা হিসাবে প্রয়োগ করার দাবী বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তুলেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও দাবী উঠেছে উর্দুর পক্ষে। মাতৃভাষাকে জীবনের সর্বত্র প্রচলিত করার পক্ষে দুই পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময় একসঙ্গে কথা বলেছেন। তারা বলেছেন—এই দাবী গভীর দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত। তা উৎসারিত ঠিকই কিন্তু সে দেশ এক দেশ নয়, দুই দেশ। উর্দু প্রচলনের দাবী বাংলার আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। সরকার চেষ্টা করেছে ধর্মের কথা বলতে, পাকিস্তান না থাকলে ইসলাম থাকবে না, ইসলাম না থাকলে বেঁচে থেকে কি লাভ—এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে, কিন্তু এই ধর্মীয় প্রতারণাতেও কোন সুফল হয়নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একদিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সুত্রপাত হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে এখানেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাভাবে বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে। কালাকানুন চালু করে এর যে স্বাধীনতাটুকু এমনকি ইংরেজী আমলে ও চালু ছিল সেটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপকদের লেখা ও মতামত প্রকাশের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবার। শুধু দেশী সরকার নয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহও বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টির জন্য, সেই শ্রেণী এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরও গড়ে উঠেছিল। দুর্বলচিত্ত ও লোভী মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু তবু বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভূমিকা ছিল জনসাধারণের অর্থাৎ বাংলাদেশের পক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা পাকিস্তানবাদী ছিলেন তাঁরা চুপ করে ছিলেন না, তাদের পেছনে সরকারের সমর্থন ও সহায়তা ছিল, কিন্তু তবু তাদের কাজ দেশের উপর বড় কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছে। ইংরেজরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করত, পাকিস্তানীরা আরো বেশী করত— সংগত কারণেই অবিশ্বাস করত বলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করা হল শহর থেকে অনেক দুরে, পাহাড়ের মধ্যে। সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করার পরিকল্পনা করলো, জায়গা করল ঢাকা শহর থেকে লোকবসতিহীন এক প্রান্তরে। এক সময়ে চেষ্টা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য—উদ্দেশ্যটার মধ্যে কোন লুকোচুরি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না, পরিপুর্ণভাবে তাকে রাখতে হবে জনজীবন থেকে দুরে; কেননা বিশ্ববিদ্যালয় যদি বড় হয়, অনেক হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি শহরের মাঝখানে থাকে তবে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা 'রাজনীতি' করবে, অর্থাৎ অধিকারের কথা বলবে, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সভা শোভাযাত্রা বিক্ষোভ শুরু করে দেবে। অবিশ্বাস্য শুধু নয়, ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড একটা ক্রোধ ছিল শাসকদের। যার প্রমাণ পাওয়া গেল তখন যখন গণহত্যার সুচনাতেই মিলিটারী ছুটে এল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসে ছাত্র- শিক্ষক যাকে পেল হাতের কাছে গুলি করে হত্যা করল, দালান-কোঠাও রক্ষা পেল না। আত্মসমর্পণের আগে আবার তারা অনুচরদের পাঠিয়েছে বেছে বেছে বাংলাদেশের আন্দোলন সমর্থনকারী শিক্ষকদের হত্যা করার জন্য।

শুধু শিক্ষক বলে নয়, গোটা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিই আক্রোশ ছিল। হানাদারদের পরিকল্পনা ছিল প্রত্যেক শহরে তারা ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধিজীবী নিধন করে যাবে আত্মসমর্পণের আগে। এবং কাজ তারা শুরুও করেছিল, শেষ করে যেতে পারেনি এই যা রক্ষা। এর কারণ বুদ্ধিজীবীদের উস্কানিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চেয়েছে বলে তাদের ধারণা। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বলে কেউ না থাকুক; থাকুক শুধূ সাধারণ মানুষ এটাই তাদের কল্পনার স্বর্গ ছিল। কেননা তাহলে তাদের ধারণা তারা অনাদিকাল ধরে এই দেশে শোষণকার্য অব্যাহত রাখতে পারত। সন্দেহ নেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বুদ্ধিজীবী সমাজের অধিকাংশ মানুষ সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, অনেক সময়ে ছিলেন অগ্রবর্তীও।

বাংলার অর্থনীতিবিদদের একটি অংশ সাধারণ মানুষের সচেতনতাকে অনেকটা অগ্রসর করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এটা সকলেরই জানা ছিল। অর্থনীতিবিদদের সেই সত্যটা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ১৯৫৪ এর সাধারণ

নির্বাচনের পর থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে পড়েছে। সরকার তথ্য বিকৃত করত, অনেক তথ্য বাঙালী অর্থনীতিবিদেন হাতে আসত না, কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের উচ্চ পদে বাঙালীদের নিয়োগ করা হত না, তবুও অর্থনীতিবিদেরা এটা বুঝেছিলেন যে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে দুটিই স্বতন্ত্র অর্থনীতি চালু করা প্রয়োজন। শেষ দিকে দুই অঞ্চলের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ এত প্রবল হত যে তাঁরা কোন কোন ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করতেন। আইয়ুব খান চতুর লোক ছিলেন। দুই অর্থনীতির দাবী তার সময়েই জোরেশোরে উঠেছিল, এবং তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে দুই অর্থনীতির পরিণাম দুই পাকিস্তান। আইয়ুব খান এই দাবী স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন ধমক দিয়ে, অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করার হুমকি দিয়ে। কিন্তু তাতে সত্য অসত্য হয়ে যায়নি, ফাটল জোড়া লাগেনি। ফাটল শুরু হয়েছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে, অর্থনীতি সেই ফাটলকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়েছে, পরিণতিতে শুধু দুই অর্থনীতি বা দুই পাকিস্তান নয়, দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষার ফাটলের কথাও আইয়ুব খান জানতেন। পতনের আগে তিনি একবার দুই অঞ্চলের জন্য একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টি করার কথা বলেছিলেন। সন্দেহ নেই সে কাজ করতে গেলে ফাটল তো বন্ধ হতই না, বরং আরো বৃদ্ধি পেত।

প্রত্যক্ষ ভূমিকার বাইরে বুদ্ধিজীবীদের অপ্রত্যক্ষ ভূমিকাটাও কম গুরুতর নয়। বাংলাদেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম, তাই শিক্ষিতের মর্যাদা বেশী। সম্মান প্রদর্শনের অভ্যাসও এদেশে পুরাতন। বুদ্ধিজীবীদের তাই এদেশে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান আছে। সেই জন্যই দেখা যায়, বুদ্ধিজীবীদের উপর যখন আক্রমণ হয় তখন আহত হয়েছে সমগ্র দেশ, বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে দেশের সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরুতে ছিল মুলতঃ ছাত্রদের আন্দোলন, কিন্তু যে মুহূর্তে গুলি চলল ছাত্রদের উপর, গ্রেফতারী পরোয়ানা নেমে এল শিক্ষকদের উপর, তখনি অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্র আন্দোলন লেলিহান গণআন্দোলনে পর্যবসিত হলো। তেমনিভাবে ঊনসত্তরের আন্দোলন তার চরমরূপ পরিগ্রহ করল সেই মুহূর্ত থেকে, যে মুহূর্তে খবর প্রচার হল যে, মিলিটারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জোহাকে গুলি করে হত্যা করেছে। ঢাকায় তখন কার্ফ্যু ছিল, কিন্তু ঐ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হাজার হাজার মানুষ বের হয়ে এসেছিল রাস্তায়। কেউ তাদের বলেন নি বের হয়ে আসতে। ডঃ জোহাকে তারা জানে না, বিশ্ববিদ্যালয় দুরে থাকুক, কোন বিদ্যালয়েই যায়নি তাদের অধিকাংশ মানুষ, কিন্তু তবু ডঃ জোহার হত্যাকান্ডের মধ্যে তারা তাদের নিজেদের অপমানকে দেখল, দেখল তাদের নিজেদের অস্তিত্বের উপর নৃশংস এক আক্রমণকে। ফলে আন্দোলন এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, তার স্রোতে আইয়ুব খান, মোনেম খান ভেসে চলে গেল।

ঊনসত্তরের আন্দোলনের সময় যারা প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্র দু'টির অফিস পুড়িয়েছে তাদের অনেকেই হয়ত সংবাদপত্র পড়ে না, কিন্তু তারা জানত সংবাদপত্র দু'টি তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। অন্যদিকে সরকার যখন যে পত্রিকার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে তখন সেই পত্রিকাকে জনসাধারণ আদর করে

বুকে তুলে নিয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল সেই সময়ে যখন তার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল, যখন তার সম্পাদক কারারুদ্ধ ছিলেন। পুস্তক নিষিদ্ধ করার কাজে সরকারের উৎসাহ ছিল, কিন্তু শেষের দিকে সরকার আর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করতে সাহস পায়নি, প্রচার করলেও সে নিষেধাজ্ঞা মান্য করা হয়নি।

১৯৭১-এর গণহত্যা যখন শুরু হয় তখন বাংলাদেশের মানুষের মনে সবচেয়ে বেশী মর্মান্তিকভাবে বেজেছে যে ঘটনা সে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ড। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে ছিল এই ঘটনার পর নিশ্চিত জেনেছে যে পুর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন পথে বাঙালীর বাঁচার উপায় নেই।

বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারের তাঁবেদার হিসেবে কাজ করেছে তাদের প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। আটষট্টি সালে 'অগ্রগতির দশ বছরের' গুণকীর্তন করে প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছিল, যখন প্রতিদিন মস্ত মস্ত ছবি ছাপা হচ্ছিল আইয়ুব খানের—তখন সেই সমারোহ যেমন করে বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল পাঠকদের (যার খবর প্রচারকরা রাখত না), তেমনিভাবে প্রলুব্ধ ও স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার বর্ধিষ্ণু সমারোহও ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল মানুষের মনে। বিশেষ করে আইয়ুবের রাজত্বকালে, কেননা সেই কালেই উদ্যোগ-আয়োজনটা বেড়েছিল সবেচেয়ে বেশী। বাংলাদেশ মীরজা-ফরদের জন্ম যেমন দিয়েছে, তেমনি তাদের ঘৃণা করতেও জনগণ কার্পণ্য করেনি।

তারচেয়েও বড় কথা এই সুবিধাভোগী ও ক্ষেত্রবিশেষে নির্বোধ বুদ্ধিজীবীদের লেখায়-বক্তৃতায় ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। তারা যা ভালো বলেছেন জনসাধারণ নিশ্চিত জেনেছে যে, তা মন্দ না হয়ে যায় না। তাঁরা যার পক্ষে থেকেছেন জনসাধারণ তার বিপক্ষে গেছে। অবশ্য এঁরা পক্ষে যত না বলেছেন বিপক্ষে বলেছেন তার চেয়ে বেশী, কেননা এঁদের প্রধান চরিত্র হচ্ছে বর্জনবাদীর। এঁরা বলেছেন ইকবাল অতি মহৎ কবি, বাংলাদেশের মানুষ সেই মহত্ত্ব দেখতে পায়নি। এরা বলেছেন রবীন্দ্রনাথকে বর্জন কর, যত বলেছেন এই কথা, তত জনপ্রিয়তা বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের, তত বেশী দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশের মানুষ আঁকড়ে ধরেছে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ কবি থাকেননি, তিনি জাতীয় বীরে পরিণত হয়েছেন, তাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এরা বলেছেন বাংলা ভাষাকে ইসলামী কর, যত বলেছেন, তত বেড়েছে সমগ্র বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের প্রীতি ও আকর্ষণ। হরফ বদলানোর পরামর্শ এরা দিয়েছেন, সেই পরামর্শ সকলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা বলেছেন নজরুল ইসলামের সংস্কার আবশ্যক, সাধারণ মানুষ বলেছে নজরুল ইসলাম আমাদের একান্ত আপনার জন। এরা বলেছে পুঁথি সাহিত্যই আসল সাহিত্য, সাধারণ পাঠক বুঝে নিয়েছে পুঁথি সাহিত্যর পক্ষে ঐ প্রচারে ফাঁকি আছে। মোটকথা, এদের কাজ সম্পূর্ণ বিরপীত ফল উৎপাদন করেছে। তার

কারণ, এই যে সাধারণ মানুষ জানত এরা তাদের স্বার্থের শত্রু, এঁরা তাদের বন্ধু নন, এঁদের উদ্দেশ্য পশ্চিমাদের শোষণ ব্যবস্থাটাকে কায়েমী করে রাখা।

এইভাবে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন যে সকল বুদ্ধিজীবী তাঁরাও নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পরোক্ষভাবে জনতার উপকারই করেছেন। জনতার দৃষ্টি খুলে দিতে তারাও সাহায্য করেছেন, এই করে জনতার আন্দোলনকে তারাও এগিয়ে দিয়েছেন।

বুদ্ধিজীবী সমাজের যে অংশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিলেন তাঁরা বিবেকবান ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরাও আসলে নিজেদের স্বার্থেই কাজ করেছেন, তবে তফাৎ এই যে, তাঁদের স্বার্থকে তারা জনসাধারণের স্বার্থ থেকে ভিন্ন করে দেখেননি। এবং উভয়ের স্বার্থ যেহেতু ছিল এক ও অভিন্ন তাই তাদের কাজের ফলে সাধারণের আন্দোলনের উপকার হয়েছে।

পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে কোন দার্শনিক প্রস্তুতি ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে প্রচার করা হয়েছিল যে, বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রয়োজনেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের আন্দোলনও কোন গ্রন্থপাঠ থেকে শুরু হয়নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে ছিলেন, এই আন্দোলনে তারা সরাসরি নেতৃত্ব দেননি, আন্দোলন যখন এগিয়ে গেছে তখন তার গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতেও হয়ত তাঁরা পারেননি, পিছিয়ে পড়েছেন, তবু তাঁরা সঙ্গেই ছিলেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপুর্ণ। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সভা করে গুলিবর্ষণের নিন্দা করেছেন, ফলে তাঁদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। ঊনসত্তরের এবং একাত্তরের আন্দোলনের সময় শিক্ষকরা রাজপথে শোভাযাত্রা করেছেন।

এসব ছোট ঘটনা। কিন্তু এগুলোর তাৎপর্য আছে। তাৎপর্য এই যে, বোঝা গেছে বিক্ষোভ সার্বজনীন হয়ে উঠেছে, তারচেয়ে বড় কথা বোঝা গেছে শিক্ষিত—অশিক্ষিত সকল মানুষ এক হয়ে গেছে। সেই একাত্মতার দরুনই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

জনতার সঙ্গে চলা বুদ্ধিজীবী সমাজ জনতার অগ্রবর্তী অংশ হিসেবেই কাজ করেছে। পাকিস্তানের ব্যর্থতার লক্ষণ প্রথমে ধরা পড়েছে তাঁদের কাছেই, পরে তাঁরাই প্রমাণ পেয়েছেন, সেই ব্যর্থতার। তাঁরাই বুঝেছেন ভাষার উপর আক্রমণের অর্থ কি, অর্থনীতির গতি কোন দিকে। সেই জ্ঞানকে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বাকি কাজটা সাধারণ মানুষ নিজেরাই করেছে। বাংলাদেশকে তাঁরা স্বাধীন করে নিয়েছে—নিজের হাতে।

ঐতিহাসিক ২৫শে মার্চের পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর যে সুপরিকল্পিত হত্যালীলা চালানো হয়, তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই বাঙালী সংস্কৃতি বুদ্ধিসত্তা ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে একটি ঔপনিবেশিক শক্তি যে ষড়যন্ত্র শুরু করে; এটি তারই চূড়ান্ত পরিণতি। এই চক্রান্ত বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে জাল বিস্তার করে। কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে এবং কোথাও সাম্প্রদায়িকতা বাদী কিংবা অনুগ্রহপুষ্ট দালাল

শ্রেণীর মাধ্যমে তারা বাঙালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে পঙ্গু ও নির্মূল করার অভিযান অব্যাহত রাখে।

মনীষী গোর্কী বলেছেন, মাছের যেমন পচন শুরু হয় মাথা থেকে তেমনি কোন জাতিরও অধঃপতনের সূত্রপাত হয় মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তি একটি জাতির সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে উৎখাত করে নিজেদের শোষণ ও শাসন চিরস্থায়ী করার জন্যে এই মনীষীর বাক্যকেই ঘৃণ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা একদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্যে এবং অন্যদিকে এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিক প্রভৃতি শ্রেণীকে পঙ্গু ও নির্জীব করার জন্যে বহু ধরনের চক্রান্তে মেতে উঠে। এঁদের উপর কোথাও জেল-জুলুম এবং হয়রানি চালানো হয়। কখনও চাপ এবং ভীতি প্রদর্শন করে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলে। অর্থ, পদোন্নতি, খেতাব ও ইনামের মোহ সৃষ্টি করা হয়। সাতচল্লিশের আগস্টে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বাঙালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তা উৎখাতের অভিযান। ডিসেম্বরের শুরুতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়। আটচল্লিশের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পূর্ব বাংলার অন্যতম সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবী জানালে তীব্র কটাক্ষ সহকারে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ২১শে ও ২৪শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এসব উক্তি ও সুপারিশের পাশাপাশি বাংলাকে নির্বাসন দিয়ে বিভিন্ন সরকারী পর্যায়ে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে।

বাংলা ভাষাকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বর্ণমালা উৎখাতেরও চক্রান্ত শুরু হয়। আটচল্লিশ সালের ডিসেম্বরে নিখিল পাক শিক্ষক সম্মেলনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী (কার্যত উর্দু) হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেন। উনপঞ্চাশ সালের ফেব্রুয়ারীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় আরবীকে একমাত্র বর্ণমালা হিসেবে গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। পঞ্চাশের এপ্রিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরবী হরফে বাংলা শেখানোর জন্যে ২০টি কেন্দ্র চালু করা হয়।

বাংলা ভাষা ও বর্ণমালাকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে বায়ান্ন সালের প্রথমভাগে। ঔপনিবেশিক শাসকদের এসব উদ্যোগ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, বিশেষতঃ ছাত্র সমাজ শুরু থেকেই রুখে দাঁড়ায়। প্রতিটি অশুভ পদক্ষেপের বিরুদ্ধেই বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রতিবাদ জানায় এবং ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্মঘট করে। ফলে সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে তারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং তথাকথিত ইসলামী ও পাকিস্তানী আদর্শকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সরল ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তা ছাড়া অর্থ ও পদের প্রলোভন এবং নানা প্রকার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে ভাংগন ধরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও

বাংলাদেশের তৎকালীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং ছাত্র সমাজ বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ ছিলো। তাই ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন যখন আবার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেন এবং তার ফলে সরকারী চক্রান্ত ফাঁস হয়ে পড়ে তখন সর্বত্র বিক্ষোভ-বহ্নি জ্বলে উঠে। ঢাকার ছাত্র সমাজ সর্বশক্তিতে এই অশুভ উদ্যোগকে রুখে দাঁড়ায়। এরই পরিণতিতে ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নে বাঙালীর রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারীর আঘাত বাঙালীর সমগ্র চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের মানুষও সচেতন এবং সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তাদের প্রকাশ্য তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। একুশের চেতনারই ফলশ্রুতি হিসেবে '৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে। বাঙালীর সার্বজনীন দাবী হিসেবে শেষ পর্যন্ত বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবেও স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সরকারীভাবে স্বীকৃতি পেলেও কার্যক্ষেত্রে নানা প্রকার শঠতা ও চক্রান্তের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা ও কোণঠাসা করা হয়। তাছাড়া এবারে শুরু হয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার কূট চক্রান্ত।

প্রথমেই শুরু হয় বাঙালীর নাম ভুলানোর চেষ্টা। এতোদিন সরকারী কাগজপত্রে এবং জনসাধারণের মুখে মুখে বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা নামে অভিহিত হলেও তথাকথিত পাকিস্তানী আদর্শ এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দোহাই দিয়ে পূর্ব বাংলাকে সরকারীভাবে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। যারা এর পরেও বেসরকারীভাবে পুর্ব বাংলা নাম ব্যবহার করতেন তাদের উপর নানা প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয়। দেশের নাম ছাড়াও প্রায় সর্বত্র বাংলা নামের জায়গায় পাকিস্তানী বা তথাকথিত মুসলমানী নাম প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। স্থানের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, দোকানপাট ও সিনেমা হলের নাম, সম্বোধন, সাধারণ কথাবার্তা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পাকিস্তানী তথা উর্দু প্রচলনের হিড়িক পড়ে যায়। মন্ত্রীরা উজীর হয়ে যান, প্রেসিডেন্ট সদরে রূপান্তরিত হন। এক কথায় পাকিস্তানীদের ভাষায় তারা হিন্দু বাংলাকে মুসলমানী বাংলায় রূপান্তরে উঠে পড়ে লাগে।

কিন্তু তাদের এই ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা শুধু হাস্যকরই নয়, স্ববিরোধীও ছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুল-কলেজে রমজানের ছুটি ছিল না, অথচ, পূর্ব পাকিস্তানে তা চালু করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও তক্ষশীলার সভ্যতা পাকিস্তানী, 'পূর্ব পাকিস্তানে' হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা বিজাতীয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, নজরুল ইসলাম পাকিস্তানী। আরবী ফারসী শব্দ থাকলে ইসলামী ভাষা খাঁটি—বাংলা শব্দ থাকলে বিজাতীয় ভাষা। পশ্চিম বাংলার বই আমদানি বন্ধ, অথচ পশ্চিমা অশ্লীল সাহিত্য আমদানিতে বাধা নেই। আসলে বাঙালী সংস্কৃতিকে বিকৃত ও পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে তারা জেনেশুনেই এসব হাস্যকর ও স্ববিরোধী তৎপরতা চালায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র চলে আরো সুক্ষ্মভাবে। এখানেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তথাকথিত ইসলামী ও পাকিস্তানী আদর্শকে। বেতার, টেলিভিশন এবং সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোতে শুধু খাঁটি বাংলা শব্দ নয়, বাঙালীঃ চিন্তাধারাকেও নির্বাসন দেওয়া হয়। এগুলো প্রধানত বশংবদ এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীর করায়ত্ত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা এবং বিভিন্ন কালা-কানুনের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশের পথ রুদ্ধ করা হয়। এর ফলে প্রবীণ সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চা সীমাবদ্ধ ও নির্জীব হয়ে পড়ে এবং নবীনরা বিভ্রান্তি ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃতির শিকার হন। নিজস্ব আশা-আকাঙ্খা ও ব্যথা-বেদনার পরিবর্তে বাইরের কৃত্রিম বিষয়বস্তু নিয়ে প্রাণহীন ও চিন্তাহীন সাহিত্য চর্চা চলে। অপর পক্ষে বশংবদ ও সুবিধাভোগী শ্রেণী আমাদের মুল সাহিত্যধারাকে বিকৃত ও পঙ্গু করার কাজে পুরোদমে এগিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। তাই তাঁকে সাহিত্য ও চিন্তাধারার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসন দিয়ে বাঙালী সত্তাকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র আইয়ুবের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন এবং তাঁর বাঙালী বশংবদ গভর্নর মোনেম খান এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে রবীন্দ্র সংগীত এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। সাহিত্য চর্চা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে আরো আড়ষ্ট এবং পঙ্গু করার জন্যে পশ্চিম বাংলার বই-পুস্তক আমদানিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাঁরা এর প্রতিবাদ করেন তাঁদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয় সেই বশংবদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্রেণীকে।

এ সময় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আরো পঙ্গু করার জন্য এবং সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন ও পারিতোষিকের মাধ্যমে বিপথগামী করার জন্যে কতকগুলো নতুন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠন করা হয়। এগুলোর মধ্যে পাকিস্তান কাউন্সিল, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। পাকিস্তান কাউন্সিলও জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিলো পাকিস্তান ও তথাকথিত ইসলামী আদর্শ প্রচার। কিন্তু এগুলোর প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিলো বাঙালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে নস্যাৎ করা। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তারা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 'মস্তিষ্ক শুদ্ধি অভিযান' চালায় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করে তাদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার প্রয়াস পায়। বাংলা একাডেমী এদেশের ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্যে অজস্র অর্থ ব্যয়ে পাল্টা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী থেকে বাঙালী সংস্কৃতিমনা পন্ডিত ব্যক্তিদের তাড়িয়ে এবং সে স্থলে বশংবদ ও সাম্প্রদায়িকতাবীদের নিয়োগ করে প্রত্যক্ষভাবে এর উদ্দেশ্যকে বানচাল করার চেষ্টা চলে। একাডেমীর কর্মসুচীতেও পাকিস্তানী এবং তথাকথিত ইসলামী ভাবধারা ও বিষয়বস্তু প্রবর্তন করা হয়। বাংলা একাডেমী যখনই কোন গঠনমুলক উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখনই পাল্টা প্রতিষ্ঠানটি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তা নস্যাৎ করার জন্যে প্রচ্ছন্নভাবে তৎপর হয়। বুদ্ধিজীবীদের

স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যখনই কোন প্রচেষ্টা চলেছে তখনই দেখা গেছে বিকল্প সংস্থার মাধ্যমে তার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা। ১৯৬৭ সালে বেসরকারী উদ্যোগে স্বাধীন চিন্তাধারা বিকাশের জন্যে ইতিহাস পরিষদ গঠিত হলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাল্টা একটি সংস্থা গঠন করা হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে নস্যাৎ করার জন্যে এ ধরনের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাঙালীর বুদ্ধিচর্চা ও জ্ঞান সাধনাকে অংকুরেই আড়ষ্ট ও বিনষ্ট করার জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এক গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলে। ইসলামী রাষ্ট্রের অজুহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু পাকিস্তানী করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে। এর ফলে কেবল রবীন্দ্রনাথ কিংবা পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকরাই বাদ পড়েননি, এদেশের প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল লেখকরাও বর্জিত হন। পাঠ্য বইয়ের ভাষায় তথাকথিত ইসলামী পোশাক পরানো হয়, ভাব ও চিন্তাধারায় এ দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কে ছিন্ন করা হয় এবং বিষয়বস্তু প্রধানত আরব জগৎ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হয়। বাঙালীর নিজস্ব আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। এদিকে নানাভাবে শিক্ষা সংকোচন পুরোদমে অব্যাহত থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭-'৪৮ সালে যেখানে 'পূর্ব পাকিস্তানে' ১৯ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র সাড়ে ৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো, সেখানে ১৯৬৮-'৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে তা সাড়ে ১৭ হাজার হ্রাস পায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৩ হাজার বৃদ্ধি পায়।

প্রকাশকরা পাঠ্যবই ছাড়া প্রধানত ডিটেকটিভ ও বিকৃত রুচির বই প্রকাশে তৎপর হন। কারণ ইতিমধ্যেই এক শ্রেণীর পাঠকের, বিশেষত কোমল প্রকৃতির ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি বিকৃতি ঘটানো হয়। তাই উন্নতমানের চিন্তাশীল লেখার তেমন কদর ছিলো না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো বিকৃতি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাদের মানসিকতা ও চিন্তাধারা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বাধীন চিন্তাধারা সংকোচন এবং ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। কিন্তু সেখানে শিক্ষাবিদদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হামলাই সবচাইতে প্রকট হয়ে উঠে। ১৯৬৩ সালের হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন শিক্ষকদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ করে। গুরুত্বপুর্ণ পদ থেকে সত্যিকারের পন্ডিতও বাঙালী সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের অপসারণ করে বশংধরদের নিয়োগ করার জন্যে নানা প্রকার কারসাজির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাবিদদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এ ছাড়া বশংবদদের সরকারের কাছে গোপনে নানা প্রকার সত্য মিথ্যা রিপোর্ট দিতে থাকে। কোন কোন সময় সরকারঘোষিত ছাত্র সংস্থাগুলো তাদের উপর হামলা চালায়। যেসব শিক্ষক চাপ ও হয়রানির মুখেও নীতিতে অটল ছিলেন তাঁদের কখনো সরাসরি পদচ্যুত করা হয়, কখনও নিম্নতম পদে নামিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া তাঁদের উপর হয়রানির মাত্রাও বেড়ে যায়। অতিষ্ঠ হয়ে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতার

পেশা ছেড়ে দেন, কেউ কেউ মনের দুঃখে দেশত্যাগ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষকের এতখানি অমর্যাদার দৃষ্টান্ত সম্ভবত আর কোথাও নেই।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তি এমনি ধারায় বাংলাদেশের শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী বুদ্ধিসত্তাকে নির্মুল করার কূট কৌশল অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশের চিত্রকলা, সংগীত, লৌকিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে কোণঠাসা করার এবং সেখানেও পাকিস্তানী আদর্শ অনুপ্রবেশ করানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চলে। এখানকার বিশিষ্ট ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের একঘরে করে রাখা হয় এবং তাঁদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়। সংস্কৃতি বলতে তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতিরই সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। বাঙালীর নববর্ষের উৎসব, বাংলার ঋতুবরণ অনুষ্ঠান, লোকসংগীত চর্চা প্রভৃতিকে পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী আখ্যায়িত করে উৎখাতের জন্যে রীতিমত জেহাদ চালানো হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ঔপনিবেশিক বাজার এলাকায় পরিণত করার এবং বাঙালীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত করার জন্যে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে চক্রান্তমুলক অভিযান চলে; তা এখন সাধারণ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রেও হয়রানির মাধ্যমে উৎখাত করার এবং ভয়-ভীতি, লোভ ও প্রলোভনের মাধ্যমে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

ঐতিহাসিক পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন স্তরের প্রতিভাবান এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের চরিত্রহীন, বিপথগামী এবং মানসিক দিক দিয়ে পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় করার অভিযান চলে। এর মধ্যে অনেকের উপর জেল-জুলুম এবং দৈহিক নির্যাতনও হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে বুদ্ধিজীবীদের খতম করারও যে ষড়যন্ত্র হয়নি তা নয়। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সুদুর বৈরুতের একটি হোটেলে সর্বজনপ্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এবং ১৯৬৯ সালের ৩১শে মে পিন্ডির একটি হোটেলে ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনের নিঃসহায় অবস্থায় রহস্যজনক মৃত্যু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর গৌরব এই দু'টি প্রতিভাকে পাকিস্তানী শাসকদের হাতে বহু লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন বরণ করতে হয়েছে। তাই এঁদের এই মৃত্যুর পিছেন গভীর ষড়যন্ত্র ছিলো বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

পঁচিশে মার্চের পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর যে সুপরিকল্পিত হত্যালীলা চালানো হয় সে সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন দি ইউনিভার্সিটি ইমার্জেন্সি' নামক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার ১৯৭১ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত বিবৃতির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি....বিশ্ববিদ্যালয় যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলো তা সুস্পষ্ট। হতভাগ্যদের একটি বিশেষ তালিকা অনুসরণে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই হত্যাকান্ড চালানো হয়েছে বলে মনে হয়। তালিকাটি সম্ভবতঃ বিগত শরৎকালে প্রস্তুত করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ উক্ত তালিকায় বিশিষ্ট শিক্ষক এবং ছাত্রদের নাম ঠিকানা ছাড়া বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সংগীতজ্ঞ এবং লেখকদেরও নাম-ঠিকানা রয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, পরিকল্পনা অনুযায়ীই

গণহত্যা চালানো হয়েছে। সিনিয়র প্রফেসরদের খোলা জায়গায় টেনে এনে গুলী করা হয়। নারী ও শিশুসহ তাদের পরিবারের লোকদেরও হত্যা করা হয়। স্পষ্টতই মনে হয় এই আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে, বিশেষতঃ বাঙালী সংস্কৃতির অগ্রনায়ক ও অনুসারীদের এক বিরাট অংশকে নিশ্চিহ্ন করা।

বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে পাকিস্তানী পশু শক্তির উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিশ্বের এই মনীষিগণ যথার্থরূপেই বর্ণনা করেছেন। হানাদাররা ২৫শে মার্চের রাত ১১টার দিকে যে নির্মূল অভিযান চালায় তাতে বেছে বেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের আবাসগুলো এবং কয়েকটি পত্রিকা অফিসে বিশেষভাবে আঘাত হানে। এক হিসেব অনুযায়ী তারা শুধুমাত্র হলেই ৩৪০ জন ছাত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে (সাবেক ইকবাল হল) বীরের ন্যায় লড়াই করে ২০০ জন ছাত্র মৃত্যুবরণ করে। বুদ্ধিজীবীদেরও এমনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সংবাদপত্রের তথ্যানুযায়ী অভিযানের শুরুতেই কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ১০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে হত্যা করা হয়।

এই হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই চালানো হয়। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বিশেষত যেসব জায়গায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও সৈন্যঘাঁটি ছিলো সেখানে যুগপৎভাবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযান চলে। যেসব এলাকা পরবর্তীকালে হানাদার কবলিত হয় সেখানে হত্যাযজ্ঞ বিলম্বিত হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে অনেকেই প্রাণের ভয়ে সরে পড়েন কিংবা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই প্রথম আঘাতের পর সরে পড়েন। এর ফলে নিয়মিত কাজকর্মে বিশৃংখলা ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়। হানাদাররা এতে তাদের কার্যধারা পরিবর্তন করে। ইতিমধ্যে বহির্জগতে তাদের পাশবিক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা হয়। সে জন্যেও তারা সাময়িকভাবে প্রকাশ্য হত্যা অভিযান বন্ধ রাখে। তাছাড়া শিকার যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায়, সে কারণেও তারা বাহ্যত উদারতা প্রদর্শন করে। আগস্ট মাসে ইয়াহিয়া খান যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন তার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিলো। এতে একদিকে বাইরের জগতকে ধোঁকা দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে শিকার হাত করার পথ উন্মুক্ত করা হয়। বস্তুত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা ভারতে পালিয়ে না গিয়ে গ্রামে বা নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করেন, তাদের অনেকেই ইয়াহিয়ার আশ্বাসে প্রতারিত হয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসেন। অনেকে জীবন ও জীবিকার তাগিদেও পুনরায় কাজে যোগদান করেন।

কিন্তু এ সময়ে সাধারণত প্রকাশ্যে হত্যাকান্ড না হলেও ভিতরে ভিতরে নির্মূল অভিযান অব্যাহত থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর গোপনে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়। বাঙালী সংস্কৃতিমনা বুদ্ধিজীবীদের তালিকা গণআন্দোলনের সময়ই প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু সেটি সাধারণ তালিকা। তখন হয়ত এঁদের ব্যাপারে অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা

চিন্তা করা হয়েছিলো। কিংবা এঁদের মধ্যে কাদের হত্যা করা হবে তা নির্ধারিত হয়নি। যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হবে তার চূড়ান্ত তালিকা সম্ভবত ২৫শে মার্চের পরেই তৈরী করা হয়। জল্লাদদের যে একটি ডায়েরী পাওয়া গেছে তাতে ডায়েরীর, ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত তালিকা দেখা যায়। সম্ভবত তখনো চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হয়নি। সঙ্গোধন ও সংযোজনের কাজ চলছিলো।

হানাদাররা পরাভূত হবে কিংবা মাত্র ৯ মাসের মধ্যে তাদের ভরাডুবি হবে একথা কল্পনা করেনি। সে জন্যেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলেও বাস্তবায়নে তাদের বিলম্ব হয়। ৩রা ডিসেম্বর সম্মিলিত আক্রমণের মুখেও তাদের টনক নড়েনি। এমন কি চরম পরাজয়ের মুখেও বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌ বহরের আবির্ভাবে তারা জয়ের আশা ছেড়ে দেয়নি। তারা ভেবেছিলো যে, শিকার তো হাতের মুঠোতেই রয়ে গেছে, তাই এঁদের খতম করতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। অবশ্য ইতিমধ্যে চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী বশংবদ আল-বদরদের উপর বেছে বেছে হত্যা অভিযান চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে হত্যাযজ্ঞের মূল নায়ক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী যখন আত্মসমর্পণের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে, তখনই আল-বদরেরা সর্বপ্রথম তৎপর হয় এবং বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ শুরু করে। ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার গভর্নর হাউসের (বর্তমান বঙ্গভবন) উপর বোমাবর্ষণের পর যখন মালিক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে তখনই তাদের সকল আশা ধূলিস্মাৎ হয়। বস্তুত এ সময় থেকেই বুদ্ধিজীবীদের নিধনযজ্ঞ শুরু হয় এবং তা সম্ভবত দেশ মুক্ত হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। কারণ করো কারো মতে মীরপুরে জহির রায়হানের অন্তর্ধানের ঘটনা এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের রহস্যজনক মৃত্যুর পিছেনেও আল-বদরের হাত রয়েছে।

খুনী জল্লাদদের তাড়াহুড়ার মধ্যে তাদের নিধনযজ্ঞ চালায়। কারণ তারা ভাবতে পারেনি যে এতো অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মুক্ত হবে। এ সময়ের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেও তারা ব্যস্ত হয়ে উঠে। তারা যদি নিরাপদভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর দু'একদিন সময় পেতো তাহলে বাংলাদেশের আরো অনেক অমূল্য জীবন এদের নরমেধযজ্ঞের শিকার হতো।

মার্চের বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞের ন্যায় ডিসেম্বরের নিধনযজ্ঞও যুগপৎভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগঠিত হয়। শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, আইনজীবী, চিকিৎসক, রাজনৈতিক নেতা, পদস্থ সরকারী কর্মচারী কেউই বাদ পড়েনি। সকল দিক দিয়ে বাংলাদেশের মস্তিষ্ককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের নয় মাস পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আল-বদর জামায়াত চক্র ৩০ লক্ষ বাঙালী হত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশে সৃষ্টি করেছিল অসংখ্য অগণিত

নারকীয় বন্দীশিবির। একাত্তরে পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে প্রিজনার্স ক্যাম্পগুলো। জেলা ও মহকুমা পর্যায়েও পাক হানাদার বাহিনী যেখানেই দখল প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানেই বন্দী শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রিজনার্স ক্যাম্প ও টর্চার করার অন্যান্য সেন্টার ছাড়াও ঢাকা শহরে আরো কতকগুলো ভয়াবহ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ছিল শেরে বাংলা নগরের তৎকালীন সংসদ ভবন, এমপি হোস্টেল এবং তেজগাঁও বিমান বন্দরের আশেপাশের এলাকায়। একটি জাতির মুক্তির আকাঙ্খা এবং স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধূলায় লুণ্ঠিত করার পৈশাচিক মনোবৃত্তি নিয়ে পাক বর্বররা বন্দী শিবিরে আটক অসহায় মানুষদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। বন্দীদের উপর প্রয়োগ করা হতো নির্যাতনের সব রকম হিংস্র, বর্বর ও মধ্যযুগীয় বিকৃত পদ্ধতি। পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরে নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। অনেকে হয়েছেন নিখোঁজ। বন্দী শিবির থেকে যাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন তাদের মধ্যেও কেউ কেউ পরবর্তীতে নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। অনেকে আজো সেই নৃশংস নির্যাতনের স্মৃতিচিহ্ন শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬ নম্বর আসামী, ষাটের দশকের মধ্যভাগে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্মকর্তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম রাজনৈতিক পরামর্শদাতা আহমেদ ফজলুর রহমান একাত্তরে পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরে আটক ছিলেন। পাক হানাদারদের হাতে বন্দী হওয়া এবং বন্দী শিবিরের দুঃসহ দিনগুলি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'একাত্তরের ৭ কিংবা ৮ এপ্রিল রাত ন'টায় একজন মেজরের নেতৃত্বে একদল পাক সেনা আমার ধানমন্ডির বাসায় আসে আমাকে ধরার জন্য। তারা আমাকে জীপে তুলে সোজা নিয়ে যায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস অফিসের সামনে। সেখানে জীপের মধ্যে প্রায় দু'ঘন্টা আমাকে বসিয়ে রাখা হয়। কয়েকজন পাক সেনাকে দেখলাম ওয়ারলেসে আমার সম্পর্কে কি যেন বলছে। খুব সম্ভবত তারা রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করছিল। সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের একটি ছোট টিনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আরও দু'জন বন্দী আগেই সেখানে ছিলেন। তারা হচ্ছেন এ ও. কোম্পানীর তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার আলমগীর রহমান এবং কুষ্টিয়ার তৎকালীন এসপি। তাঁরা টেবিলে বসে কি যেন লিখছিলেন। কথা বলতে চাইলে দু'জনেই হাতের ইশারায় আমাকে বারণ করলেন। দু'রাত এখানেই কাটলো। পানি ছাড়া কোন খাবার দেয়া হলো না। এরপর আমাদের তিনজনকেই নিয়ে যাওয়া হলো একটি বড় টিনের ঘরে। পাশাপাশি ছয়টি ঘরের প্রতিটিতেই বাঙালী বন্দী। আমাদের রুমে আরও তিনজন নতুন বন্দী আনা হলো। এরা হচ্ছেন টিএন্ডটির তৎকালীন প্রধান লোকমান হোসেন, তৎকালীন ডিরেক্টর মাকসুদ আলী খান এবং একজন বাঙালী সুবেদার। একদিন এক স্বাস্থ্যবান যুবককে ধরে আনা হলো এখানে।

তাকে বিজয়নগরের একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁ থেকে তুলে আনা হয়েছিলো রাজশাহীর জনৈক ছাত্রনেতা মনে করে। আসলে এই যুবকটি ছিলো বংশালের বাসিন্দা। তাকে পাশের টর্চার চেম্বারে নিয়ে প্রচন্ড মারধর করা হলো। সেই রাতেই টর্চারের ফলে সে মারা গেল। লাশটি এনে কিছুক্ষণ রাখা হলো বন্দীদেরই একটি ঘরের মধ্যে। আর একদিন আর্মি সিগন্যাল কোরের ১২ জন বাঙালী সদস্যকে ধরে আনা হলো টর্চার চেম্বারে। পৈশাচিক নির্যাতনে প্রথম দিনই তিনজন মারা গেল। পরদিন মারা গেল আরও পাঁচজন। একজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় রুমে এনে রাখা হলো। মুমূর্ষ লোকটি পানি পানি বলে কাঁদছিলো। কান্না শুনে আমাদের মধ্যের একজন বন্দী পানি দিতে গেলে তাকেও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ভয়াবহ পরিবেশে ৫/৬ দিন কাটানোর পর আমাকে একটি বড় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়। এখানে আসার পর খাতায় নাম লেখা হলো। আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হলাম আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে। নাম লেখানোর পরপরই এক সেপাই হঠাৎ করে আমার নাকের উপর প্রচন্ড ঘুষি বসালো। পাবনার এক এসডিও মনে করে আমাকে লাঠি দিয়ে পেটানোর আয়োজন করা হলো। এই এসডিও পাবনা থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে নিয়ে গেল শেরে বাংলা নগরের তৎকালীন এমপি হোস্টেলে এবং সেখানে থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। শেরে বাংলা নগরে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে আমাকে দু'দিন দু'রাত একটানা প্রচন্ড টর্চার করা হয়। আমার শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠে। জেলে নেয়ার পর কিছুটা নিরাপদ বোধ করি। জেলে বসে মুক্তিবাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর পেলাম। বিজয়–এর পর ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের নির্দেশে আমাদের মুক্তি দেয়া হলো।'

একাত্তরে চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রেজিমেন্টাল সেন্টার কমান্ড্যান্ট, চট্টগ্রাম স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার ২৭ মার্চ পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হন। ১ মার্চের পর থেকেই তিনি শেখ মুজিবুর রহমান, কর্ণেল ওসমানী, এম আর সিদ্দিকী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে গোপনে যোগাযোগ শুরু করেন। এ সময় তাঁর ও কর্ণেল ওসমানীর মধ্যে বাহক হিসেবে কাজ করতেন ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার পাক হানাদারদের হাতে ধৃত হওয়া এবং বন্দী শিবিরের দিনগুলি সম্পর্কে বলেন, '৭১ এর ১ মার্চ চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনীতে পশ্চিমা সৈনিকদের গোলাগুলিতে অনেক বাঙালী হতাহত হন। তাদের ঘরবাড়ি পুড়ে যায় এবং ব্যাপক গণবিক্ষোভ জেগে ওঠে। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য লেঃ জেনারেল ইয়াকুব খান তখন পাঞ্জাবী কর্মকর্তার স্থলে আমাকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে নিয়োগ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি পশ্চিমা অফিসার ও সৈনিকদেরকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনি।

সশস্ত্র বাঙালী সৈনিকদের (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের) বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ জায়গায় মোতায়েন করি। এছাড়া করাচী থেকে অস্ত্র বোঝাই হয়ে আসা যুদ্ধ জাহাজ এম ভি সোয়াত থেকে মাল খালাস করতেও ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করি। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পাক মিলিটারি হাইকম্যান্ড আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে এবং টিক্কা খানের নির্দেশে আমাকে ২৪ মার্চ ঢাকা নিয়ে আসা হয়।'

'২৭ মার্চ সকালে পাক বাহিনী আক্রমণের মনোভাব নিয়ে আমার গেন্ডারিয়ার বাসা ঘেরাও করলো। দু'জন লেঃ কর্নেল বাসার মধ্যে ঢুকে আমাকে খুঁজলো। জীপে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি পরিত্যক্ত বাসায়। আমার স্ত্রী ও ছেলেদেরও এখানে পেলাম। তাদের ২৬ মার্চ সকালে পাক বাহিনী চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা নিয়ে আসে। দু'রাত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেই কাটলো। ৩০ মার্চ রাত দু'টোয় হঠাৎ করে আমাদেরকে ঢাকা বিমান বন্দরে নিয়ে করাচীগামী প্লেনে উঠিয়ে দেয়া হয়। করাচী থেকে মালীর ক্যান্টনমেন্ট এবং তারপর আবার স্থানান্তর। পাঠানো হলো খারিয়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৮/১০ মাইল দুরে গভীর জংগলের মধ্যে কাঁটাতারে ঘেরা এক ডাকবাংলোতে। চারদিকে সেপাইদের কড়া প্রহরা। ১ এপ্রিল থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত রাখা হলো এখানে। প্রতিদিন আমাকে এখান থেকে ইন্টেরোগেশনের জন্য ১০ মাইল দুরে জেলাম ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া শুরু হলো।

সকালে নিয়ে গিয়ে সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদ চলতো। মাঝে মাঝে রাতেও এসে জিজ্ঞাসাবাদের সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের আর্মি বিদ্রোহের প্ল্যানার কে? আমি বলতাম যে এটা কোন পরিকল্পিত বিদ্রোহ নয়। একদিন ইন্টেলিজেন্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ব্রিগেডিয়ার বললো, 'তুমি শেখ মুজিবের ইচ্ছার প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের পুরো আর্মি বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছো এবং তা শেখ মুজিব ও ভারতীয় ইস্টার্ন কম্যান্ডের কাছে সরবরাহ করেছ। তুমি এসব স্বীকার করো। বাঙালী লেঃ কর্নেল ইয়াসীন তোমার সম্পর্কে এসব বলেছে। আমি সবকিছু অস্বীকার করার ফলে আমাকে একা লাহোরে স্পেশাল পুলিশের হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। স্ত্রী ও ছেলেদের ঢাকায় ফেরত পাঠানো হলো। এখানে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড সেলে আমাকে নিঃসঙ্গভাবে থাকতে হলো। ইন্সপেক্টর দুররানী এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো এবং কর্নেল ইয়াসীন যা বলেছে সে সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো। অস্বীকার করায় আমাকে সে প্রচন্ড এক থাপ্পড় মারলো। আমি চেয়ার থেকে পড়ে গেলাম। এটাই ছিল আমার উপর প্রথম দৈহিক আক্রমণ। পায়জামা ছিঁড়ে উলঙ্গ করে আমি হিন্দু না মুসলমান তা পরীক্ষা করা হলো। এরপর কয়েকদিন পৈশাচিক নির্যাতন চললো। রেক্টামে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার রেক্টাম ফুলে গেল আমার। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ১৫ দিন টর্চারের পর ওদের কথামতো বিবৃতি দিতে বাধ্য হলাম। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের পর আমাকে মালাকান ফোর্টে ও সীমান্তের অন্যান্য দুর্গে রাখা হয়।

১৭টি জেল ও দুর্গে আমাকে ঘুরানো হয়েছিল। '৭৩-এর ডিসেম্বর মাসে আমার ২১ মাসের নৃশংস জীবনের অবসান হয়। পাকিস্তান-বাংলাদেশ বন্দী বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে আমি ফিরে আসি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে।'

একাত্তরে চট্টগ্রাম ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের তরুণ লেফট্যান্যান্ট এবং বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক শামসের মোবিন চৌধুরী, বীর বিক্রম ১১ এপ্রিল পাক বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধের সময় আহত অবস্থায় বন্দী হন। ২৮ মার্চ তিনি নিজের নামে একবার কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন। পাক হানাদারদের হাতে পড়া এবং বন্দী শিবিরের জীবন সম্পর্কে শামসের মোবিন চৌধুরী বলেনঃ 'একাত্তরের ১১ এপ্রিল কালুরঘাট ব্রীজের উপর পাক হানাদারদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ হচ্ছিলো। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হারুন আহমেদ চৌধুরী (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ও আমার নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন বাঙালী সৈনিক অংশ নিয়েছিল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র তথা চট্টগ্রাম শহর শেষরক্ষা করার জন্য। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে আমার বাঁ পায়ে গুলী লাগে। আমি কভারেজ দেওয়ায় হারুন আহমেদ চৌধুরীসহ অন্যরা কোন রকমে সরে পড়তে সক্ষম হন। গুরুতর আহত অবস্থায় পাক সৈন্যরা আমাকে টেনে-হিঁচড়ে জীপে নিয়ে তোলে। রাস্তা দিয়ে বাঁ পা ধরে টানার সময় আমার পিঠের চামড়া ফেটে রক্তাক্ত হয়। এ সময় হানাদাররা বলতে লাগলো, 'ইউ আর শামসের- ইউ আর ব্লাডি চ্যাপ-স্পোকেন অন দি রেডিও। উই আর অল লুকিং ফর ইউ।' প্রথম আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে তৎকালীন মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে এবং সেখান থেকে নেভাল হসপিটালে। একটি ছোটখাটো অপারেশন করা হলো। ১৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম সি এম এইচে নেয়ার জন্য আমাকে এম্বুলেন্সে উঠানো হলো--যে এম্বুলেন্সে দু'জন পাকিস্তানী আহত সৈনিকও ছিল। তারা আমাকে চিনতে পেরেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং সজোরে আমার কণ্ঠ চেপে ধরলো। এম্বুলেন্সের চালক আমাকে রক্ষা করলো। সি এম এইচে আমার জন্য জেনারেল ওয়ার্ডের একটি বেড বরাদ্দ হলো। সেদিনই সন্ধ্যায় পাক বাহিনীর পাঞ্জাবী মেজর মোহর কামাল আমার উপর হঠাৎ এসে আক্রমণ করলো। ঘুষি, থাপ্পড় মেরে আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরালো। গাল দিতে দিতে বললো, 'ব্লাডি ট্রেইটর মার্ডারার। উই উইল কিল অল অব ইউ।' পকেট থেকে বেয়নেট বের করে সে আমার বুকের উপর তিনবার আঘাত করলো এবং বললো, 'আই উইল টেক ইউর আইজ আউট।' এ সময় একজন সিন্ধী নার্সিং সৈনিক দৌড়ে এসে সেই বর্বর মেজরের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিল। আমি প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। সিন্ধী সৈনিকটি মরফিন দিয়ে আমাকে ঘুমোতে সাহায্য করলো। আমার জীবন রক্ষা পেল। এরপর থেকে প্রায়ই এরকম অত্যাচার চলতে লাগল। মাঝে মাঝে ভোরবেলা হান্টার-এর আঘাতে ঘুম ভাঙ্গতো। ভাঙ্গা পা উপরে টেনে তুলে ফেলে দিয়ে ব্যথা দেওয়া

হতো। মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট ছিলে নামমাত্র। শুধু ড্রেসিং করানো হতো। দশদিন এভাবে রাখার পর ২৪ এপ্রিল পাঠানো হলো ঢাকা সি এম এইচে। এখানে জেনারেল ওয়ার্ডেও আমাকে জায়গা দেওয়া হলো না। মাঠের মধ্যে একটি তাবুতে ফেলে রাখা হলো। কোন ওষুধও পাওয়া গেল না। ৭ মে স্ট্রেচারে করে ইন্টারোগেশনের জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ফিল্ড ইন্টারোগেশন ইউনিটে। পা ব্যান্ডেজে বাঁধা ছিল। মেজর ফারুকী ও ক্যাপ্টেন জাকের ইন্টারোগেশনের সময় বললো, 'প্ল্যান বাতাও। যুদ্ধ সে প্ল্যান বাতাও।' আমি বললাম, 'যুদ্ধের কোন প্ল্যানই ছিল না'। এ যুদ্ধ ছিল স্বতঃস্ফুর্ত। তখনই শুরু হলো বেদম প্রহার। ১০ দিন ও ১০ রাত ধরে থেমে থেমে একটানা ইন্টেরোগেশন চললো। সব ঘটনা লিখতে বলা হলো। আমি স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে ৯০ পাতার একটি বিবৃতি লিখে দিলাম। বিবৃতিতে ২৬ মার্চের পর থেকে আমি মেজর জিয়ার সহযোগী হিসেবে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যেসব কর্মাকান্ড করেছিলাম তা স্বীকার করলাম। ১৮ মে সি এম এইচ থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রিজন ক্যাম্পে পাঠানো হলো। এয়ার ফোর্স এমিউনেশন ড্যাম্পের এই পরিত্যক্ত গোডাউনের এক একটি ছোট ঘরে ১৪/১৫ জন বন্দী রাখা হতো। আমার সেলে ছিলেন এম ই এস কর্মচারী নুরুল হুদা, রমনা থানার তৎকালীন ওসি লোদী ('৭২-এর জানুয়ারিতে মিরপুরে রাজাকার আল-বদরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত) প্রমুখ। এখানেও আমার উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো। স্ট্রেচার থেকে মাটিতে ফেলে লাঠি, বেত দিয়ে পেটানো হতো। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমাদের শেরে বাংলা নগরের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হলো। ইন্টারোগেশন ইউনিট পাক মেজর ফারুকী আমার কাছে থেকে বিবৃতি আদায় করতে চাইলো যে ২৫ মার্চের আগে থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য। এবং এসব মেসেজের অনেকটা ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মাধ্যমে ও জিয়াউর রহমানের সাহায্যে পাঠানো হতো। ইবিআর এর এ্যাডজুটেন্ট হিসেবে আমিও এর সবকিছু জানতাম—তা আমাকে লিখতে বলা হলো। আমি মেজর ফারুকীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। কেননা এর আগেই আমি ৯০ পাতার একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলাম ২৬ মার্চ ও পরবর্তীতে আমার কর্মকান্ড স্বীকার করে। ১৭ ডিসেম্বরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমি মুক্তি পাই। বন্দী শিবিরে আট মাসে আমার পায়ের কোন চিকিৎসাই করা হয়নি। যার জন্যে আজও খুঁড়িয়ে হাঁটি।'

একাত্তরে গোয়ালন্দের এসডিও ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ ২১ এপ্রিল পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হন। ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি পাক বাহিনীর বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক ছিলেন। শাহ মোহাম্মদ ফরিদ তাঁর বন্দী জীবন সম্পর্কে বলেনঃ '৭১-এর ২১ এপ্রিল পাক বাহিনী গোয়ালন্দ ঘাট দখল করে নেয় এবং রাজবাড়ী শহরে প্রবেশ করে। ২১ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল আমাকে আমার

সরকারী বাসভবনের মধ্যেই গৃহবন্দী রাখা হয়। ২৯ এপ্রিল পাঠানো হলো ফরিদপুর সার্কিট হাউসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। দু'দিন এখানে বসে জিজ্ঞাসাবাদের পর পাক বাহিনীর ট্রাকে তুলে আমাকে ঢাকা পাঠানো হয়। ২ মে রাতটি কাটলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সেনা সদর দফতরের একটি কক্ষে। ৩ মে আমাকে ও কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে ভাওয়ালের রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। কর্নেল শফিউল্লাহর (বর্তমানে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিকরা এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভাওয়ালের রাজবাড়িতে প্রায় একমাস রাখা হলো আমাদেরকে। চললো ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। কিছুদিন পর বন্দী করে আনা হলো মাদারীপুরের তৎকালীন এসডিও সৈয়দ রেজাউল হায়াত ও তরুণ মুক্তিযোদ্ধা (৮ নম্বর সেক্টরে) কাজী ইকবালসহ (বর্তমানে চট্টগ্রামের জেমস ফিনলে কোম্পানীর কর্মকর্তা) আরও কয়েকজনকে। আমাদেরকে নিঃসঙ্গ কক্ষে রাখা হতো। ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানালা বাইরে থেকে কাঠ এঁটে বন্ধ করা। অসম্ভব মশা। দিনের বেলাই লুংগি দিয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকতে হতো। খাবার দেয়া হতো দু'বেলা। সকালে এক মগ চা এবং রাতে চাপাতি আর ডাল। দুপুরে কোন খাবার নেই। মাঝে মাঝেই চলতো ইন্টারোগেশন। ইন্টারোগেশনে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তোমার কি শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল? অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলে কেন? কে তোমাদের হুকুম দিতো?' উত্তরে আমি বললাম, 'শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন কারো হুকুমে চলতো না। অসহযোগ আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।' পাক অফিসার আমার কথা বিশ্বাস করলো না। ক্ষিপ্ত হয়ে এবং তথ্য বের করার জন্য আমাকে লাঠি ও বেত দিয়ে নির্দয়ভাবে মারা হলো জিজ্ঞাসাবদের সময় সব বন্দীদের ভাগ্যেই একই ঘটনা ঘটতো। ৩ জুন আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এয়ারফোর্স এম্যুনেশন ড্যাম্পে। আবার শুরু হলো টর্চার। একদিন শুনতে পেলাম সিরাজগঞ্জের এসডিও এ কে এম শামসুদ্দিন আহমেদকে এখানে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। এয়ারফোর্স এম্যুনেশনের ড্যাম্পটি ছিল একটি দীর্ঘ টিনের গোডাউন। জুন মাসের অসহ্য গরমে ছটফট করতাম আমরা। এ সময় এক বন্দীকে দিয়ে আর এক বন্দীকে পিটানোর এক জঘন্য পদ্ধতি চালু করা হলো। এক বাঙালী আর এক বাঙালীকে পিটাতে না চাইলে পাক সেনারা তাকে হত্যা করার হুমকি দিতো। এক মাস পর ৪ জুলাই আমাকে শেরে বাংলা নগরের ফিল্ড ইন্টারোগেশন ইউনিটে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। ইন্টারোগেশন ইউনিটে দু'রাত নির্ঘুম রাখা হয়েছিল আমাকে। সারারাত চলেছিল টর্চার। জেলে আসার পর আর কোন টর্চার হয়নি। ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে আমরা জেল থেকে মুক্তি পাই।'

৫৭/৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক একাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বর্তমানে প্রফেসর পদে কর্ম সাদউদ্দিন ১৪ আগস্ট রাতে তার

ফ্লাট থেকে পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হন। '৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। হানাদারদের হাতে ধরা পড়া এবং বন্দী শিবিরের দিনগুলি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ '১৪ আগস্ট, ১৯৭১। রাত বারোটা বা সাড়ে বারোটায় প্রায় ৩০ জন পাক মিলিশিয়া আমার ১৬ নাম্বার ডি ফ্ল্যাটে হানা দেয়। দরজা খুলতেই তারা আমার বুকের উপর স্টেনগান তাক করে। আমাকে গেটে অপেক্ষমাণ জীপে নিয়ে উঠানো হলো। জীপে উঠে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষক আ স ম শহীদুল্লাহ, ইতিহাসের শিক্ষক ডঃ আবুল খায়ের (১৪ ডিসেম্বর জামাত ও বদর বাহিনীর হাতে নিহত) ও বাংলা বিভাগের রফিকুল ইসলামকে। আমাদের রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। পশ্চিমা পুলিশ অফিসারটি বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন সেরে বললো-কি কি করেছিলে? অসহযোগ আন্দোলনে কেন যোগ দিয়েছিলে?' আমরা বললাম আমরা কিছুই করিনি। অফিসারটি আমাদের উপর বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রাত ২টা/৩টার দিকে মিলিশিয়ারা চলে গেল। তখন বাঙালী ওসি বললো, 'আপনারা পালাননি কেন? আপনাদেরকে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কেয়ার টেকার দলিলউদ্দিনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম।' দলিলউদ্দিনকে দিয়ে ওসি খবর ঠিকই পাঠিয়েছিল- কিন্তু দলিলউদ্দিন যে কোন কারণেই হোক আমাদের খবরটি দেয়নি। সে রাতে আমাদের চারজনকে সোফায় বসিয়ে রাখা হলো। খুব ভোরবেলায় ওসি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলল ডঃ সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে দিলেন। আমার অন্যান্য সঙ্গীরাও কথা বললেন। এই ফোন করতে দেয়া এবং আলাপ করার অপরাধে পরবর্তীতে সেই ওসিকে পাক বাহিনী হত্যা করেছিল। ভোরবেলা পাক মিলিশিয়ারা আবার এসে আমাদেরকে শেরে বাংলা নগরের তৎকালীন সংসদ ভবনে নিয়ে যায়। ওখানে দেখলাম তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আক্তার উদ্দিন আহমদকে। তিনি পাক বাহিনীর অফিসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনা করছিলেন। ফিল্ড ইন্টারোগেশন ইউনিট-১ এ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। এক অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে শুরু হলো? অসহযোগ আন্দোলন কিভাবে হলো? আমি এবারও বললাম আমরা এর কিছুই জানি না। আমরা শুধু সব কিছু দেখেছি। শেরে বাংলা নগরে থাকতে হঠাৎ করে একদিন দিনের বেলা আমাদের রুমের দরোজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হলো। আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। দেখলাম বিমান বন্দরের রানওয়ে থেকে একটি বিমান উঠে গেল। পরে শুনলাম টিক্কা খান চলে গেছে এবং ডাঃ মালেক গভর্নর হয়েছে। টিক্কা খানের যাওয়া উপলক্ষ্যেই আমাদের দরোজা-জানালা বন্ধ করা হয়েছিল। আমাদেরকে থাকতে হয়েছিলো মেঝেতে। খাবার আসতো জেলখানা থেকে। একদিন খবর পেলাম আলতাফ মাহমুদকে আশেপাশের কোথাও টর্চার করে মেরে ফেলা হয়েছে। ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম আমাদের উল্টো দিকের রুমে রাখা

হয়েছিল সিভিল সার্ভিস অফিসার এ এন এম ইউসুফ ও নুরুল মোমেন খানকে। কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। তবুও সেন্ট্রিদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা ফিসফিস করে আলাপ করতাম। নুরুল মোমেন খান অবাক হলেন ফিল্ড ইন্টারোগেশন ইউনিটে নিয়েও আমাদেরকে টর্চার করা হয়নি বলে। কেননা ওখানে গিয়ে কেউই টর্চারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।'

এরপর আমাদের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নেওয়া হলো। জেলখানায় ইন্টারোগে-শনের জন্য আসলো পাক মেজর মোশতাক। সঙ্গে এসেছিলো নেজামে ইসলাম নেতা ফরিদ আহমদ। মোশতাক বললো আবার ক্যান্টনমেন্টে যেতে হবে।' ক্যান্টনমেন্টে ব্রিগেডিয়ার বশির ইন্টারোগেট করলো। আমাকে বলা হলো—'তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। তা সত্ত্বেও তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তোমার 'গুড বিহেভের' কারণে।' আবার বলা হলো—'তোমার গতিবিধি আমরা সর্বদাই পর্যবেক্ষণ করবো। সুতরাং খারাপ কিছু করার চেষ্টা করো না। তোমাদের ভিসির (ডঃ সাজ্জাদ হোসেন) সঙ্গে সব সময়ে যোগাযোগ রাখবে। তিনি খাঁটি মুসলমান'। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়।'

একাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও ইকবাল হলের হাউস টিউটর এবং বর্তমানে প্রফেসর ডঃ রফিকুল ইসলাম আগস্টের মাঝামাঝি পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হন। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তার বাসায় প্রায় রাতেই ছাত্রলীগ ও স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বৈঠক করতেন। অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ডঃ রফিকুল ইসলাম অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে অনেক বিবৃতি দেন এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। পাক হানাদারদের হাতে ধরা পড়া এবং বন্দী শিবিরের দিনগুলি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ '১৯৭১-এর ১৪ আগস্ট রাত সাড়ে বারোটায় আমাকে তৎকালীন ইকবাল হলের পিছনের কোয়ার্টার থেকে মিলিশিয়ারা ধরে নিয়ে যায়। প্রথম রাত্রি রমনা থানায়, তারপর শেরে বাংলা নগরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ কম্যান্ডো ইউনিটের ঘাঁটিতে স্থাপিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আমাদের রাখা হলো, ওদের ভাষায় এটাকে 'ভি আই পি কেজ' বলা হতো। আমার সঙ্গে এখানে আরও যাদের রাখা হয়েছিল তারা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ডঃ আবুল খায়ের (১৪ ডিসেম্বর বদর বাহিনীর হাতে নিহত), সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক কে এম সাদউদ্দিন, ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর আহসানুল হক ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক আ স ম শহীদুল্লাহ। প্রফেসর আহসানুল হক বাদে আমাদের সবাইকে একই রাতে বন্দী করা হয়েছিল। পাঞ্জাব পুলিশের কুখ্যাত স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার আমাকে ইন্টারোগেট করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দী শিক্ষকদের মধ্যে সম্ভবতঃ আমাকেই একমাত্র দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হয়। তবে অন্যান্য বন্দীদের নির্যাতনের তুলনায় আমার নির্যাতন সহনীয়। ইন্টারোগেশনের সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো-'শেখ মুজিব যে হিন্দু এবং ভারতীয় মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার তুমি কি তা জানো?' উত্তরে আমি

বললাম, না, আমার এ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, তাই আমার উপর শুরু হলো বুটের লাথি আর থাপ্পড়। লাঠি দিয়েও প্রহার করা হলো। পাক বাহিনী চেয়েছিল আমার মুখ থেকে মুনির চৌধুরীর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ বের করতে। আমি তাতে রাজী হলাম না বলে আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। ইন্টারোগেশনের সময় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। চলতো অকথ্য ভাষায় গালাগালি। প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ ও তার স্ত্রী নুরজাহান মুর্শিদ সম্পর্কেও আমাকে প্রশ্ন করা হলো। এঁরা তখন মুজিব নগরে ছিলেন। টর্চারের এক পর্যায়ে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তিমুলক বিবৃতি আদায় করা হয় এবং ২ সেপ্টেম্বর ৪টি অভিযোগসহ চার্জশীট দেয়া হয়। অভিযোগগুলোর একটি হচ্ছে (ক) মার্শাল ল' রেগুলেশন নম্বর ৬ অনুযায়ী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করা এবং ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে একটি লিখিত বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা। গ্রেফতার হওয়ার আগে আমি 'যমদূত' নামে ভীতি প্রদর্শনকারী একটি চিঠি পাই। পরে জেনেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন দালাল শিক্ষকই এটা করেছিলেন। এরাই আমাদের গ্রেফতার করায়।'

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ৩ নম্বর সেক্টরের এক্সপ্লোসিভ গেরিলা গ্রুপের কমান্ডার গোপন কমিউনিস্ট সংগঠন 'হাতিয়ার' গ্রুপের সদস্য এবং বর্তমানে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আনোয়ার ঢাকার টিএন্ডটি কলোনী থেকে অস্ত্রসহ পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরের দিনগুলো সম্পর্কে তিনি বলেনঃ '৩ নং সেক্টরের গেরিলা কমান্ডার হিসেবে আগরতলা থেকে এক্সপ্লোসিভ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা আসি। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল এক্সপ্লোসিভ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বরিশালের গৌরনদীর এলাকার গেরিলা গ্রুপের কাছে পৌছে দেয়া। সবকিছু ঠিক করে ১২ অক্টোবর রাতে আমি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী (বর্তমান ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং আলতাফ (বর্তমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কর্মরত) মতিঝিল টিএন্ডটি কলোনী একটি ফ্ল্যাটে অবস্থান করেছিলাম। পরদিন সকালেই আমাদের লঞ্চে করে মুলাদী যাওয়ার কথা। রাত দু'টার দিকে পাক বাহিনী আমাদের অবস্থান ঘেরাও করে এবং গোলাগুলি শুরু হয়। আমরাও পাল্টা গুলী চালালাম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে গেলাম। রুমের ভিতরে ঢুকে পাক সৈন্যরা প্রথমে আমার নাম জিজ্ঞেস করলো এবং আমাকে মারতে শুরু করলো। আমার পিঠের উপর দু'জন চেপে বসলো আর একজন পা মচকে দিল। এরপর সারারাত আমাদেরকে জীপে তুলে ঘোরানো হলো। জীপের মধ্যেও চললো ব্যাপক টর্চার। তারা অন্যান্য গেরিলাদের ঠিকানা জানতে চাইলো। সব অত্যাচার সহ্য করেও আমরা আমাদের গেরিলাদের ঠিকানা পাক বাহিনীর কাছে জানালাম না। ভোর রাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো সুত্রাপুর থানায় এবং আবার টর্চার। আমাদেরকে ঝুলিয়ে পিটানো হলো। সারাদিন এভাবেই কাটলো। রাতে একটি সেলের মধ্যে

ঢুকানো হলো। কোন খাবার নেই। পরদিন আমাদেরকে শেরে বাংলা নগরে তৎকালীন এম পি হোস্টেলের কুখ্যাত টর্চার সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের ধরার কয়েকদিন আগে গণধিকৃত মোনেম খান গেরিলাদের হাতে নিহত হয় এবং ঢাকায় একটি ব্যাংক ডাকাতি ঘটে। আমার রিভলবারে দু'টি গুলী ছিল না। আমাকে তাই মোনেম খানের হত্যাকান্ড এবং উক্ত ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকায় সন্দেহ করা হলো। তথ্যের জন্য টর্চার সেলে নিয়ে লাথি-থাপ্পড় চালানো হলো এবং জ্বলন্ত সিগারেট শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চেপে ধরা হলো। পরের দিন আবার শুরু হলো। ইন্টারোগেশন। আমাকে জিজ্ঞেস করলো-'অস্ত্র কোথায়? ভারতে কোথায় কোথায় ট্রেনিং নিয়েছো? কোথায় গিয়েছো? সাথে সাথে চললো লাঠি ও বেতের প্রহার। সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদ চললো। আমাদের সামনে আরও অনেককে টর্চার করা হলো। টংগীর এক শ্রমিককে মারতে মারতে তার সব দাঁত ফেলে দিল। সারাদিন অনাহারে কাটলো। রাতে আমাদের নিয়ে গেল রমনা থানার সেলে। একটি সেলে অন্যোন্য মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালী বন্দীদের রাখা হলো। দুর্গন্ধময় পরিবেশ। প্রতিদিন সকালে ইন্টারোগেশন-এর জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। এবং অসহনীয় টর্চার। এক সপ্তাহ পর আমাদের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করা হলো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হলো কোথায় মুক্তিযুদ্ধ চলছে? কোথায় কোথায় গেরিলারা অবস্থান করছে? আমরা সবকিছু স্বীকার করলাম। বরিশাল অঞ্চলের বিল এলাকায় আমাদের গেরিলা বাহিনীর অবস্থানের কথা স্বীকার করলাম। পাক বাহিনীকে বলা হলো-দরকার হলে তাদেরকে নিয়ে আমরা সেই বিল এলাকায় যেতে রাজী আছি। কিন্তু তারা যেতে ভয় পেল। আমরাও তা জানতাম। ২২ অক্টোবর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আমাদের স্থানান্তর করা হলো। ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগসহ মামলা দায়ের করা হলেও বিচার শুরু করতে পারলো না পাক বাহিনী। ১৭ ডিসেম্বর সকালে আমরা মুক্তি পেলাম। দু'মাসের বন্দী জীবনে আমার সারা শরীরের চামড়া উঠে গিয়েছিল। শরীরে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরার অজস্র দাগ।'

'৭১-এ মেহেদীগঞ্জের এমপি এবং বরিশাল আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বর্তমানে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলসহ মে মাসে ভারত থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার পথে পাক বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হন। পাক হানাদারদের হাতে বন্দী হওয়ার এবং পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরের দিনগুলি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'একাত্তরের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত থেকে প্রচুর অস্ত্র নিয়ে দু'টি লঞ্চে করে বরিশালের দিকে যাচ্ছিলাম। আমাদের সঙ্গে মেজর জলিল (৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার) ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এমপিএও ছিলেন। আসার পথে খুলনার পাইকগাছায় রাত্রিবেলা আমাদের লঞ্চের বহর পাক বাহিনীর টহলদার গানবোট কর্তৃক আক্রান্ত হয়, মুখোমুখি সংঘর্ষের এক পর্যায়ে দু'টি লঞ্চই অস্ত্রসহ নিমজ্জিত হয়। আমরা নিকটবর্তী চর এলাকায় নেমে পড়ে কোনোরকম নিজেদেরকে রক্ষা করলাম। কিন্তু মেজর জলিল ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। খুব ভোরবেলা আমার নেতৃত্বে ১৯ জন মুক্তিযোদ্ধার

একটি দল যখন অস্ত্রহীন অবস্থায় পাইকগাছা এলাকা অতিক্রম করছিলো তখন সেখানের তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী নেতা ও শান্তি কমিটির সভাপতি মাওলানা সালাম এবং তার দল আমাদেরকে আটক করে। মাওলানা সালাম ঘোষণা দেয়–'তোমরা সবাই কাফের। পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে মিলিটারির হাতে সোপর্দ করা হবে।' আমাদেরকে কয়রা ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের বাড়িতে আটক রেখে সালাম খুলনা যায় এবং সেখানে জামাতে নেতা মাওলানা ইউসুফের সহায়তায় পাক বাহিনীকে কয়রা এনে আমাদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করে। গানবোটে আমাদেরকে প্রথমে খুলনা এবং সেখান থেকে ট্রাকে করে চোখ বেঁধে যশোর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। সারা পথ অমানুষিক টর্চার চললো। যশোর ক্যান্টনমেন্টে আমার দলের কয়েকজন পানি খেতে চাইলে পাক সেনারা বদনার মধ্যে প্রস্রাব করে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলো। যশোর ক্যান্টনমেন্টে কয়েকদিন আগে যশোর আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমানকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। মেঝেতে এবং দেয়ালে তখনো তার রক্তের দাগ শুকোয়নি। যশোরে এক কর্নেল আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বললো–'তুমি ভারতে গিয়ে অস্ত্র এনেছো—এখন কেন তা অস্বীকার করছো? লেঃ নাসির সবকিছু স্বীকার করেছে।' লেঃ নাসিরকে (আমার অন্যতম সংগী) আমি চিনি না বলে জানালাম। তখন নাসিরের স্বীকারোক্তিমূলক টেপ আমাকে বাজিয়ে শোনানো হলো। লেঃ নাসির টর্চারের মুখে মুজিবনগর ও ভারতে আমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড ও জেনারেল আরোরার সঙ্গে বৈঠকের কথা বলে ফেলেন। একরাত পর আমাদের সকলকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রিজনার্স ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এখানেই একই সেলে আমাদের ১৭ জন বন্দীকে রাখা হলো। প্রতিদিন টর্চার চললো। আমার বুকের পাঁজর ও পিঠের হাড় ভেংগে গেল। চারদিন পর আমাদের সেলের সামনেই সিরাজগঞ্জের এসডিও সামসুদ্দিনকে অমানুষিকভাবে পিটানো হলো। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা হলো আমাদের সামনে। তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি মারা গেলেন। অক্টোবর মাসে আমাকে শেরে বাংলা নগরের এমপি হোস্টেলে এবং তারপর ঢাকা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ ডিসেম্বর শুরু হলো আমার বিচার। শেখ মুজিবের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাক বাহিনী আমার কাছ থেকে বিবৃতি আদায় করতে না পেরে ৯ ডিসেম্বর আমাকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করে–কিন্তু তা কার্যকর করার সময় তারা পায়নি।'

২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ঢাকা শহরের অন্যতম গেরিলা কমান্ডার আব্দুস সামাদ, বীর প্রতীক ২৯ আগস্ট পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হন। '৭১–এর ১৪ আগস্ট হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা হামলা পরিচালনায় তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক। পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরের জীবন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের বাথরুমে ২৮ পাউন্ড পিই কে বার্স্ট করা হয় পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্টে। একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও টিউব লাইট ফ্যাক্টরীর মালিক হিসেবে আমি ব্যবসায়ী সেজে হেটেলে যাওয়া–আসার মাধ্যমে বোমাটি জায়গা মত রেখে এসেছিলাম। এই বোমা হামলা তখন ঢাকা শহরে পাক হাসাদার বাহিনীর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ২

নম্বর সেক্টরের গেরিলা বাহিনীর অন্যতম বীরযোদ্ধা বদিউল আলম বোমা হামলার ১২/১৩ দিন পর পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন (পাকবাহিনী পরবর্তীতে তাঁকে হত্যা করে)। প্রচন্ড টর্চারের মুখে বদিউল আলম আমার এবং আমাদের গ্রুপের কয়েকজন সহযোদ্ধার ঠিকানা বলে ফেলেন। ২৯ আগষ্ট সন্ধ্যের দিকে ১০০/১৫০ জন পাক মিলিটারী আমার ৪২৫, নিউ ইস্কাটনের বাড়ি ঘেরাও করে। এসময় আরও ধরা পড়েন আমাদের দলের গেরিলা চুল্লু, আজাদ (পাক বাহিনীর হাতে শহীদ), রুমী (টর্চারের পর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি) প্রমুখ। পাক বাহিনী ক্যাপ্টেন আদিল ও সুবেদার সফিনগুলোর নেতৃত্বে এই ঘেরাও অভিযান পরিচালনা করে। সঙ্গে মারাত্মক আহত অবস্থায় বদিউল আলমকে নিয়ে আসা হয়। আর্মির আমার পেটে আঘাত করে। বেডরুমগুলো তছনছ করা হয়। সমস্ত বাসায় তল্লাশী চালানো হলো। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তৎকালীন এমপি হোস্টেলে ইন্টারোগেশনের জন্য। সেখানে লেঃ কর্নেল হেজাজী জিজ্ঞেসে করলো—'তুমি কতোদিন ধরে গেরিলা যুদ্ধে আছো? তোমাদের অস্ত্র কোথা থেকে আসে? কতোগুলো ছেলে তোমাদের গেরিলা দলে কাজ করছে? ভারত থেকে কি কি সাহায্য আসে?' কি পদ্ধতিতে আসে? আমি কোনটিরই সঠিক উত্তর দিলাম না। আমাকে তাই টর্চারের জন্য এমপি হোস্টেলের পিছনে একটি দোতলা দালানে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার শার্ট, গেঞ্জি, খুলে ফেলা হলো। সাব-ইন্সপেক্টর বাজুয়া পশ্চাৎদেশে বুট দিয়ে লাথি মেরে প্যান্টও খুলতে বললো। প্যান্ট খুলে ফেললাম। সাত আটজন মিলে তখন আমাকে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করলো। আমাকে উপুড় করে চার হাত-পা'র উপর চারজন পাক সেনা উঠে বসে লাফাতে শুরু করলো। জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। রাত তিনটে সাড়ে তিনটেয় জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম একটা রান্নাঘরের মধ্যে পড়ে আছি। এটা ছিল এমপি হোস্টেলের একটি রান্নাঘর। ৭/৮ জন আহত বন্দীকে সেখানে দেখলাম। এদের মধ্যে ছিলেন মর্নিং নিউজের প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল বাশার (পরে শহীদ হয়েছেন), জুয়েল (আমার সহযোদ্ধা গেরিলা পরে শহীদ হয়েছেন), চুল্লু (২নং সেক্টরের গেরিলা), হাফিজুর রহমান (পরে শহীদ হয়েছেন)। এরপর প্রতি দিনই প্রায় ইন্টারোগেশন চলতো এবং সাথে সাথে চালানো হতো টর্চার। একটি প্রশ্নের উত্তর তাঁদের মনমতো না হলেই নেমে আসতো অত্যাচার। মাঝে মাঝে রাত্রি বারোটা/একটার দিকে বালতি বালতি ঠাণ্ডা পানি এনে ঢেলে দেওয়া হতো আমাদের শরীরে। একবার তিনদিন একটানা বৃষ্টিপাতের সময় আমাদের সবাইকে বাইরে ফেলে রাখা হলো। ভিজতে ভিজতে ঠান্ডা বরফের মতো হয়ে গেলাম। অক্টোবর মাসে পশ্চিমা এসপি শিপ্রা, কর্নেল হেজাজী ও মেজর ওসমানী এসে আমাদের কয়েকজনকে বাছাই করে এমপি হোস্টেল থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিলো। ২০ নম্বর সেলে। অবশ্য এখান থেকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাঝে মাঝে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হতো...। টর্চারের সব অভিনব পদ্ধতি বের করে আমাদের উপর তা প্রয়োগ করা হতো। ডিসেম্বর মাসে টর্চার ভীষণ বেড়ে গেল। একদিন আঘাতে আঘাতে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। পাক আর্মি তখন আমাকে ক্যান্টনমেন্টের একটি বাসায় নিয়ে গেল। গভীর রাতে জ্ঞান ফিরে এলে

দেখলাম আমার আশপাশে বসে আছে কয়েকজন বাঙালী মেয়ে। তাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। তারা আমার দিকে সেবার হাত বাড়িয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইলো।'

'পাক হানাদাররা এদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে এনেছে। শাড়ী পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিতে চাওয়ায় তাদের শাড়ী কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেদিন রাতেই আমাকে সেখান থেকে আবার জেলে ফিরিয়ে আনা হলো। জানিনা তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল শেষ পর্যন্ত। আমার বিচারের রায় বেরুলো ১২ ডিসেম্বর— যাবজ্জীবন কারাদন্ড। কিন্তু হানাদারদের নিজেদের মৃত্যুঘন্টা তখন বাজছে।'

একাত্তরে মুলতানে সেনাবাহিনীর লেঃ পদে কর্মরত এবং বর্তমানে ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) ক্যাপ্টেন সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ সাতক্ষীরা থেকে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরের দিনগুলো সম্পর্কে তিনি বলেনঃ '৭১ এর মার্চ মাসে আমি ঢাকায় আসি ছুটি কাটাতে এবং শেষদিকে সাতক্ষীরা চলে যাই। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এক মধ্যরাতে পাক বাহিনী সাতক্ষীরা শহর দখল করে নেয়। সকাল বেলা রাস্তা থেকে আমাকে ধরে পাক বাহিনী সাতক্ষীরা হাইস্কুলে নিয়ে আসে। এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন আব্বাস আমাকে এবং কয়েকজন বন্দীকে জেরা করলো। স্কুলের দোতলায় অনেক মহিলা বসেছিলেন। তাদের কারো স্বামী, কারো ছেলে, কারো বড় ভাইকে ধরে আনা হয়েছে। মধ্যরাতে ধরে এনেই এঁদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ড সেরে পাক সেনারা আমাকে এবং ক্যাপ্টেন আওলাদকে সঙ্গে নিয়ে যশোরের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। ১৫/১৬ এপ্রিল যশোর ক্যান্টনমেন্ট সামরিক সদর দফতরে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাখা হলো একটি রেজিমেন্ট সেলে। নানান ভয় দেখানো চললো। একদিন পর আবার জায়গা বদল। এবার এয়ারফোর্স এম্যুনেশনের গোডাউনে। এক একটি কুঠরীতে ৬/৭ জন বন্দী। কুঠরীর মধ্যে ভয়াবহ অন্ধকার। এখানে বন্দী হয়ে তখন ছিলেন শমসের মোবিন চৌধুরী (বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডি. জি), ক্যাপ্টেন আজিজ, লেঃ নাসির প্রমুখ। চোখ বেঁধে মাঝে মাঝে আমাকে ইন্টারোগেশন ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রশ্নের উত্তর তাদের মন মতো না হলেই শুরু হতো মারপিট। এখানে পাক সেপাইদের দৈনন্দিক রুটিন ছিল সেলের মধ্যে ঢুকে বন্দীদের অহেতুক লাঠি, বেত বা বুটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে উল্লাস করা। প্রায় প্রতিরাতেই এই হিংস্র উল্লাস চলতো। একদিন আমাকে মারতে মারতে চৈতন্যহীন করে ফেলা হলো। আঘাত করা হলো কিডনীতে। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলাম—আমাকে মারার জন্য উদ্যত হয়ে আছে কয়েকজন পাক সেনা।

এভাবে চললো প্রায় পাঁচ মাস। সেপ্টেম্বরে প্রিজন ক্যাম্প থেকে শেরে বাংলা নগরের 'ভিআইপি কেজে' জায়গা পেলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন বাশারকে টর্চার করতে করতে মেরে ফেলা হয়েছে। এখানে ফিল্ড ইন্টেরোগেশন ইউনিটেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো আমাকে। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আমার কোন প্রত্যক্ষ সংশ্রব পাক বাহিনী বের করতে না পেরে

নভেম্বরের ৩/৪ তারিখে অবশেষে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হলো মুলতানে গিয়ে কর্মস্থলে যোগ দিতে।'

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) ঢাকা ডিভিশনের গেরিলা যোদ্ধা মাহফুজুর রহমান টুলু একাত্তরে দু'মাস পাক হানাদারদের বন্দী শিবিরে আটক ছিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মাহফুজ ভারতের দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেন। গেরিলা হিসেবে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়া এবং বন্দী শিবিরের দিনগুলো সম্পর্কে তিনি বলেনঃ '৭১ এর ২২ সেপ্টেম্বর বেলা তিনটার দিকে জিঞ্জিরা থেকে কিছু অস্ত্র এনে রেখেছিলাম ১০৩ নম্বর সিদ্ধেশ্বরীর একটি দোকানে। আমাদের প্ল্যান ছিলো–অস্ত্রগুলো ঢাকার অদূরে আংগারজোড়ায় বিএলএফ ক্যাম্পে রেখে খিলগাঁও যাই সহযোদ্ধা গেরিলা বাবুদের বাসায় গাড়ি আনার জন্য। এর মধ্যেই পাক বাহিনী সিদ্ধেশ্বরীর একটি ফটোগ্রাফির দোকান রেইড করলো এবং দোকানের মালিকের মাধ্যমে জানতে পারলো যে–আমি একজন গেরিলা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে আসবো। অবশ্য অস্ত্র নিতে যে আসবো এ তথ্য তারা পায়নি। ফটোগ্রাফি দোকানের সেই লোকটি টর্চারের ফলে আমার নাম বলে ফেলে। গাড়ি করে আমি আর বাবু সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় ঢুকতেই আশপাশে ওত পেতে থাকা হানাদার বাহিনী আমাদের ধরে ফেললো। নিয়ে যাওয়া হলো সেগুনবাগিচার তৎকালীন আর্মি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে। আমাদের যে ঘরে নিয়ে রাখলো তার পাশের ঘরেই কয়েকজন বন্দী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাদেরকে পুরোপুরি উলংগ করে রাখা হয়েছিল।

আমাদের নাম, ঠিকানা নেয়ার পর শুরু হলো ইন্টারোগেশন। কোথা থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছি? কোথায় গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি? অস্ত্র কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন করা হলো আমাদের দুজনকে। আমরা যেহেতু সবকিছু অস্বীকার করলাম তাই শুরু হলো ভয়ানক টর্চার। প্রথমে ঘুষি, তারপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটানো-শুরু করলো। এরপর অত্যাচারের এক বিকৃত পদ্ধতি বের করলো বর্বর হানাদাররা। আমাকে আর বাবুকে বললো সমকামীতায় লিপ্ত হতে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তা মেনে নিলাম না। তখন তারা আমাদের হাত–পা চেপে ধরে পিঠের উপর বাঁশ ঘুরাতে শুরু করলো। সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে সেই ফটোগ্রাফি দোকানের মালিকের ছেলে আমাকে ডাকনাম ধরে ডেকে পানি চাইলো। সেন্ট্রিরা এটা শুনে ফেললো। টুলু নামে তখন 'বিএলএফ'–এর আর একজন কমাণ্ডার ছিলেন–পাক বাহিনী যাকে খুঁজছিলো। আমাকে–ই সেই টুলু মনে করে আবার টর্চার শুরু করলো। চিকন বুলারে তেল ও মরিচ রেখে আমার মলদ্বারে প্রবেশ করানো হলো। জিজ্ঞেস করলো 'মোস্তফা মোহসিন মন্টু কোথায়। মোস্তফা মোহসিন মন্টু ঢাকা ডিভিশনের বিএলএফ কমাণ্ডার ছিলেন। আমি বললাম, 'তাকে চিনি না।' সেদিন–ই রাত তিনটার দিকে আমাদের ১৯ জনকে নিয়ে যাওয়া হলো পুরনো এমপি হোস্টেলের একটি রুমে। এটা ছিল একটি রান্নাঘর। আমার সঙ্গে আর যাঁরা ছিলেন তারা হচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ, মান্নান, মালিবাগের ইকবাল- প্রমুখ। প্রত্যেকদিনই ইন্টারোগেশন চলতো। জবাব না দিলেই মারধর এবং তা চলতো বেহুঁশ না

হওয়া পর্যন্ত। আমাকে আবার প্রশ্ন করা হলো ট্রেনিং ও অস্ত্র সম্পর্কে। আমার সঙ্গী বাবু টর্চারের ফলে একদিন বলে দিল যে-আমাদের কাছে অস্ত্র আছে। পাকবাহিনী আমাকে নিয়ে সিদ্ধেশ্বরীর সেই দোকানে গেল। কিন্তু অস্ত্র আগেই সরিয়ে ফেলেছিল আমাদের অন্যান্য সহযোদ্ধারা। অস্ত্রের খোঁজে মাঝে মাঝে রাতে আমাকে জীপে নিয়ে ঘুরানো হতো।'

'ওদের লেখা একটি বিবৃতিতে জোর করে আমার স্বাক্ষর নিল। অক্টোবরের শেষ দিকে আমাকে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হলো-সঙ্গে বাবুকে। জেলে থাকতে আমার অভিভাবকরা আমাকে ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু করলেন। নেজামে ইসলাম নেতা ও শান্তি কমিটির অন্যতম সদস্য ফরিদ আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তারা। এ সময় টর্চারের ফলে আমার সারা পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত শরীরে পানি এসে গেল। শরীর ফুলে উঠলো। হাত ও পায়ের কয়েকটি আঙুল ভেংগে গেল। অবশেষে আমাদের ১২ জন বন্দীর প্রত্যেকের জন্য নেজামে ইসলামের সেই নেতাকে চার হাজার টাকা করে ঘুষ দিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। নভেম্বরের শেষ দিকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়।'

একাত্তরে নেত্রকোনার আঞ্চলিক ছাত্রলীগ কমিটির সভাপতি এবং বর্তমানে বাসদ কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এপ্রিল মাসে পাক-বাহিনীর হাতে বন্দী হন। পাক বাহিনীর বন্দী শিবিরের দিনগুলো সম্পর্কে তিনি বলেনঃ '৭১-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী নেত্রকোনার তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান আক্রমণ করে। এর পরিপেক্ষিতে পাক বাহিনী এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে নেত্রকোনায় ব্যাপক ধর-পাকড় করে। আমার চাচা আমিরুল ইসলাম খানকে তারা ধরে নিযে যায় এবং জেলে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে এক রাতে আমাকে চাচার কথা বলে দু'জন পুলিশ বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়। নেত্রকোনা থানায় একজন পাক আর্মি অফিসার আমাকে জেরা করে এবং ব্যাংক আক্রমণের সঙ্গে আমাকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়। ব্যাংক আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর কারা কারা অংশ নিয়েছিল সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমি বললাম তাদেরকে চিনি না এবং এখন কে কোথায় আছে তা বলতে পারি না। পরদিন আমাকে নেত্রকোনা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। জেলে আমকে চাচার সঙ্গে একই সেলে রাখা হলো।'

'তখন বিভিন্ন এলাকা থেকে উঠতি বয়সী তরুণদের মুক্তিযোদ্ধা ভেবে জেলখানায় ধরে আনছিলো পাকবাহিনী। ক্রমে ক্রমে জেলের ওয়ার্ডগুলো বন্দীদের উপস্থিতিতে ভরে উঠলো। এখান থেকে মাঝে মাঝে বহু বন্দীকে নিযে যাওয়া হতো-তারা আর ফিরে আসতো না। একদিন খুব সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসের দিকে জেলে ৩০ জন বন্দীকে (তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু) মুক্তি দেয়া হলো। কিন্তু জেলের গেট পার হওয়ার পরই তাদের হাতে আবার হাতকড়া পরানো হলো এবং পরবর্তীতে নেত্রকোনার একটি বধ্যভূমিতে নিয়ে সবাইকেই গুলি করে হত্যা করা হলো। এই হত্যাকাণ্ডের সময় মাত্র দু'জন

মানুষ গুরুতর আহত অবস্থায় আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গিয়েছিল। আগস্ট মাসে আমার কেসটি নেত্রকোনা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী কয়েকটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে সবচেয়ে উদ্ধত, সক্রিয় এবং নৃশংস দলটি ছিলো জামায়াতে ইসলামী। এই বিরোধিতা কোন আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি ছিলো না। ১৯৪১ সালের প্রতিষ্ঠাকালীন নীতির সূত্র ধরেই জামায়াত তার একাত্তরের ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলো। 'হুকুমত-ই-এলাহিয়া' বা আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী গঠনকালে এর জনক এবং তাত্ত্বিক ভিত্তির নির্মাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী গণতন্ত্র এবং ভৌগোলিক বা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে ইসলাম পরিপন্থী আখ্যা দিয়েছিলেন। তার মতে বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'অনুচিত' এবং 'আত্মঘাতী'। অন্য কথায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসনকে তিনি সমর্থন করেছেন, ফলে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবি সম্বলিত ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের দিকে চোখ পড়লেই তার আত্মায় 'মাতম' শুল হয়ে যেতো।'

পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও বৃটিশরা চলে যাওয়ার পর 'হিন্দু' ভারতের পাঠানকোট থেকে মওদুদী সদলবলে 'মুসলিম' পাকিস্তানের লাহোরে চলে আসেন। এসময় তার দলের ৫৩৩ জনের মধ্যে পাকিস্তানবাসী সদস্য সংখ্যা ছিলো ৩০৬ জন। এরপর তার দৃষ্টি পড়ে পূর্ব বাংলার দিকে ঃ ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের নিস্ফল প্রচেষ্টার পর ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক শাখা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত জনৈক অবাঙালী জামায়াতী। বাংলাভাষীদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রহীম যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকেই, উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে গোলাম আযম যোগ দেন ১৯৫৪ সালে, 'মুত্তাফিক' বা সহযোগী সদস্য থেকে সেক্রেটারী হিসেবে প্রাদেশিক নেতৃত্বে উন্নীত হন তিনি ১৯৫৬ সালে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানেও জামায়াতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিকে অপরিবর্তিত রাখে, ১৯৫২ সনে সঙ্গোধিত গঠনতন্ত্রে 'কোরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে দেশে ইসলামী শাসণতন্ত্র প্রবর্তনের' কর্মসূচী সংযোজিত হয়।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার নীতি অব্যাহত রাখতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের জাতিগত বিকাশের প্রশ্নটিকে অবদমনের প্রচেষ্টায় অংশ নেয়, ইসলাম এবং পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হওয়ার আশংকা তুলে ধরে দলটি

স্বায়ত্তশাসনের ন্যায়সংগত সংগ্রামের সরাসরি বিপক্ষে চলে যায়। এ প্রশ্নে পাকিস্তানী শাসকদের সেবাদাসের ভূমিকা রাখলেও বাঙালী বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরিণতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ধুরন্ধর 'বেঁটে মাওলানা' আবুল আলা মওদুদী প্রকাশ্য বিরোধিতার পরিবর্তে ভেতর থেকে ছুরিকাঘাতের অর্ন্তঘাতমূলক কৌশল বেছে নেন। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বলিষ্ঠতা পেতে থাকলে জামায়াতে ইসলামীও সময়ে সময়ে এতে অংশ নেয়ার ভনিতা দেখাতে শুরু করে। আন্দোলনের সাফল্যকে প্রতিহত করার পরিষ্কার উদ্দেশ্যে অন্য চারটি ডানপন্থী দলের সঙ্গে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে জামায়াত "পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন' (পিডিএম) গঠন করে। মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার পাল্টা কর্মসূচী হিসেবে পিডিএম এর ৮ দফ পূর্ব বাংলার সপক্ষেও দাবী উত্থাপন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে ঘেরাও এর মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সামরিক একনায়ক আইউব বিরোধী সংগ্রামের সূচনা করলে অবশ্যম্ভাবী গণ–অভ্যুত্থানকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে যেতে না দেয়ার প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রে জামায়াতে ইসলামী সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারী গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রতিশ্রুত হলেও জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য যে পূর্ব বাংলার স্বার্থে নিবেদিত ছিলো না তার প্রমাণ মেলে অচিরেই। সংগ্রামী ছাত্র সমাজের যে ১১ দফার ভিত্তিতে '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান প্রচণ্ডতা পেয়েছিলো, তাকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে জামায়াত তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে পৃথক ৮ দফা কর্মূর্সচী। ফলে আন্দোলনে বিভেদ সুচিত হয়, পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সংঘর্ষে ইসলামী ছাত্র সংঘের আবদুল মালেকসহ নিহত হয় কেউ কেউ। ছাত্র–জনতার ত্যাগ এবং আন্তরিকতা সত্ত্বেও আন্দোলনের নিশ্চিত সাফল্যকে আইউব খানের গোল টেবিলে বিসর্জন দেয়ার প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। এই ষড়যন্ত্রের সকল পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা রাখে জামায়াতে ইসলামী।

আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিনয় করে এমনিভাবে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের মারাত্বক ক্ষতিসাধন করে। এরই পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের জন্য অগ্রসরমান বামপন্থীদের বিরুদ্ধে দলটির ভূমিকা ছিলো নগ্নভাবে আক্রমণাত্মক। মুখে দাড়ি আর মাথায় টুপির ছদ্মাবরণ নিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মপরায়ণতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জামায়াতীরা বামপন্থীদের 'নাস্তিক', 'কাফের' এবং 'ইসলাম বিরেধী' আখ্যায় চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালায়, বিশেষ করে মওলানা ভাসানীকে পরিণত করে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলে। গণচীনের চেয়ারম্যান মাও–সে–তুংয়ের চিন্তাধারা আমদানীকারক অর্থে মওলানা ভাসানীকে জামায়াতী পত্রিকাগুলি 'মাও–লানা' লিখতো (দেখুন–সাপ্তাহিক জাহানে নও এবং দৈনিক সংগ্রাম)। '৬৯ এর মার্চের

দ্বিতীয় সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানের শাহীওয়ালে তারা ভাসানীকে শারীরিকভাবে আক্রমণ পর্যন্ত করেছিলো।

সত্তরের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অংশ নেয়। সারা পাকিস্তানে দলটির মনোনীত ২০০ প্রার্থীর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র চারজন জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ আসনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, প্রাদেশিক আমীর গোলাম আযম আওয়ামী লীগের জহিরুদ্দিনের ১১৬২০৪ ভোটের বিপরীতে মাত্র ৩৫৫২৭ ভোট লাভ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর তৈরী জটিলতার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার পর স্বাধীনতার দাবীতে পূর্ব বাংলায় দূর্বার আন্দোলন শুরু হলে আরো একবার আন্তর্ঘাতমূলক কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসে জামায়াতে ইসলামী। এই সময়কালে দলটির কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত ছিলো কেবল ভুট্টোর বিরোধিতায়। 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' কর্মসূচীর কারণে পিপলস পার্টি আগেই তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো, পূর্ব বাংলায় ভুট্টো-বিরোধী মনোভাবের সুযোগটি জামায়াতীরা তাই কাজে লাগিয়েছে সুচতুরভাবে।

পূর্ব বাংলার সপক্ষে জামায়াতে ইসলামী যে কোনো ভূমিকাই নেয়নি– তার বড় প্রমাণ মওদুদীর এক বিবৃতি। এতে তিনি ভুট্টোর সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগেরও নিন্দা করে বলেন, 'কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাচ্ছেন তাদের একথা জানা দরকার যে তেমন কোনো শাসনতন্ত্র সফল হবে না এবং সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই দায়ী থাকতে হবে'–(পাকিস্তান অবজারভার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১)। ভুট্টোর তৎকালীন বক্তব্যের কাছাকাছি এই বিবৃতির অর্থটি ছিলো ভুট্টো এবং পূর্ব বাংলার মানুষের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের উভয় ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তিকে দৃঢ়তর করা, পাকিস্তানকে রক্ষাও ছিলো উদ্দেশ্যের অন্য একটি দিক। ভুট্টোর বিরোধিতার অর্থই তখন ছিলো পূর্ব বাংলার পক্ষাবলম্বনের মতো, ভুট্টো বিরোধী বাঙালীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ভনিতা করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সেই দিনগুলোতে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব বাংলার মসজিদের বেষ্টনী থেকে জনগণের কাছে যাওয়ার প্রতারণাপূর্ণ কৌশল নিয়েছিলো।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাঙালী নিধন অভিযান শুরু করলে জামায়াতে ইসলামীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ে, নুরুল আমীনের নেতৃত্বে ৪ এপ্রিল প্রথম সুযোগেই খুনী জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোলাম আযম অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ('পূর্বদেশ', ৫ এপ্রিল, ১৯৭১)। দু'দিন পর ৬ এপ্রিল গোলাম আযম পৃথকভাবে টিক্কা খানের সঙ্গে আবার দেখা করেন। এই বৈঠকে অন্য দালালদের মতো গোলাম আযমও স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে–

'ভারতের এই অভিসন্ধি নস্যাৎ করার জন্য প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে।' (দৈনিক পাকিস্তান', ৭ এপ্রিল, ১৯৭১)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অংকুরেই ধ্বংস করার পাশবিক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে ১০ এপ্রিল গঠিত শান্তি কমিটিতে জামায়াতে ইসলামী প্রধান ভূমিকা রাখে। এবং ১৫ এপ্রিল গঠিত প্রাদেশিক শান্তি কমিটির তিন নম্বর সদস্য নির্বাচিত হন গোলাম আযম, আহবায়ক ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরুদ্দিন। ('পূর্বদেশ', ১১ এপ্রিল,-'দৈনিক পাকিস্তান' ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১)। উল্লেখ্য যে শান্তি কমিটির প্রথম বৈঠকে ভারতীয় ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিলো। বৈঠকের এক প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক নাগরিক, আইনজীবী, মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার মোদাররেসদের প্রতি জনসাধারণকে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার আহবান জানানো হয়, 'যাতে জনসাধারণ ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।' গোলাম আযমদের এই শান্তি কমিটি ২২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে সকল দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীর প্রতি রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের হিংসাত্মক এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের-এবং উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে সর্বরকম ভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান জানিয়েছিলো। (দৈনিক পাকিস্তান' ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১)।

এপ্রিলেই যুদ্ধরত বাংলাদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি তার স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা শুরু করে, প্রতিটি জেলা ও মহকুমা পর্যায়েই জামায়াতে ইসলামী দখল করে এর নেতৃত্ব। পিডিপি ও মুসলিম লীগের সঙ্গে একযোগে জামায়াতের দালালরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে গ্রামে গ্রামে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো, মানুষের গরু খাসীসহ অর্থ সম্পদ লুট করতো, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতো, নারী নির্যাতনেও সহায়তা করতো। পাকিস্তান রক্ষায় তাদের এই ভুমিকা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট করেছে, জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য এমনকি জেনারেল টিক্কা খানের মতো খুনী তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়ক হবে।

রাজশাহীতে গর্ভনর হিসেবে টিক্কা খান সফরে গেলে শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয় যে, সারা রাজশাহী বিভাগে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করা হয়েছে। জবাবে টিক্কা খানও জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের উত্তম কাজের প্রশংসা করেন। টিক্কা খান গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উপস্থিতির কথা কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য তাদের আহবান জানান-'যাতে করে আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীসমূহ তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।' ('দৈনিক পাকিস্তান' ৬ জুলাই, ১৯৭১)। অন্য এক উপলক্ষে রংপুরে 'গোলাযোগ সৃষ্টিকারীদের' নিমূল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কাজে সহায়তা করার জন্য শান্তি কমিটি যে প্রচেষ্টা

চালাচ্ছেন, টিক্কা খান তার 'প্রশংসা' করেন। শান্তি কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে টিক্কা খান বলেনঃ 'এগুলো প্রদেশে সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে খুনী জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলো জামায়াতে ইসলামী। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস' উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে গোলাম আযম বলেনঃ 'কিন্তু এবার পাকিস্তানের ভেতরে হাজারো দুশমন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এবারের সংকট কঠিন। কারণ 'বাইরের দুশমনের চেযে ঘরের যেসব দুশমন রয়েছে তারা অনেক বেশী বিপদজ্জনক।' ১৬ আগস্টের 'দৈনিক পাকিস্তান' জানাচ্ছেঃ 'সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জামায়াত নেতা (গোলাম আযম) বলেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিযে না দিত যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায়, তবে পরিস্থিতি হয়তো অন্য দিকে মোড় নিত।' তিনি বলেন, 'দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। তাই দেশের মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে। এছাড়া ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।'

যুদ্ধরত বাংলাদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি তার স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা শুরু করেছিলো অচিরেই। এর সদস্যরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে গ্রামে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো, মানুষের অর্থ ও সম্পদ লুট করতো, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতো, সহায়তা করতো নারী নির্যাতনেও। প্রায় সব ক্ষেত্রেই শান্তি কমিটির নেতৃত্ব দখল করেছিলো জামায়াতে ইসলামী এবং গোলাম আযম দ্রুত এর প্রধান নেতায় পরিণত হয়েছিলেন 'যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাকালে তিনি বলেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'

শান্তি কমিটির মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী তৎপরতাকে সর্বাত্মক করার উদ্দেশ্যে গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী একই সাথে সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে তুলেছিলো। খুলনায় মে মাসে রাজাকারদের প্রথম দলটি গঠন করেন জামায়াতের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাওলানা একেএম ইউসুফ। স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোতে হত্যা, নির্যাতন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজাকাররা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ত তল্পিবাহক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। শত্রু কবলিত বাংলাদেশের এমন একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার সদস্যরা রাজাকারদের হত্যা, লুণ্ঠনের নির্যাতন শিকার হননি। স্বাধীনতা বিরোধী এই ভূমিকার ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই রাজাকাররা সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছিলো, 'দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করার কারণে টিক্কা খান এবং নিয়াজীর মতো জেনারেলরাও রাজাকারদের প্রশংসা করেছিলেন। জামায়াতে ইসলামী রাজাকার

বাহিনীর প্রশ্নেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলো। ১ সেপ্টেম্বর করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম পাকিস্তান রক্ষা ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। গোলাম আযম বলেন, 'কোন ভাল মুসলমানই তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক হতে পারে না।' তিনি বলেনঃ 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্য এক মন ও দেশপ্রেমিক লোকেরা একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন।.... দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলার যে কোনো অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।'

২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার হোটেল 'এম্পায়ার'–এর এক জামায়াতী সমাবেশে গোলাম আযম বলেন যে, 'পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্যই জামায়াতে ইসলামী শান্তি কমিটি এবং রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। গোলাম আযম বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়। আর তাই জামায়াতের কর্মীরা পাকিস্তানকে ভেংগে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়।' সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গোলাম আযম প্রসংগত বলেন, 'সারা প্রদেশ সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরও যে কয়েক হাজার লোক শহীদ হয়েছে, তাদের অধিকাংশই জামায়াতের কর্মী।' (দৈনিক 'পাকিস্তান', ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)।

মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শনকালে ১৭ সেপ্টেম্বর এক সমাবেশে গোলাম আযম বলেন, 'রাজাকার বাহিনী কোন দলের নয়, তারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলের সম্পদ।...তোমরা দল–মতের ঊর্ধ্বে উঠে পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলকে আপন মনে করবে।....

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেনি, বরং তারা ঢালাওভাবে আলেম ও ইসলামী দলের লোকদের খতম করেছে। 'রাজাকাররা খুবই ভালো কাজ করছেন'–তিনি উল্লেখ করেন। নিহত রাজাকার রশীদ মিনহাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গোলাম আযম বলেনঃ 'এই আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে তরুণরা উপকৃত হতে পারবে।' ('দৈনিক পাকিস্তান'। ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা নেতা মওলানা একেএম ইউসুফ ১১ অক্টোবর খুলনায় জেলা স্কুল মিলনায়তনে এক রাজাকার সমাবেশে 'দুষ্কৃতিকারী ও ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য' রাজাকারদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিপুল করতালির মধ্যে মাওলানা ইউসুফ ঘোষণা করেনঃ 'দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলার যে কোন অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে আমাদের সাহসী জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।' ('দৈনিক পাকিস্তান', ১৩ অক্টোবর, ১৯৭১)

পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজীও একই আশা ব্যক্ত করেছিলেন। সাভারে রাজাকার বাহিনীর কোম্পানী কম্যাণ্ডারদের প্রথম দলের ট্রেনিং শেষের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনশেষে এক ভাষণে ২৭ নভেম্বর নিয়াজী

বলেন যে—'রাজাকারদের প্রসন্ন বদন, আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চ মনোবল দেখে আশি খুশী। একদিকে তাদের ভারতীয় চরদের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে এবং অপর দিকে বিপথগামী যুবকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে।' ('দৈনিক পাকিস্তান'। ২৮ নভেম্বর ১৯৭১)

জামায়াতে ইসলামীর রাজাকার বাহিনী সাধারণভাবে পাকিস্তানপন্থী সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেয়েছিলো। পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্র দেয়ার সুপারিশ করেন। কারণ,' 'সেখানে রাজাকাররা খুব ভালো কাজ করেছে।' ('দৈনিক পাকিস্তান। ৭ নভেম্বর, ১৯৭১)

স্বাধীনতা যুদ্ধকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর উল্লেখযোগ্য অপর এক প্রচেষ্টা ছিলো আল–বদর নামের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। শিক্ষিত জামায়াতী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের সমন্বয়ে গঠিত এই বদর বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্যে ছিলো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধরত বাঙালী জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তানী তথা ইসলামী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে বদর বাহিনী সার্বিকভাবে জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এর প্রকাশ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সহ সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান নিজামী (সারা পাকিস্তান প্রধান), ঢাকা মহানগরীর আমীর আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ (প্রাদেশিক প্রধান) ঢাকা মহানগরীর নায়েবে আমীর মীর কাশেম আলী (তৃতীয় নেতা) এবং কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (প্রধান সংগঠক)।

স্বাধীনতাকামীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা, হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান বানানো, সেমিনার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানী ও জামায়াতী চিন্তাধারার প্রচার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করা ছিলো বদর বাহিনীর তৎপরতার উল্লেখযোগ্য কতিপয় দিক। স্বাধীনতা যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্যভাবে বিজয়াভিমুখী বাঙালী জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য নিয়ে এরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিলো নির্বিচারে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে গভর্নরের উপদেষ্টা জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বৈঠককালে গোলাম আযমই বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা পেশ করেছিলেন। রাও ফরমান আলীর অনুমোদন লাভের পর গোলাম আযমের তৎপরতা দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছিলো। এ সময়ই তিনি মোহাম্মদপুরে বদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনে গিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী ভাষণ দিয়েছিলেন (১৭ সেপ্টম্বর '৭১)। জামায়াতে ইসলামীর মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রামও সে সময় বদর বাহিনীকে উত্তেজিত করতে শুরু করেছিলো। ১৪ সেপ্টেম্বর ''আল–বদর' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 'সংগ্রাম' লেখেঃ 'আল–বদর' একটি বিস্ময়। আল–বদর একটি প্রতিভা। যেখানে তথ্যকথিত মুক্তিবাহিনী, আল–বদর সেখানেই।

যেখানেই দুষ্কৃতিকারী, আল–বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতিকারীদের কাছে আল–বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।'

ওদিকে বদর বাহিনীর প্রকাশ্য নেতারাও একইযোগে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসাস্থ বদর বাহিনীর ক্যাম্পের এক সমাবেশে বদর বাহিনী প্রধান মতিউর রহমান নিজামী ১৩ সেপ্টেম্বর বলেছিলেন, 'যারা ইসলামকে ভালোবাসে শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালোবাসে। এবারের উদঘাটিত এই সত্যটি যাতে আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

জামায়াতে ইসলামীর আল–বদর বাহিনীর উদ্দশ্য, দৃষ্টিভংগী ও মনোভাব সম্পর্কে পরিচিত করার মতো দৈনিক 'পাকিস্তান'–এর একটি প্রতিবেদন প্রসংগত উল্লেখযোগ্যঃ 'ঐতিহাসিক 'বদর দিবস' পালন উপলক্ষ্যে ১৯৭১–এর ৭ নভেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাংগণে অনুষ্ঠিত ইসলামী ছাত্র সংঘের এক গণ জমায়েতে সংঘের 'পূর্ব পাকিস্তান শাখার' সভাপতি আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ চার দফার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। প্রথম ঘোষণায় বলা হয়ঃ 'দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্তানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্থানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেবো না।' দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচারিত হয় লাইব্রেরীসমূহের উদ্দেশ্যেঃ 'আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালি করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে কেউ স্থান দিতে পারবেন না, বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।' তৃতীয় দফায় বলা হয়ঃ 'পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে বিরুপ প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই অপপ্রচার করছে তাদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকুন।' চতুর্থ দফায় বলা হয়ঃ 'বায়তুল মোকাদ্দসকে উদ্ধারের সংগ্রাম চলবে।'

চার দফা ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেনঃ 'এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্য শির উঁচু করে, বুকে কোরান নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়াদিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো।'

জমায়েতে 'পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের' সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী 'বদর দিবসের শপথ' হিসেবে তিনটি কর্মসূচী তুলে ধরেনঃ (ক) ভারতের আক্রমণ লখে দাঁড়াবো (খ) দুষ্কৃতিকারীদের খতম করবো, (গ) ইসলামী সমাজ কায়েম করবো।'

জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মুহাম্মদ শামসুল হক। তিনি 'বাতিল' শক্তিকে নির্মূল করার শপথ নিয়ে পাকিস্ততানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেন। জামায়েতর শেষে অনুষ্ঠিত মিছিলের উল্লেখযোগ্য শ্লোগানগুলির মধ্যে ছিলো 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে', 'বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর', ভারতকে

খতম কর' 'মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর' এবং 'ভারতের চরদের খতম কর।' (দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর, ১৯৭১)

'বদর দিবস'-এর সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে, বদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী ১৪ নভেম্বর দৈনিক 'সংগ্রামে' লেখেনঃ... 'বদর যোদ্ধাদের যেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল-বদরের তরুণ মর্দে মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাল্লাহ্ সেইসব্ গুণাবলী আমরা দেখতে পাবো।.....সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আল-বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্থানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।'

বদর বাহিনীর অপর দুই প্রধান নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং মীর কাশেম আলী তাদের ২৩ নভেম্বরের বিবৃতিতে-'সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্য' সংগঠনের সদস্যদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। এই সময়কালে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছিলো, 'শত্রু আশেপাশেই রয়েছে। তাই সতর্কতার সঙ্গে কাজ চালাতে হবে। মনে রাখবেন, আপনারা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কেবল যুদ্ধ করছেন না এ যুদ্ধ ইসলামের। নমরুদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীরের (গোলাম আযমের) নির্দেশ পালন করুন।

শান্তি কমিটি এবং রাজাকার ও আল-বদর বাহিনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে নাশকতামূলক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি একইসাথে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের রাজনীতিতে দলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়েছিলো। তাদের লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের ক্ষমতায় অংশ পাওয়া। যুদ্ধরত বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সপক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা 'পূর্ব পাকিস্তানে' তাদের অবস্থানকে দৃঢ়ভিত্তি দিয়েছিলো, প্রদেশে তাদের মন্ত্রিত্বলাভ হয়ে উঠছিলো সময়ের প্রশ্ন কেবল। এই মূলধনকে কাজে লাগিয়ে জামায়াত এরপর কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতার সিঁড়ির দিকে ধাবিত হতে থাকে।

কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তার পাকিস্তান পিপলস পার্টি ছিলো জামায়াতে ইসলামীর খায়েশ পুরণের পথে প্রবল অন্তরায়। ৮৮টি আসনের বিরোধিতায় ৪টি আসনের অধিকারী জামায়াতের দাবীর কোন আইনসম্মত বৈধতালাভের সম্ভবনা ছিলো না। জামায়াতে ইসলামী তাই ডানপন্থী দলগুলোর মোর্চা গঠনের উদ্যোগ নেয়। একই সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তানে' আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে সত্তরের নির্বাচনেরও অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নটি আইনসম্মতভাবে উত্থাপন করতে শরু করে। জামায়াতে ইসলামী এই মর্মে যুক্তি হাজির করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে' নির্বাচনী ফলাফল অস্বীকৃত হওয়ায় ফলে গোটা পাকিস্তানের ফলাফলও স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হওয়া উচিত। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী রহমতে এলাহী ২৩ মে করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের সর্বত্র নতুন নির্বাচন দাবী করেন। শুধু তাই নয়, তার মতে-এই নির্বাচন হতে হবে নতুন আদমশুমারীর ভিত্তিতে কেননা, 'আদমশুমারীর সময় আগেই হয়ে গেছে।' 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে সদ্য

প্রত্যাগত জামায়াত নেতা প্রসংগক্রমে 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দেশ বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে সংকট থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন।' ('দৈনিক পূর্বদেশ'–২৪ মে, ১৯৭১)

পিপলস পার্টি নেতা ভুট্টো এর বিরোধিতা করেন, কেননা 'সমাজতন্ত্র জন্য' অগ্রসরমান এই দলটি জামায়াতে ইসলামীকে ক্ষমতার অংশ দেয়ার জন্য এত ষড়যন্ত্র আর পরিশ্রম করনি। ভুট্টোর অভিমত ছিলো 'পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচন হয়েছে; তাদের পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সুযোগ নেয়া উচিত নয়। তাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।' ('দৈনিক পাকিস্তান'–২২ মে ও ২ জুন, ১৯৭১)।

পাকিস্তান বিভক্তিতে নিরাশ হওয়ার পর 'পূর্ব পাকিস্তানের' জামায়াতীরা প্রদেশে ক্ষমতায় অংশলাভের তৎপরতা জোরদার করেছিলো। নিজেদের প্রমাণিত যোগ্যতাকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এসময়টিতেই জামায়াতে ইসলামী রাজাকার বাহিনীর পাশাপাশি বদর বাহিনীও গঠন করে। জামায়াতীদের উদ্যোগ সারা 'পূর্ব পাকিস্তানে' বিশেষ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস' উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে কার্জন হলে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে গোলাম আযম বলেনঃ 'এবার প্রাণ চাঞ্চল্যের সঙ্গে আজাদী দিবস উদযাপিত হয়েছে। কারণ–যারা পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসেন, তারা এবার আন্তরিকতা ও জাঁকজমকের সঙ্গে আজাদী দিবস পালন করেছেন। শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন জন্ম নিয়েছে।' 'কায়েদে আযমের' উদ্ধৃতি দিয়ে গোলাম আযম বলেনঃ 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্য এসেছে। তবে পাকিস্তান টিকে থাকতে হলে এর আদর্শকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে হবে।' ('দৈনিক পাকিস্তান'–১৬ আগষ্ট, ১৯৭১)

ওদিকে জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনকে সামনে রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশেকে 'স্বাভাবিক প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে 'বেসামরিক সরকার' প্রতিষ্ঠার কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা 'বাঙালী' ডাঃ এ এম মালেককে ৩ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর' হিসেবে নিয়োগ করে, ১৭ সেপ্টেম্বর শপথ নেয় মালেক সরকারের মন্ত্রিসভাঃ এতে জামায়াতে ইসলামীর আব্বাস আলী খানকে শিক্ষামন্ত্রী। এবং মাওলানা একেএম ইউসুফকে রাজস্বমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর গভর্নর মালেক বলেন যে, তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের কেউ আগে কখনো মন্ত্রিত্ব করেনি তবে তারা সবাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।' উল্লেখ্য যেদশ সদস্য বিশিষ্ট এই মন্ত্রিসভায় জামায়াতে ইসলামীর দু'জন ছাড়াও কাউন্সিল মুসলিম লীগের ২ জন, আওয়ামী লীগের ২ জন এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি কনভেশন মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামের ১ জন করে সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অগণতান্ত্রিক 'পন্থায় নিযুক্ত মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে 'প্রাদেশিক' জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের যুক্তি এ প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য। ঢাকার হোটেল 'এম্পায়ার'-এ দলীয় মন্ত্রী দু'জনের জন্য আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর বলেছিলেনঃ 'বর্তমানে প্রদেশের জনসংখ্যার যে ২০ ভাগ লোক সক্রিয় রয়েছে তারা দুভাগে বিভক্ত। একদল পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, আর একদল পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জামায়াতে ইসরামী শেষোক্ত দলভুক্ত।'

পাকিস্তান রক্ষার 'জেহাদে' জামায়াতের কয়েক হাজার কর্মীর 'শাহাদাত বরণের' কথা উল্লেখ করে গোলাম আযম বলেনঃ 'যে উদ্দেশ্যে নিয়ে জামায়াত রাজাকার বাহিনীতে লোক পাঠিয়েছে, শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছে, সে উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিসভায়ও লোক পাঠিয়েছে; দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যে কাজ করছি সেই কাজে সাহায্য করার জন্যই দু'জনকে মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করা হয়েছে।' পরিশেষে গোলাম আযম বলেন, 'এই মন্ত্রী পদ ভোগের বা সম্মানের বস্তু নয়। আমরা তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি।'

১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ 'অনুষ্ঠান শেষে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ডেপুটি আমীর মাওলানা আবদুর রহীম বিশ্বের মুসলমান, পাকিস্তানের জনগণ, বিশেষ করে জামায়াতের মন্ত্রিদ্বয়ের জন্য দোয়া করে মোনাজাত করেন।'

মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর জামায়াতে ইসলামী প্রথমেই বাঙালীদের 'পাকিস্তানী মুসলামান' বানানোর পদক্ষেপ নিয়েছিলো। দলটি 'ইসলামী শিক্ষা' প্রবর্তনের নামে কখনো বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতো না, তাদের মতে আধুনিক এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই 'পূর্ব পাকিস্তানে' ইসলাম বিরোধিতা এত ব্যাপকতা পেতে পেরেছিলো। একাত্তরের 'আজাদী দিবসে' অধ্যাপক গোলাম আযম 'দুঃখ করে' বলেছিলেনঃ 'গত ২৪ বছর যাবত পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তাই আজ ঘরে ঘরে পাকিস্তানের দুশমন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পাকিস্তানের পহেলা নম্বরের দুশমন ভারতকে বন্ধু বলে মনে করছে।' এজন্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে গোলাম আযম বলেনঃ 'যারা পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে দুশমন হয়েছে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এজন্য দায়ী করতে হবে। কারণ পাকিস্তানকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে তৈরি হওয়ার সুযোগ দিলে তারা দেশের জন্যে জান কোরবান করতো।' ('দৈনিক পাকিস্তান'- ১৬ আগস্ট, ১৯৭১)।

আমীরের বক্তব্যকে নির্দেশের মর্যাদা দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী' জামায়াতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান অচিরেই 'শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ও পুরোপুরি পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা' তুলে ধরেন। ২১ সেপ্টেম্বর তিনি বলেনঃ 'শিক্ষার প্রশ্নটিকে যদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেয়া হয় তবে যুব সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যাবে এবং তাদের যে লক্ষস্থল সেই পাকিস্তানের আদর্শ থেকে তারা বহু দুরে সরে থাকবে।' আব্বাস আলী খান বলেনঃ 'ইসলামী অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা ছাড়া আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের পাকিস্তানের পটভূমি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবো না।'

জামায়াতী শিক্ষামন্ত্রী বলেনঃ 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সকল ক্ষতির কারণ। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ ও অর্থহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন না করা হলে আমরা কিছুতেই আমাদের ধ্বংসকে রোধ করতে পারবো না।' আব্বাস আলী খান তার 'অভিমত' ব্যক্তকালে বলেনঃ 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে আমরা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার গড়ে তুলতে পারবো, আর সেই সাথে গড়ে তুলতে পারবো খাঁটি মুসলমান। আমাদের রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সবই অবশ্যই ইসলামের ভিত্তিতে হতে হবে।' বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আব্বাস আলী খান বলেনঃ 'এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ ব্যবস্থা অবশ্য-পরিত্যাজ্য।' ('পাক সমাচার', ১ অক্টোবর, ১৯৭১)

১৯ অক্টোবর 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা' প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ছাত্র সমাজকে নির্ভয়ে দেশে ফিরে আসার আহবান জানিয়ে আব্বাস আলী খান বলেনঃ 'আমাদের কাছে সব ছাত্রই নির্দোষ। তাদের সকল অপকর্মের জন্য বিপথগামী নেতৃত্ব ও ভুল শিক্ষানীতিই দায়ী। তাদের সরকার 'এই শিক্ষানীতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর' বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ('দৈনিক পাকিস্তান', ২০ অক্টোবর, ১৯৭১)

এই ঘোষণাকে বাস্তবায়নের উদ্যোগও নিয়েছিলেন আব্বাস আলী খান 'প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনার' জন্য তিনি ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটির রিপোর্ট 'মন্ত্রি পরিষদ' ৮ নভেম্বর বিবেচনায় পর অনুমোদন করে। দৈনিক 'ইত্তেফাক'- এর প্রতিদেবনে বলা হয়ঃ 'এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে কিছু সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হইবে এবং বাদ বাকী বইগুলি ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি তুলিয়া ধরার জন্য ঢালিয়া সাজানো হইবে (দৈনিক 'ইত্তেফাক', ১০ নভেম্বর ১৯৭১)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালীদের ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সমূলে উৎপাটনের যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা চলে আসছিলো, একাত্তরে পাকিস্তান কবলিত বাংলাদেশে শেষবারের মতো তারই ধারাকে সম্প্রসারণের জন্য জামায়াতে ইসলামী এমনিভাবে প্রয়াসী হয়েছিলো। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর নিরংকুশ সমর্থনে জামায়াত সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তটিতে এসেছিলো যে কোন জাতিসত্তার বিনাশ করতে হলে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপরই চূড়ান্তভাবে আঘাত হানতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একদিকে আল-বদর ও রাজাকার বাহিনী দিয়ে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত বাঙালীদের হত্যা এবং অন্যদিকে প্রশাসনিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের প্রক্রিয়াকে সফল করা গেলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আর কোনোদিন মাথা তুলতে পারবে না বা বাঙালীর উত্তরপুরুষেরা পরিণত হবে জামায়াতী চিন্তাধারার স্থায়ী আজ্ঞাবহে; বিরোধী এই উদ্যোগে কখনো

জনসমর্থনের জোরে সম্ভব হওয়ার নয়, জামায়াতে ইসলামী তাই পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তল্পিবাহক হিসেবে উদ্যোগটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিল।

ওদিকে পাকিস্তান তার 'স্বাভাবিক অবস্থা প্রমাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছিল। এই প্রক্রিয়ায় পিডিপির মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষিত হয় ৮-সেপ্টেম্বর, নির্বাচন কমিশন তার ২২ সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের শূন্য ঘোষিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে ১২ ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনী সময়সূচী নির্ধারণ করে। উল্লেখ্য যে-'বেআইনী ঘোষিত' আওয়ামী লীগের ৭৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের আসন সমূহকে আগস্টে শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৮ সেপ্টেম্বরের ভাষণে 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে' তার 'অংগিকারের কথা' পুনরায় ঘোষণা করেন। এই ভাষণেও ইয়াহিয়া খান সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেন যে 'পাকিস্তানের আদর্শের ভিত্তিতে' বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তিনি শাসনতন্ত্র তৈরি করেছেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে সদস্যদের সামনে তা সঙ্গোধনীর জন্য পেশ করা হবে।'

শাসনতন্ত্র রচনার এই অগণতান্ত্রিক পন্থার সমর্থনে জোরালো ভাবে এগিয়ে এসেছিলো জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতের আমীর মওলানা মওদুদী তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে একই দিনে লাহোরে বলেন যে-'এই 'নয়া পদ্ধতিকে' তিনি 'অত্যন্ত যুক্তিসংগত' মনে করেন। মওদুদী আরো বলেন যে-'তিনি সব সময়ই এই মত ব্যক্ত করে এসেছেন যে, জাতীয় পরিষদকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে বলার পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের উচিত খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তাকে কেবলমাত্র সঙ্গোধনের জন্য জাতীয় পরিষদে পেশ করা । ('দৈনিক পাকিস্তান', ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)। উল্লেখ্য যে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়ার ফর্মুলা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ থেকে এসময় বিরত থেকেছেন।

ইয়াহিয়া খান তার ১২ অক্টোবরের ভাষণে তিনটি প্রধান ঘোষণা দেন। ২০ ডিসেম্বর তিনি তার শাসনতন্ত্র প্রকাশ করবেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন করবেন ২৭ ডিসেম্বর এবং শাসনতন্ত্র সঙ্গোধনের জন্য পরিষদকে ৯০ দিনের সময় দেয়া হবে। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছুকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, ফাঁকা ময়দানের গোল দেয়ার দুর্লভ সুযোগ নিতেও জামায়াত এগিয়ে আসে উৎসাহের সাথে।

৭৮টি শূন্য আসনের প্রতিটির জামাতে ইসলামীর প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছিলো পাকিস্তান রক্ষার জেহাদের অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। পরিস্থিতি এবার সত্তরের মতো 'বৈরী' ছিলো না। পিডিপি, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামসহ ইসলাম পছন্দ দলগুলির সাথে যোগসাজশের ফলশ্রুতিতে ৫৮টি আসনেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ৯ নভেম্বর পর্যন্ত এমনিভাবে বিজয়ী জাতীয় পরিষদ সদস্যদের ভিত্তিতে দলগত অবস্থান ছিলো এরকমঃ জামায়াতে ইসলামী ১৫ জন, পিডিপি ১২ জন, কনভেনশন মুসলিম লীগ ৭ জন,

কাইউমপন্থী মুসলিম লীগ ৭ জন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৬ জন, নেজামে ইসলাম ৬ জন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৫ জন। (দৈনিক পাকিস্তান ১০ নভেম্বর, ১৯৭১)

লক্ষণীয় যে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী তার প্রাধান্য বজায় রেখেছিলো। ইতিহাসে এই 'জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিদের' নামের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে জামাতীদের নামগুলি এখানে দেয়া হলোঃ ঢাকার গোলাম আযম নির্বাচিত হয়েছিলেন টাংগাইল থেকে, অন্যরা ছিলেন বাখরগঞ্জের মাওলানা আবদুর রহীম, বগুড়ার আব্বাস আলী খান, খুলনার এ কে এম ইউসুফ, কুষ্টিয়ার সাদ আহমদ ও আবদুল মতিন, ঢাকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী, রংপুরের জবানউদ্দিন আহমদ, দিনাজপুরের মাওলানা তমিজউদ্দিন ও আবদুল্লাহ আল কাফি, ময়মনসিংহর এস এম ইউসুফ, নোয়াখালীর সফিউল্লাহ, রাজশাহীর আফাজউদ্দিন আহমদ, পাবনার মাওলানা আবদুস সোবহান এবং টাংগাইলের অধ্যাপক আবদুল খালেক। (দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ অক্টোবর—১০ নভেম্বর, ১৯৭১) উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেছিলো, না হলে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতো।

একাত্তরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী দ্রুত প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো এবং এর পেছনে ভূমিকা রেখেছিলো 'পূর্ব পাকিস্তান' শাখার আমীর গোলাম আযম। পরিস্থিতির অনুধাবন এই সময়কালে অত্যন্ত 'বিচক্ষণতার' প্রমাণ দিয়ে নিজেকে এবং সেই সাথে জামায়াতে ইসলামীকেও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সাফল্যের সাথে। মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি এবং নুরুল আমীনের বার্ধক্যের চমৎকার সুযোগে গোলাম আযম বিশেষ করে সেপ্টেম্বর থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' প্রধান 'প্রবক্তায়' পরিণত হতে শুরু করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান' ও তার অধিবাসীদের দাবি এসময় তার মুখ দিয়েই উচ্চারিত হতে থাকে।

১ সেপ্টেম্বর গোলাম আযম 'পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পূনর্বাসনের জন্য ৫ দফা পরিকল্পনার কথা' ঘোষণা করেন। তার প্রথম দফায় ঢাকায় সদর দফতরসহ 'পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পূনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিক কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠনের দাবি করা হয়, যার কাজ হবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করে প্রদেশের উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন ও সুপারিশ পেশ করা। দ্বিতীয় দফায়, অনতিবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। তৃতীয় দফায়, গোলাম আযম উত্তর বঙ্গে পৃথক প্রদেশ গঠনের কথা বলেন। শেষ দুটি দফায়, 'পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ' এবং 'বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা' করার দাবি জানানো হয়।

জামায়াতে ইসলামীর করাচী অফিসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম 'পূর্ব পাকিস্তানের মংগলের জন্য' অবিলম্বে মাওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ওয়ালী খান পন্থী ন্যাপ এবং ন্যাশনাল লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণারও দাবি জানান। কেননা, 'বিচ্ছিন্নতাবাদী এই দলগুলোর কর্মীরা এখনো

গোপনে সংহতি বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছেন।' তিনি এই দলগুলোর নেতৃবৃন্দকে শাস্তি প্রদানেরও দাবি করেন। (দৈনিক পাকিস্তান, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) উল্লেখ্য যে, গোলাম আযমের ৫ দফার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গৃহিত না হলেও ইয়াহিয়া খান এক আদেশে ন্যাপের উভয় গ্রুপকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইয়াহিয়া তার এই আদেশে বলেনঃ 'যারা প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা দাবী করেছিলেন, মাওলানা ভাসানী তাদের অন্যতম এবং এখন তিনি আমাদের শত্রুদের মধ্যে বসবাস করছেন। (দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১)

ইয়াহিয়া খান বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা ঘোষণা করলে মাওলানা মওদুদীর মতো গোলাম আযমও 'শুকরিয়া আদায়' করেছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান' জামায়াতে ইসলামী মজলিস-ই-শুরা ৩ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সমীপে ৭ দফা প্রস্তাব পেশ করে 'কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রে' ফেডারেল ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র পিডিএম-এর ৮ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং পূর্ব পাকিস্তান এর প্রতি সংঘটিত অবিচারের প্রতিকার করার আবেদন জানায়। (দৈনিক পাকিস্তান, ৪ অক্টোবর, ১৯৭১)

উপনির্বাচনে বিনা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' বিরাট সাফল্য 'সমাজতন্ত্রী' ভুট্টোর মোকাবিলার আইনসম্মত শক্তির উৎস হওয়ার পর গোলাম আযমের সক্রিয় উদ্যোগে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী জাতীয় পরিষদের সংযুক্ত কোয়ালিশন গঠনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। পিডিপি, জামায়াতে ইসালামী ও তিন মুসলিম লীগসহ সাতটি ডানপন্থী দলের সমন্বয়ে ১৫ নভেম্বর লাহোরে গঠিত হয় সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা এবং দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে গঠিত এই কোয়ালিশনের নেতা নির্বাচিত হন নুরুল আমীন। কোয়ালিশনটি গঠনে গোলাম আযমের অবদান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এই দিনে ঢাকায় উথাপির্ত তাঁর এক দাবির প্রেক্ষিতে। এতে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদটি এক জন 'পূর্ব পাকিস্তানীকে' দেয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। (দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর ১৯৭১) এ প্রশ্নেও ইয়াহিয়া খান গোলাম আযমের দাবির প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। ৭ ডিসেম্বর তিনি নুরুল আমীনকে প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টোকে উপপ্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্টমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য গোলাম আযমের ভাগ্যে কোনো মন্ত্রিত্ব জোটেনি।

নভেম্বরের প্রথম দিক থেকেই উপনির্বাচনে 'বিজয়ী' দলগুলোর পক্ষ থেকে 'জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের' হাতে হস্তান্তেরের দাবি উথাপিত হতে থাকে, গোলাম আযমও দাবীট সমর্থন দেন। জাতীয় সরকারের নামে 'তাঁবেদার সরকার' গঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ভুট্টো সতর্কবাণী উচ্চারণ করলে তাঁর বিরোধিতায়ও সোচ্চার হন গোলাম আযম। ২৩ নভেম্বর লাহোরে পৌঁছে তিনি 'রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে গিয়ে কার্যকরভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার' আহবান জানান। প্রসংগতঃ তিনি ভুট্টোর সমালোচনা করেন একথা বলে যে, সারা পাকিস্তানে দেশের এই দুর্দিনে একজনমাত্র লোকই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দলীয় রাজনীতি করছেন।

গোলাম আযম তাঁর অভিমত ব্যক্তকালে বলেন যে, 'দেশকে রক্ষার সবচেয়ে বড় কৌশল হলো আক্রমণ করা। আমি এ কথাটি বহুবার বলেছি এবং এখন এটা আরো বেশি সত্য।' ব্যাখ্যাদান কালে তিনি বলেনঃ 'আত্মরক্ষার চেষ্টা সব সময় শত্রুকে আরো বেশি উৎসাহী ও শক্তিশালী করে তোলে।' এবং তাই তিনি আক্রমণের পন্থা বেছে নেয়ার আহ্বান জানান। গোলাম আযম বলেন যে, 'দুষ্কৃতিকারীরা এখন খুবই সক্রিয়। ভারত প্রকাশ্যে তাদের সাহায্য ও অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা খুবই উদ্বিগ্ন।' পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি জাতীয় সরকার গঠনের আবেদন জানান। (দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১)

আদেবনটি তিনি একান্ত বৈঠকেও জানিয়েছিলেন। ১ ডিসেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সত্তর মিনিটব্যাপী আলোচনাকালে গোলাম আযম 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা হস্তান্তর করার' অনুরোধ জানান। প্রেসিডেন্টকে তিনি আরো বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য পররাস্ট ও অর্থ দফতরের দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে দিতে হবে।

ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠকশেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষাণদান কালে গোলাম আযম বলেন, প্রেসিডেন্ট এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছেন যে, 'অতীতে যে সমস্ত অবিচার করা হইয়াছে সেগুলি দূরীভূত করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনই হইবে বর্তমানের প্রধান কর্তব্য। প্রেসিডেন্টের সাড়া 'উৎসাহাবঞ্জক' বলে তিনি মন্তব্য করেন। গোলাম আযম বলেন, 'বর্তমানে জনগণের প্রধান কাজ হইতেছে দেশের প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় একত্রিত হওয়া।' তিনি এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, 'বর্তমান সংকট মোকাবিলা করার জন্য জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন।' 'তথাকথিত মুক্তি বাহিনীকে শত্রুবাহিনী রূপে আখ্যায়িত করিয়া গোলাম আযম বলেন, তাহাদিগকে মোকাবিলা করার জন্য রাজাকাররাই যথেষ্ট।' এ প্রসঙ্গে তিনি রাজাকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার জন্য আহ্বান জানান। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ গোলাম আযমকে নিরাশ করেছিলো। রাজাকার দুরে থাক, অনুগত গোলামের মতো তিনি পাকিস্তানের যে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ছিলেন উৎসর্গীত প্রাণ, তারাও বাংলাদেশের জনগণের সামনে মাথা নত করেছিলো মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে, পাকিস্তান 'টিকে থাকতে' পারেনি।

এ পর্যন্ত উপস্থাপিত তথ্য ও ঘটনাবলীর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামী কেবল বিরোধী অবস্থানই নেয়নি, একে সমূলে নস্যাতের জন্যেও দলটির প্রচেষ্টা ছিলো সর্বাত্মক। এই ভূমিকার পেছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলো জামাতের জন্মকালীন নীতি। 'হুকুমত-ই-এলাহিয়া' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন পরিচালনার নামে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরেধিতার মধ্য

দিয়ে মাতৃভূমি ও তার অধিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের অস্বীকৃতি তথা জাগরণের বিরুদ্ধে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার যে ন্যক্কারজনক নীতি মওদুদী অবলম্বন করেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে জামায়তে ইসলামীকে প্রভাবিত রেখেছিলো। এ কারণেই মওদুদীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের 'আত্মঘাতী' আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তানে জামায়াত 'টু-নেশন থিওরি'র উদ্ধত রক্ষক হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যেও তারা একই কারণে পেয়েছিলো ভারতীয় আধিপত্য এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আতঙ্ক।' একাত্তরে দলীয় ভূমিকার কারণ ব্যাখ্যা করে ১৯৮১ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'জামায়াতের আবেদন' পুস্তিকায় জামায়াতে ইসলামী বলেছেঃ 'পাকিস্তান ভেংগে যাক এটা অবশ্যই জামায়াত চায়নি।' কেননা, সে সময় জয়বাংলা ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানই প্রধান ছিল। নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু আকবর তখন শোনা যায়নি। আর এজন্যেই 'তখন ভারতের আধিপত্যের ভয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজন্ত্রের আতঙ্ক স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মংগলকর হবে বলে (জামায়াত) বিশ্বাস করতে পারেনি।'

জামায়াতে ইসলামী 'গায়ে না-মানা মোড়লে'র মতো ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের ধুয়া তুলে স্বদেশের নির্যাতিত ও শোষিত জনগণের স্বার্থের প্রশ্নটিকেই এড়িয়ে গেছে, যুক্তি হিসেবে প্রাধান্য আনতে চেয়েছে 'রাজনৈতিক মতপার্থক্যর' বিষয়টি। এই দিকটিকে কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু একথাও তো সত্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারীদের সকলেই 'জয় বাংলা' শ্লোগানটি দেয়নি, এটা ছিলো কেবল আওয়ামী লীগের শ্লোগান। মওলানা ভাসানীসহ যে বামপন্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা এই শ্লোগানটির পক্ষে ছিলেন না, তাদের লক্ষ্য ছিলো সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। কিন্তু তাঁদের মতের মিলটি ছিলো স্বদেশ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে। দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্যকে অবদমিত করে তাঁরা স্বদেশ ও জনগণের স্বার্থের প্রশ্নটিকে ওপরে তুলে ধরেছিলেন। 'নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু আকবার' শ্লোগান মুখে জামায়াতে ইসলামীও তাই আসতে পারতো স্বাধীনতার সপক্ষে এবং তাহলে আর 'মুসলিম জাতীয়তা বিনষ্ট' হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না মোটেই। আসলে বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রতি জামায়াতের আদৌ মমত্ব ছিলো না। তারা চেয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক বিজাতীয় শাসক-শোষকদের স্বার্থরক্ষা করার মধ্যে দিয়ে তল্পিবহনের মওদুদীয় নীতিকে অব্যাহত রাখতে।

যুদ্ধকালীন পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির দিকটিও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। জনগণের অধিকার এবং গণতন্ত্রকে অস্বীকারের নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই সময়কালে জামায়াত পরিষদ তথা জন প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দেয়া ঠিক নয়, সামরিক একনায়ক প্রেসিডেন্টেরই উচিত শাসনতন্ত্র তৈরি করা। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সুযোগে সত্তরের নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকারের ভিত্তিতে বিনা নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্যপদের প্রার্থনা এবং উপনির্বাচনের নামে 'ফাঁকা ময়দানে'র সুযোগ গ্রহণের মধ্য দিয়েও জনগণ এবং গণতন্ত্রের প্রতি জামায়াতের প্রকৃত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিলো।

'পূর্ব পাকিস্তান' প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকাও তার রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতারণাপূর্ণ চরিত্রকেই উন্মোচিত করেছে। প্রাধানমন্ত্রীর পদ, 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' এবং সংঘটিত অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনার মতো লোক দেখানো সস্তা কতিপয় আবেদন জানানোর মধ্যে দিয়ে গোলাম আযম যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার পেছনের সামান্যতম উদ্দেশ্যও 'পূর্ব পাকিস্তানের' কল্যাণে নিবেদিত ছিলো না। পাকিস্তান সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে 'আস্থা' ও জামায়াতের ভিত্তি তৈরির পাশাপাশি প্রধান উদ্দেশ্যটি ছিলো জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বিপর্যস্ত করা। এর কারণ, বাঙালী নিধনের প্রধান নায়কদের অন্যতম হলেও ভুট্টোর মুখে সমাজতন্ত্র উচ্চারিত হতো এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নয় কেবল, মারপিটের মধ্য দিয়েও ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের জামায়াতীদের 'ধাওয়া' করে বেড়াচ্ছিলেন। ভুট্টো এবং তাঁর পার্টিকে নাজেহাল করার মাধ্যমে জামায়াতীরা পশ্চিম পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদকে বলিষ্ঠতা দিতে চেয়েছিলেন, ওই সাথে ছিলো পাকিস্তানের ক্ষমতার আকর্ষণও। এই দ্বিবিধ লক্ষ্য হাসিল করার কৌশল হিসেবেই তারা 'পূর্ব পাকিস্তানের' দাবি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো। বাংলাদেশের চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ভূমিকা নিয়ে এবং মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাঙালী নেতাদের বিচার ও শাস্তি দাবির পাশাপাশি 'পূর্ব পাকিস্তানের' সপক্ষে অবস্থান গ্রহণের নামে জামায়াতীদের এই শঠতাপূর্ণ তৎপরতার আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্যের এই দিকটি উন্মোচিত হয়েছিলো নুরুল আমীনের নেতৃত্বে 'সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি' গঠনের মধ্য দিয়েও, ভুট্টো যাকে 'তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন।

জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতায় কেবল তথাকথিত 'রাজনৈতিক মতপার্থক্যের' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্বাধীনতা যুদ্ধকে নির্মূল করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি জাতি হিসেবে বাঙালীদের সমূলে বিনাশেরও ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো। এ জন্যই রাজাকার ও বদরবাহিনী গঠিত হয়েছিলো, শান্তি কমিটিতে যোগদানসহ এ কারণেই জামাত পাকিস্তানের খুনী সেনাবাহিনীকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছিলো।

শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ এবং সবশেষে বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েও জামায়াতের উদ্দেশ্যের উন্মোচন ঘটেছিলো। এই পরিকল্পনার সাফল্য বাঙালী জাতিকে জামায়াতী চিন্তাধারার স্থায়ী আজ্ঞাবহে পরিণত করতো। কিন্তু জাতিসত্ত্বাবিরোধী কোনো উদ্যোগ কখনো জনসমর্থনের জোরে সফল হওয়ার নয়, জামায়াত নেতা গোলাম আযম তাই পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তল্পিবাহক হিসেবে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসনের স্থায়ী পদানত অঞ্চলে পরিণত করার যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া চলে আসছিলো, ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তার নামে গোলাম আযম তাকেই চূড়ান্ত রূপদানের ভয়াবহ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

বাঙালী জাতিসত্ত্বাকে জামায়াতে ইসলামী কোনো সময়ই মেনে নিতে পারেনি, একাত্তরে তাই প্রথম সুযোগেই স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থান নেয়ার সাথে সাথে জাতি হিসেবে বাঙালীদের সমূলে উৎখাতের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় জামায়াত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলো ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দলটি জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে অবস্থান গ্রহণের ধ্বংসাত্মক নীতিকে অব্যাহত রেখেছে। ইংরেজী থেকে শুরু করে পাকিস্তানি ক্ষমতাসীনদের পদলেহন ছিলো রাজনীতির নামে এই কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষ করে বাঙালী জাতিগত ঠিকানা এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়েই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকেও ছাড়িয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে।

শঠতা, সুবিধাবাদ এবং আন্তর্ঘাতমূলক নাশকতার নীতি সব সময় জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এসেছে। সময়ে সময়ে ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে জামায়াতীরা এমনকি জনগণের অধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে জড়িত থাকারও অভিনয় করেছে। ভিন্ন ধরণের দাবি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি এবং অন্তর্ঘাতী কার্যক্রমের মাধ্যমে সবসময়ই তারা জনগণের ন্যায়সংগত আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতির পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে প্রতিক্রিয়ার অন্ধকার চোরা গলিতে।

ইতিহাস সব কিছু শিক্ষা দেয়, এমনকি ভবিষ্যৎও, আর এজন্যেই বাংলাদেশে জামায়াতের রাজনীতি ও অবস্থান প্রসঙ্গতঃ পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। একাত্তরের ভূমিকা প্রসঙ্গে মিথ্যে এবং পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'জামায়াতের আবেদন' পুস্তিকায় বলা হয়েছেঃ 'তাই বলে টিক্কা খানের সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে রক্ষা করার নামে যত অমানবিক কাজ করেছে তা কখনই জামায়াত সমর্থন করেনি।' জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর এবং একাত্তরের পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান ১৯৮৬ সনের ১৪ জানুয়ারি করাচীতে বলেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ এখন পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদের কারণে অনুতপ্ত।' দলটির প্রকাশনা বিভাগ প্রচারিত 'বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী' জানাচ্ছেঃ 'আযাদ দেশ বালাদেশের নতুন করে দাওয়াত ও কর্মসূচীর ভাষা দিলেও (জামায়াতের) মূল দাওয়াত ও কর্মসূচীর শাশ্বত রূপ বহাল থাকবে।' এরপর জামায়াতের আবেদন পুস্তিকার অন্য একটি বক্তব্যও উল্লেখযোগ্যঃ '৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতের লোকদের নৈতিক মান যাছিল আজও আল্লাহর রহমতে তা বহাল আছে।' আর এই জন্যেই ইতিহাসের সচেতন পাঠক হিসেবে জামায়াতী বক্তব্যের এদিকটির প্রতি সতর্ক মনোযোগ রাখা দরকার।

প্রতিটি যুদ্ধই জন্ম দেয় 'দালাল' নামধারী একদল লোকের। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কিছু লোক জাতীয় চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ডে অবতীর্ণ হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে 'দালাল'দের উপস্থিতি পাওয়া যায়। একাত্তরের বাংলাদেশেও খুব

স্বল্পসংখ্যক অবতীর্ণ হয়েছিল আমাদের জাতীয় চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ডে। হাত মিলিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর সঙ্গে নিজের দেশ আর জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দালালদের বিচার করেছিল তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার-যেমনটি হয়েছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় চেতনাবিরোধী দালালদের বিরুদ্ধে। আজও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে খুঁজে খুঁজে বিচার করা হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ফ্যাসিস্ট ও নাজিবাহিনীর দালালদের। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরপর বাংলাদেশ সরকারও প্রচলিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে বিচার করেছিল পাক বাহিনীর দালাল এবং সহযোগিতাকারীদের।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে পরিচালিত গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, লুটপাট ও নারী নির্যাতনে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেছিল ধর্মব্যবসায়ী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম এবং তাদের সৃষ্ট রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস নামধারী কয়েকটি ফ্যাসিস্ট বাহিনী। ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর থেকেই বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা এবং সারা বাংলার মুক্তিকামী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাক হানাদারদের দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। জনগণ এবং বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান টার্গেট আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যদের হাতের কাছে না পাওয়ার ফলে রাজাকার আল-বদর ও দালালদের বিরুদ্ধে গণরোষের তীব্রতা ব্যাপক হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে মারমুখী জনতা নিজেদের উদ্যোগেই পাকবাহিনীর দালালদের নাজেহাল ও আক্রমণ করতে শুরু করে। এর ফলে অরাজকতা দেখা দিতে থাকে। কিন্তু তখন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন পুরোপুরি কাজ শুরু করেনি। জনগণের তীব্র আক্রোশ থেকে দালালদের সাময়িকভাবে নিরাপদ এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তির জন্য তখন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনীর যৌথ কমাণ্ড দালালদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ঢাকায় আসার পর পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। মুক্তির আনন্দে উদ্বেল ও স্বজন হারানোর বেদনায় বিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে পাকবাহিনীর দালালদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে যাতে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়। বিজয়ের একমাস পর ১৬ জানুয়ারি '৭২ এ পাক হানাদারদের দালালদের সম্পর্কে প্রথম সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ 'সরকার দালাল অথবা এধরনের অপরাধীদের দেখা পেলে তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অসামরিক পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে এবং জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পুলিশকে দালালদের খবর প্রদানের জন্য।' দালাল ও অপরাধীদের বিচারের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারী সংস্থাসমূহকে ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে বলে এই প্রেসনোটে জানানো হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার ১৪ দিন পর 'দালাল অধ্যাদেশ' নামে একটি আইন জারির মাধ্যমে পাক হানাদারদের এদেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে বিচারের

আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয়। ২৪ জানুয়ারি, '৭২-এ ঘোষিত এই অধ্যাদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্টপতি দেশে গণহত্যায় লিপ্ত দখলদার পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনীর সহযোগী দালালদের দ্রুত বিচার করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। রাষ্টপতির এই আদেশ 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২' নামে অভিহিত হয় এবং তা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। একজন সেশন জজ বা একজন অতিরিক্ত সেশন জজকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এই ট্রাইব্যুনালই কেবল দালালদের বিচার করতে পারবে বলে উক্ত ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। সরকার এই অধ্যাদেশে প্রতিটি অপরাধের বিচার ও অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা অথবা এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনেরও এখতিয়ার রাখে। এই আইনে পাকবাহিনীর দালালদের সংজ্ঞা দেয়া হয় এভাবেঃ

(ক) পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে তাদের অবৈধ দখল টিকিয়ে রাখার জন্য যারা সাহায্য সহযোগিতা বা সমর্থন প্রদান করেছে।

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সব ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা দল দখলদার পাক বাহিনীকে বস্তুগত সহযোগিতা প্রদান করেছে অথবা কোন কথা, চুক্তি বা কার্যাবলীর মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে সমর্থন যুগিয়েছে।

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

(ঘ) মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সব ব্যক্তিরা কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে অথবা ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে।

(ঙ) পাক বাহিনীর গণহত্যা, অবৈধ দখলের অনুকুলে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেয়া এবং হানাদার বাহিনীর কোন প্রতিনিধি দল বা কমিটির সদস্য হওয়া।

(চ) পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আয়োজিত তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশ নেয়া।

২৯ মার্চ '৭২ এ-এক ঘোষণায় সরকার জল্লাদ বাহিনীর দালালদের বিচারের জন্য ৭৩ টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন কর হয়। ঘোষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর কাজে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের বিচার তরান্বিত করা এবং সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলো গঠন করা হয়েছে। ২৪ জানুয়ারি '১৯৭২-এর 'বাংলাদেশ দালাল' (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ অনুসারেই গঠিত হয় এই ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। তৎকালীন সকল জেলাতেই ট্রাইব্যুনালগুলো গঠন করা হয়েছিল। জেলাওয়ারীভাবে গঠিত ট্রাইব্যুনালের তালিকা ছিল এরকম—

(১) ঢাকা—১১টি (২) ময়মনসিংহ—৭টি, (৩) টাংগাইল—২টি, (৪) ফরিদপুর—৩টি (৫) চট্টগ্রাম—ও পার্বত্য চট্টগ্রাম—৬টি, (৬) সিলেট—৫টি, (৭) কুমিল্লা—২টি, (৮) নেয়াখালী—৩টি, (৯) রাজশাহী—২টি, (১০) দিনাজপুর—২টি (১১) রংপুর—৪টি, (১২) বগুড়া—২টি, (১৩) পাবনা—৪টি যশোর—৪ টি, (১৫) কুষ্টিয়া—২টি, (১৬) বাকেরগঞ্জ—৬ টি, (১৭) পটুয়াখালী—২টি।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর থেকে সারা বংলাদেশে দখলদার বাহিনীর দালালদেরকে গ্রেফতার করা শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বরের আগে যেসব এলাকা শত্রুমুক্ত হয়েছিল, সেসব এলাকায় তখন থেকেই দালালদের ব্যাপক গ্রেফতার শুরু হয়। একাত্তরের ডিসেম্বরের শুরু থেকে '৭২-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ১২,৮৩৫ জন ব্যক্তিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালালির অভিযোগে বিভিন্ন পর্যায়ে আটক করা হয়। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ে গেফতারকৃত দালালদের মধ্যে কিছু দালালের নাম প্রকাশ করা হলোঃ

৫ই জানুয়ারি '৭২ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত গ্রেফতারকৃত দালালদের তালিকা থেকে—

(১) রাশিদুল হাসান, সাবেক ডেপুটি কমিশনার, খুলনা (২) মাওলানা মাসুম—সদস্য, ঢাকা কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি (৩) ডাঃ আব্দুর রহমান (জামায়াতে ইসলামী), বাগাবাড়ী, ফরিদপুর, (৪) মোহাম্মদ আলী, ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য, জয়দেবপুর, ঢাকা, (৫) আব্দুল হাকিম মোল্লা, সাবেক সি. আই—মাগুরা, যশোর, (৬) এ. এফ. এম শাফিউজ্জামান খান—সাবেক গভর্নর মোনেম খানের পুত্র (৭) এ. কে. এম. খালেকুজ্জামান খান-সাবেক গভর্নর মোনেম খানের পুত্র (৮) এস. আই. কাজী আনোয়ার হোসেন সাবেক ও. সি.—মাগুরা থানা।

৭ই জানুয়ারি '৭২ এর দৈনিক বাংলায় ২৭ জন দালাল গ্রেফতার করার খবর প্রকাশিত হয়। এখানে কয়েজনের নাম প্রকাশিত হলো—

(১) অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামী, শেরপুর, ময়মনসিং, (২) তসলিমউদ্দিন আহমদ, সাবেক এস. ডি. ও. ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, (৩) আব্দুল ওহাব উকিল, পিডিবির সেক্রেটারী, নোয়াখালী ১৩ জানুয়ারী '৭২ এর দৈনিক বাংলায় ১২৮ জন দালাল গ্রেফতারের প্রকাশিত তালিকা থেকে--(১) এস. এম. সোলায়মান, চট্টগ্রাম রেলওয়ের সাবেক সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার, (২) অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ফরিদপুত্র রাজেন্দ্র কলেজ, (৩) খন্দকার আবদুল বারী—এস. আই. পুলিশ, বাকেরগঞ্জ।

১৪ জানুয়ারি '৭২-এর দৈনিক বাংলায় ৩৭ জন দালাল গ্রেফতারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। এখানে তাদের কয়েকজনের নাম—

(১) সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ঢাকা রেডিওর সাবেক সহকারী আঞ্চলিক ডিরেক্টর, (২) এ. আর. এম. ফজলুর রহমান—সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারী, সিভিল এফেয়ার্স, বড় মগবাজার, ঢাকা (৩) গোলাম রাব্বানী খান, রাজশাহী বেতারের সাবেক আঞ্চলিক ডিরেক্টর, (৪) আবু শাহাদাত—ঢাকা বেতারের সাবেক আঞ্চলিক ডিরেক্টর (৫) মুজাফফর ইসলাম—সাবেক ও. সি. জয়দেবপুর, ঢাকা (৬) এ. এস. এম. রিজভী—সাবেক ও সি. কোতায়ালী,

ময়মনসিংহ ১৫ জানুয়ারী '৭২ দৈনিক বাংলায় ৩৮ জন রাজাকার দালাল গ্রেফতারের তালিকা থেকে—

(১) হাফিজুল ইসলাম, ডি. জি. এম. ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ঢাকা (২) নুর হোসেন (অবঃ) পুলিশ ইন্সপেক্টর, (৩) আলী হায়দার মোল্লা, পুলিশ ইন্সপেক্টর—বিশেষ ব্রাঞ্চ (৪) ডঃ মোহর আলী, রীডার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাবেক গভর্ণর মোনেম খানের ভাগ্নের গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়েছিলঃ 'আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গত বুধবার পাক হানাদারদের দালাল মনসুর রহমান তালুকদারকে গ্রেফতার করে রমনা থানায় সোপর্দ করেছে। মনসুর রহমান প্রাক্তন গভর্ণর মোনেম খাঁর ভাগ্নে বলে পরিচিত। উক্ত মনসুরের সহায়তায় পাক বাহিনী ময়মনসিংহের বহু গ্রাম বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।'

১৭ মে '৭২-এর দৈনিক বাংলায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষকের পাকবাহিনীর দালালিসংক্রান্ত অভিযোগে গ্রেফতার হবার খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ 'হানাদার পাক বাহিনীর দালালী করার অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষককে সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকরা হচ্ছেনঃ বাণিজ্য বিভাগের প্রধান মকবুল আহমদ, ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আহমদ মোহাম্মদ প্যাটেল, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সোলায়মান মণ্ডল, মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ওয়াসিম বারী, আইন বিভাগের রীডার ডঃ গোলাম সাকলায়েন, একই বিভাগের অধ্যাপক আজিজুল হক ও শেখ আতাউর রহমান। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে।

১০ ফেব্রুয়ারি '৭২-এর দৈনিক বাংলার প্রথম পাতায় নুরুল আমীন, সবুর গংয়ের ফেরার ঘোষিত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়ঃ অধুনালুপ্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাকে গতকাল সরকার ২২শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্ব-স্ব এলাকার মহকমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হতে বলেছে। তাদের নামে যে সব স্থাবর সম্পত্তি আছে তা এবং তাদের বেনামী বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে।'

ফেরার ঘোষিতদের তালিকাঃ (১) নূরুল আমিন, পিতা মরহুম জহিরুদ্দীন, সাকিন—আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টারস, ২০ নং ইস্কাটন রোড, রমনা থানা, জেলা—ঢাকা।

(২) হামিদুল হক চৌধুরী, পিতা—আক্কাস আলী চৌধুরী, গ্রাম-রামনগর, থানা—ফেনী, জেলা—নোয়াখালী, নিরালা গার্ডেন, গ্রীন রোড, তেজগাঁও-ঢাকা।

(৩) খান এ, সবুর, পিতা—মরহুম নজমুল খান, সৈয়দ মহল্লা, থানা—ফকিরহাট, জেলা—খুলনা, যশোর রোড, থানা—কোতয়ালী, জেলা—খুলনা ও প্লট নং—২৮/১ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, বোড নং-২৫।

(৪) মাহমুদ আলী—পিতা মরহুম মুজাহিদ আলী, সুনামগঞ্জ শহর, থানা—সুনামগঞ্জ, সিলেট, ১৮০ ধানমণ্ডী আসাবিক এলাকা, রোড নং-১৯, থানা-লালবাগ, ঢাকা।

(৫) ওয়াহিদুজ্জামান ওরফে ঠাণ্ডা মিয়া, পিতা–মরহুম আব্দুল কাদের। গোপালগঞ্জ শহর, থানা—গোপালগঞ্জ, জেলা—ফরিদপুর। ১০/১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, থানা—রমনা, জেলা—ঢাকা।

(৬) খাজা খয়েরুদ্দিন, পিতা—খাজা আলাউদ্দিন, ১৫ আহসান মঞ্জিল, থানা—কোওয়ালী, জেলা—ঢাকা।

(৭) কাজী আবদুল কাদের, পিতা—কাজী এল আবেদউদ্দিন আহমদ। গ্রাম—সোয়ালমনি। থানা—জলঢাকা, জেলা—রংপুর। ৮ নং গুলশান, তেজগাঁও, জেলা—ঢাকা। ১১ নং হাটখোলা, সুত্রাপুর, ঢাকা।

(৮) রাজা ত্রিদিব রায়, পিতা মৃত মীনাক্ষ রায়। রাজবাড়ী—রাংগামাটি শহর, থানা—কোতোয়ালী, জেলা—পার্বত্য চট্টগ্রাম।

(৯) আউং শু প্রু, পিতা—সেই আউং প্রু। গ্রাম—বান্দরবান, থানা—বান্দরবান, জেলা—পার্বত্য চট্টগ্রাম।

(১০) অধ্যাপক গোলাম আযম, পিতা—মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, গ্রাম—বীরনগর, থানা—নবীনগর, জেলা কুমিল্লা। ৩৮ নং এলিফ্যান্ট রোড, রমনা, ঢাকা।

(১১) শাহ আজিজুর রহমান, পিতা—শাহ মোহাম্মদ সিদ্দিক, গ্রাম—থানাপাড়া, থানা—কোতোয়ালী, জেলা কুষ্টিয়া। ২২ ইস্কাটন রোড, রমনা, ঢাকা।

(১২) এ. জব্বার খদ্দর, পিতা—আবদুল হামিদ চৌকিদার। গ্রাম—গনক, থানা—সোনাগাজী, জেলা—ফেনী।

২৪ ফেব্রুয়ারি '৭২–এর দৈনিক বাংলায় কুখ্যাত দালাল সবুর খানের গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যতম বড় দালাল খান. এ. সবুর খানকে পুলিশ গত মঙ্গলবার (২২ ফেব্রুয়ারী) ঢাকায় গ্রেফতার করে। খান সবুর তার প্রভূদের নির্দেশে খুলনা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার বাংগালীকে হত্যা করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে পরিকল্পনা করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে।

খান. এ. সবুর ছিল কুখ্যাত কাইয়ুম মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল। এ ছাড়াও ছিল পাকিস্তানী শাসকদের খুবই পেয়ারের লোক। তাই সরকারের বড় বড় পদেও আসীন থাকতো। ঘৃণিত আইয়ুব খানের আমলে খান. এ. সবুর ছিল মন্ত্রী পরিষদের প্রবীণতম সদস্য। পাক সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী থাকাকালে তার বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ পাওয়া যায়।'

১৮ ফেব্রুয়ারি '৭২–এর দৈনিক বাংলায়, ৫৪ জন দালালের সম্পত্তি ক্রোকের ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ 'বাংলাদেশ সরকার বে–আইনী ঘোষিত জামায়াতে ইসলামীর এককালীন আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম, কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি শামসুল হুদা, আইয়ুবী আমলের জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার কনভেনশন লীগের এ. টি. এম. এ. মতিন, পিডিবির এডভোকেট জুলমত আলীসহ ৫৪ জন ব্যক্তির নামে বা বেনামীতে

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করেছে। এদের সবাইকে ২৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিজ নিজ এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির হতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ১৭ (১) ধারা বলে এই নির্দেশ জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।'

২৪ জানুয়ারী '৭২ এ দালাল অধ্যাদেশে ঘোষণা ও ২৯ মার্চ '৭২-এ ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পাক বাহিনীর দালালদের বিচারপর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এবং বিচারের পদ্ধতি অনুসারে দালাল আইনে আটকৃত ব্যক্তিরা আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ লাভ করে নিজ নিজ উকিল নিয়োগের মাধ্যমে। বিচারপর্ব গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এ ছাড়াও গ্রেফতারকৃতদেরকে সকল সুবিধা প্রদান করা হয় এবং বিচারের নিরপেক্ষতা ও সার্বজনীনতা বজায় রাখা হয়। দালালদের বিচারের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয় প্রচলিত পেনাল কোড এবং মানবতা ও মানুষের জান, মাল ও সম্মানহানীকর অপকর্মের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী। শাস্তির বিধানের মধ্যে ছিল মৃত্যুদণ্ড এবং বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড। কারাদণ্ডের ন্যূনতম সময়সীমা নির্ধারিত করা হয় তিন বৎসর। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অপরাধীদেরকেই বিচার করা হয়েছিল। এখানে পাক বাহিনীর দালালদের বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে দেয়া হলোঃ

ঢাকা উচ্চতর বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডঃ এম. এ. কে. আজাদ ১৫ ডিসেম্বর '৭১ এ আল বদর বাহিনীর হাতে শহীদ হন। ডঃ আজাদ হত্যার মামলার বিচার শুরু হয় জুন মাসে। ১৩ জুন '৭২-দৈনিক বাংলার প্রথম পাতায় ডঃ আজাদ হত্যা মামলার চার্জশীট প্রদানের রিপোর্টে লেখা হয়ঃ আল বদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় ঢাকার উচ্চতর বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডঃ এম. এ. কে. আজাদ পি. এইচ. ডি হত্যা মামলায় গোয়েন্দা বিভাগ দুই জনের বিরুদ্ধে অপহরণ, হত্যা ও দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করেছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ঢাকার ইভনিং পোষ্ট পত্রিকার সম্পাদক হাবিবুল বাশার গত ২৪শে জানুয়ারী লালবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটার সময় আল-বদর বাহিনীর পাঁচ জন লোক শাহসাহেব বাড়ীর জনৈক শাহ ওয়ালিউল্লাহ-এর পুত্র জুবায়ের এর সাথে ডঃ আজাদের আজিমপুরের দায়রা শরীফস্থ বাড়ীতে হানা দেয় এবং ডঃ আজাদকে অপহরণ করে।

বাদী তার অভিযোগে আরও বলেন যে, তিনি আজাদের বড় ভাই এবং অপহরণের খবর পেয়ে তিনি বাড়ী ছুটে আসেন। ঘটনার সময় সেই বাড়ীতে তাদের ভাই আবুল খায়ের, জাকির হোসেন ও বোন সালমা ও সেলিনা উপস্থিত

ছিল এবং তাদের মাও ছিলেন। সেলিনা বাদীকে বলেন যে, একজন বদর বাহিনীর লোককে তিনি চিনতে পেরেছন এবং দেখলে সনাক্ত করতে পারবেন। বদর বাহিনীর লোকেরা মুখোশ পরে এসেছিল। জুবায়ের বাদীকে জানায় যে, ডঃ আজাদকে আজিমপুরের রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হাজী কাশেমের বাড়ীতে খোঁজ করে ডঃ আজাদকে না পাওয়ার পর লালবাগ থানায় যোগাযোগ করলে ও. সি. সাহেব বলেন যে, ডঃ আজাদকে বদর বাহিনীর লোক ধরে নিয়ে গেছে এবং তাকে উদ্ধার করা তাদের পক্ষে সম্ভব না।

বাদী এজাহারে বলেন যে, ১৭ ডিসেম্বর রায়ের বাজার ডোবা থেকে মিত্র বাহিনীর সৈনিকদের সহায়তায় ডঃ আজাদের মৃতদের উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে এবং বুকে, মাথায় গুলির দাগ এবং বেয়নেটের খোঁচা ছিল। হাবিবুল বাশারের এজাহার দাখিলের পর লালবাগ থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে আসামী মকবুল হোসেন ও আয়ুব আলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে উল্লেখ করেন যে ডঃ আজাদকে অপহরণ করার পর দৃষ্কৃতিকারীরা আজিমপুরে মহল্লার কাজী মন্টু, কাজী মতিউর রহমান এবং ভুলু ওরফে বদরউদ্দিনকে অপহরণ করে এবং যে মাইক্রোবাসে ডঃ আজাদকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই একই বাস সবাইকে নিয়ে যায়। আসামী মকবুল হোসেন ১৫ ই ডিসেম্বর অপরাধ সংগঠনের সময় যে কাল চশমা পরেছিল তাকে আটক করার সময়ও তার চোখে সেই চশমা লাগানো ছিল। পুলিশ চশমাটি আটক করে।

১২ জুন ’৭২ এ চার্জশীট প্রদানের পর বিভিন্ন পর্যায়ে ডঃ আজাদ হত্যা মামলার সাক্ষ্য ও জেরা পর্ব চলে এবং পর্যায়ক্রমিক সব বাদী ও বিবাদীদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ৫ অক্টোবর ’৭২ এই মামলার রায় প্রদান করা হয়। এ সম্পর্কে ৬ অক্টোবর ’৭২-এর দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টে লেখা হয়ঃ ‘গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য সৈয়দ সিরাজুদ্দিন আহমদ অংকশাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ আজাদকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত মকবুল, আয়ুব আলী ও জুবায়েরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মত্যুদণ্ডাদেশ দিয়োছেন।

এই তিনজন যুবককে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ২ (খ) অনুচ্ছেদ বলে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

আসামী জুবায়ের ওরফে আহমদউল্লাহ আজিমপুর শাহ সাহেব বাড়ীর ছেলে ও ডঃ আজাদের ভাড়াটে বাড়ীর অন্যতম মালিক। অপর দুইজন আসামী ময়মনসিংহের লোক। প্রকাশ, দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৮ টার সময় খাকী পোশাক পরিহিত ৫ জন আল বদর ডঃ আজাদকে অপরহণ করে। ডঃ আজাদের মা, ভাই, বোন ও অন্যান্য লোক ডঃ আজাদকে অপরহণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং আসামী জুবায়ের আল বদর সদস্যদিগকে ডঃ আজাদের বাসা দেখাইয়া দিয়াছিল। ডঃ আজাদকে

বলপূর্বক নেওয়ার সময় তাহার মা ও বোন বাধা দিতে গেলে তাহাদেরকে দুস্কৃতিকারীরা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দুইদিন পর রায়ের বাজারের একটি গর্ত হইতে ডঃ আজাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। সরকার পক্ষে স্পেশাল পি,পি আবদুর রাজ্জাক খান ও আসামী জুবায়ের, মকবুল ও আইয়ুব আলীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন যথাক্রমে—মেসার্স মোঃ আজম জোয়ারদার, ফয়জুদ্দিন ভুঁইয়া।'

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলাটির চার্জশীট প্রদান করা হয় ১৯ মে '৭২–এ এবং রায় প্রদান করা হয় ১৮ জুলাই। ২০ মে '৭২–এর দৈনিক বাংলায় শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার চার্জশীট প্রদান সম্পর্কিত রিপোর্টে লেখা হয়ঃ 'গতকাল ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানী আগামী ১৯ শে জুন পর্যন্ত মূলতবী রাখেন। এই মামলায় বর্তমানে বিলুপ্ত জামাতে ইসলামীর ঢাকা শহর–শাখার সেক্রেটারী আবদুল খালেকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলার মধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানী সর্বপ্রথম দায়রা আদালতে শুরু হয়েছে। শহীদুল্লাহ কায়সার একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি নিখোঁজ জহির রায়হানের জ্যেষ্ঠ সহোদর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বক্ষণে পাকবাহিনীর দোসর আল–বদর দুস্কৃতিকারীরা তাকে অপহরণ করে।' এই হত্যা মামলার শুনানীর প্রথম দিন সম্পর্কে জুলাই '৭২–এর দৈনিক বাংলার প্রথম পাতায় প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়ঃ 'গতকাল ৩রা জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এফ, রহমানের এজলাসে শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যার মামলার শুনানী প্রথম দিনে বাদীপক্ষের একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়।

নিহত শহীদুল্লাহ কায়সারের ভগ্নিপতি এবং এই মামলার অভিযোগ প্রদানকারী নাসির আহমদ তাঁর সাক্ষ্য প্রদানকালে উল্লেখ করেন যে, শহীদুল্লাহ কায়সার মুক্তিসংগ্রামর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। গত সালের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর সাত আটজন লোক তাদের কায়েতটুলির বাসভবনের দরজা ভেংগে ভেতরে প্রবেশ করে। তাদের কাছে ষ্টেনগান, রাইফেল ও রিভলভার ছিল। তাদের পরনে ছাই রংগের পোষাক ছিল। আমি তাদের আল–বদর বাহিনীর লোক বলে বুঝতে পারি। তারা শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর স্ত্রীপুত্র পথরোধ করে দাঁড়ালে তাদের ষ্টেনের বাট দিয়ে ধাক্কা দেয়া হয়।....দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে বহু বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায় কিন্তু তার লাশ পাওয়া যায়নি। পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন যে, আসামী খালেক ঘটনার দিন শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজ করেছিল এবং আসামী একজন জামাত কর্মী ও বদর বাহিনীর লোক।

বাদী আসামীকে কাঠগড়ার সনাক্ত করে বলেন যে, তিনি ও মামলার অপর সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব আসামীর বাড়ী যান। তার বাড়ী তল্লাশী করা হয় এবং

মিলিটারীর সাথে যোগাযোগ সম্বলিত কিছু কাগজপত্র ও কয়েকটি ফটো উদ্ধার করেন।....প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যার দায়ে গোয়েন্দা পুলিশ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের 'খ' ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করেছে।'

১৮ জুলাই '৭২ এর দৈনিক বাংলায় শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যার মামলার রায়ের রিপোর্টটি প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়ঃ 'গতকাল ১লা জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল পাক দখলদার বাহিনীর দোসর আল বদর বাহিনী বর্তৃক বুদ্ধিজীবী নিধন মামলায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার রায় প্রদান করে বেআইনী জামাতে ইসলামীর বেতনভুক্ত দফতর সম্পাদক এ. বি. এম. আব্দুল খালেককে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন। মাননীয় স্পেশাল জজ জনাব এফ. রহমান আসামীকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৬৪ নং ধারা ও দালাল আদেশের দ্বিতীয় তফসিলের কতিপয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করে বলেন যে, আসামী হত্যা করার অভিপ্রায়ে পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপরহণ করে।'

৭ অক্টোবর '৭২-এ দখলদার আমলের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্নর ডাঃ আবুদল মোতালিব মালেকের বিচার শুরু হয়। সেদিন তাঁকে কোর্টে হাজির করা হয়। ৮ অক্টোবর '৭২-এর দৈনিক ইত্তেফাকে এ. সম্পর্কে রিপোর্টে লেখা হয়ঃ 'বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর তদানীন্তন গভর্ণর 'দালাল আইনে' আটক ডাঃ আবদুল মোতালিব মালেককে বিচারের জন্য গতকাল সকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁহার হাজিরার পর আসামীর আবেদনক্রমে মামলার শুনানি মূলতবী রাখা হয়। এবং আগামী ১৩ই নভেম্বর মামলার শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়। ঢাকার দায়রা জজের আদালতে অনুষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই অধিবেশনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এ এইচ. চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ মালেক মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য সাবেক তথ্য ও বেতার মন্ত্রী কুমিল্লার মুজিবুর রহমানকেও হাজির করা হয়।-- প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ মালেককে ঢাকার দায়রা জজকোর্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির করা উপলক্ষ্যে আদালত এলাকা লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে— সরকার পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সরকার ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং দখলীকৃত বাংলাদেশে গণহত্যা, গৃহদাহ এবং নারী নির্যাতনের ব্যাপারে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে ঢাকার সি. আই. ডি. পুলিশের ইন্সপেক্টর আবদুর রাজ্জাক গত ৩১-৩-৭২ তারিখে এই মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের পর হইতে দখলদার বাহিনীর আমলে ডাঃ মালেক বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা, লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা, বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া এবং গণহত্যার ব্যাপারে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দালাল আইনের ১১ (ক) আর্টিকেলের ১২১ এবং ১২৯ (ক৬) ধারামতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করা হইয়াছে।'

পর্যায়ক্রমিক সাক্ষ্য গ্রহণ ও সওয়াল-জবাব শেষে ২০ নভেম্বর '৭২ এ দৈনিক উত্তেফাকে গভর্নর মালেকের বিচারের রায় সম্পর্কিত রিপোর্টে লেখা হয়ঃ গতকাল (সোমবার) ঢাকার এক নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আমলে বাংলাদেশে জংগী ইয়াহিয়া শাহীর সর্বশেষ গভর্ণর ডাঃ আবদুল মোতালিব মালেককে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, গৃহদাহ, লুটতরাজ চালানো এবং বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রাম বানচাল করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে দখলদার পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সরাসরি সহযোগিতা করার দায়ে অভিযুক্ত এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২১ ধারা মতে তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারক আবদুল হান্নান চৌধুরী রায় দান প্রসংগে বলেন যে, ডাঃ এ. এম. মালেকের বয়স ৭০ বৎসর। তাহার এই বার্ধক্য এবং তদুপরি অতীতে তাহার রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে বাংলাদেশে দণ্ডবিধির ১২১ ধারামতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হইল। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মাননীয় বিচারক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান করিয়া রায় ঘোষণার সময় দখলদার আমলে বাংলাদেশে জংগী ইয়াহিয়ার সর্বশেষ তাঁবেদার গভর্ণর ডাঃ এ. এম. মালেকের মুখে ম্লান হাসি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া মাননীয় বিচারক সুদীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘন্টাব্যাপী তাঁহার লিখিত ২১ পৃষ্ঠার রায় পাঠ করিয়া শোনাইবার সময় আসামীর কাঠগড়ায় বসা পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় উপবিষ্ট ডাঃ মালেককে সর্বক্ষণই খুব বিষন্ন দেখাইতেছিল।—মাননীয় বিচারক তাঁহার রায়ে বলেন যে, বাংলাদেশ দালাল অর্ডার (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) ১৯৭২ এর ১২১ এবং ১২৪ (ক) ধারানুযায়ী বর্ণিত সকল অভিযোগে ডাঃ মালেক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে ১২১ দণ্ডবিধি মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ১ নং তফসিলে বর্ণিত ১২৪ (ক) দণ্ডবিধি অথবা দালাল আইনে ৪ (খ) ধারা অনুযায়ী তাহাকে পৃথক কোন দণ্ড প্রদান করিলাম না। মাননীয় বিচারক তাঁহার রায়ে আরও বলেন, মৌখিক প্রমাণ্য সাক্ষ্য হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে দখলদার পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অভিযুক্ত ডাঃ এ. এম. মালেক গভর্ণরের পদ গ্রহন করিয়া দখলদার বাহিনীকে সরাসরি ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জনগণের কল্যাণ করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ এই মামলায় উপস্থাপিত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার ব্যাপারে দখলদার বাহিনীর হস্ত শক্তিশালী করার

জন্য জনসাধারণকে উস্কানি দিয়াছিলেন উল্লেখযোগ্য যে, এই মামলায় সরকার পক্ষের মোট ২৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া মামলার প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসাবে প্রায় একশত দলিল পেশ করা হয়। এই মামলায় সরকার পক্ষে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধাপরাধী মামলার প্রধান কৌসুলী জনাব সিরাজুর হক। সিনিয়র বিশেষ সরকারী কৌসুলী খোন্দকার মাহবুব হোসেন এবং আব্দুর রাজ্জাক। বিবাদী পক্ষে ছিলেন মেসার্স আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন আহমদ, আমজাদ আলী, মনসুরুল্র রহমান, হাবিবুর রহমান এবং কাজী সাহাদত হোসেন।

৫ অক্টোবর '৭২-এ দৈনিক ইত্তেফাকে মাওলানা ইউসুফের বিচার- পর্বের সূচনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়ঃ 'গত মংগলবার (৩ অক্টোবর '৭২) সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফকে এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ আব্দুল হান্নান চৌধুরীর কোর্টে হাজির করা হয়। আসামী মাওলানা ইউসুফ ১৯৭১ সালের ১৭ই সেপ্টম্বর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ মালেক পরিষদে রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে যোদগান করেন। তাহার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী ১৯৭১ সালের তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া দখলদার বাহিনীর দালালি করেন। ইয়াহিয়ার পুতুল সরকারকে বাংলাদেশে টিকাইয়া রাখার জন্য তিনি নানাস্থানে সভা করিয়া মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের খতম করিয়া পাক বাহিনী, রাজাকার ও বদর বাহিনীকে সহযোগিতা করার আবেদন জানান।

১৬ ডিসেম্বর '৭২-এর দৈনিক ইত্তেফাকে শেষ পাতায় মাওলানা ইউসুফের বিচারের রায় সম্পর্কিত রিপোর্টে লেখা হয়ঃ 'গতকাল (শুক্রবার) ঢাকার তিন নম্বর স্পেশাল জজ মিঃ এস, বি, বড়ুয়া বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী নেতা ও ডাঃ মালেক মন্ত্রী পরিষদের সাবেক রাজস্ব মন্ত্রী মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফকে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।'

২৬ নভেম্বর '৭২-এর নৈদিক ইত্তেফাকে মন্ত্রী জসিমউদ্দিনের বিচারের রায় সম্পর্কিত রিপোর্টে লেখা হয়ঃ 'গতকাল (শনিবার) ঢাকায় দুই নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ সিরাজুদ্দিন আহমেদ ডাঃ মালেক মন্ত্রিসভার আইন ও পার্লামেন্ট দফতরের মন্ত্রী জনাব জসিমউদ্দিন আহমদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বিচারক তাঁহার রায়ে বলেন, অভিযুক্ত জনাব জসিমউদ্দিন আহমদ মনে প্রাণে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করিতেন। তিনি বহুকাল সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন, তা ছাড়া তিনি সিলেট বারের একজন সিনিয়র আইনজীবী। তাহার অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার জীবন রক্ষা প্রয়োজন বিধায় আমি তাহাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়া

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম। প্রকাশ, পাকিস্তানের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানোর সময় তাহারা এই দেশের কিছু সংখ্যক লোকের সহায়তা চায়। আসামী এই দেশকে পাকিস্তানের শাসনাধীনে রাখার জন্য বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য সহায়তা প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে বাঙালীদের ক্ষেপাইয়া তুলিবার ও সেই সংগ্রামকে নস্যাৎ করিবার জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতি করিয়াছেন এবং বক্তৃতা দিয়া বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণার সঞ্চার করেন। আসামী মন্ত্রিসভার বৈঠক করিয়া বাংলাদেশ সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং রাজাকারদের সংখ্যা ১০ লক্ষে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। বিচারক তাঁহার রায়ে উল্লেখ করেন সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টে ইহাই প্রমাণ করে আসামী ইচ্ছাকৃতভাবে মালেক মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করিয়া দখলদার বাহিনীকে সাহায্য করেন ও নানাস্থানে সভা-সমিতি করিয়া বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণা সঞ্চার করেন।'

কুষ্টিয়ার রাজাকার চিকন আলীর মৃত্যুদণ্ড ছিল দালালদের বিচারের রায়ের মধ্যে প্রদত্ত প্রথম মৃত্যুদণ্ডাদেশ। ১১ জুন '৭২-এর দৈনিক বাংলায় এ সম্পর্কিত রিপোর্টে লেখা হয়ঃ 'কুষ্টিয়ার দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য শ্রী আর কে বিশ্বাস গত বৃহস্পতিবার রাজাকার চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ১১ (ক) ধারা বলে চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দালাল আদেশের অধীনে এই প্রথম একজনকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হলো। মামলার বিবরণে প্রকাশ, বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর শাসনামলে মীরপুর গ্রামের চিকন আলী রাজাকার তালিকাভুক্ত হয়। সে হত্যা, লুটতরাজ, ঘর-বাড়ি জ্বালানো এবং মেয়েদের মর্যাদা হানির কাজে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১৯শে অক্টোবর অভিযুক্ত চিকন আলী তার গ্রামের বাড়ীতে কামালউদ্দিন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে বলে যে সে জনৈক ইয়াজউদ্দিনের বাড়ী থেকে দুলালী বেগমকে বের করে আনতে ইচ্ছুক। পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকারদের হামলা থেকে রক্ষার জন্য আব্দুল গফুরের মেয়ে দুলালী বেগমকে ইয়াজউদ্দিনের বাড়ীতে রাখা হয়। এর পরই চিকন আলী ইয়াজউদ্দিনের বাড়ীতে যায়। মেয়েটি তখন তার বাড়ীতেই ছিল। সে ইয়াজউদ্দিনের কাছ থেকে দুলালী বেগমকে দাবী করে। কিন্তু ইয়াজউদ্দিন দুলালী বেগমকে দিতে অস্বীকার করায় চিকন আলী রাইফেলের সাহায্য গুলি করে ইয়াজউদ্দিনকে হত্যা করে।'

রাজাকার চিকন আলী পরবর্তীতে হাইকোর্টে আপীলের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডাদেশ থেকে রেহাই পেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদকাল শেষে চিকন আলী এখন নিজগ্রাম মিরপুরে বসবাস করছে।

২০ জুন '৭২-এর দৈনিক বাংলার প্রথম পাতায় আসগর হোসেনের বিচারপর্বের সূচনাসংক্রান্ত রিপোর্টে লেখা হয়ঃ 'গতকার সোমবার দালালী মামলায় অভিযুক্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ডেপুটি স্পীকার আসগর হোসেনের বিচার ঢাকার ৯ নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এম. খোরশেদের এজলাসে অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত আসগর হোসেনের বিরুদ্ধ দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক অভিযোগ এনে বাদীপক্ষের তরফ থেকে বলা হয় যে, প্রথমতঃ আসামী দখলদার পাক বাহিনী কর্তৃক অনুষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ১৯৭১ সালের উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দখলদার বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয়তঃ আসামী গত ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দিয়ে বলে যে পাক সেনাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করতে হবে এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দান করতে হবে।'

৫ জুলাই, '৭২-এর দৈনিক বাংলার রিপোর্ট থেকেঃ 'গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার দশম স্পেশাল জজ মাহমুদুল্লা একটি দালালী মামলার রায় প্রদান করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের পিডিপি দলের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম চৌধুরীকে দালাল আদেশের চতুর্থ অনুচ্ছেদের 'খ' ধারা মোতাবেক ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাস কারাদণ্ড দান করেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী নুরুল ইসলাম চৌধুরী পাক দখলদার আমলে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম. পি. এ. নির্বাচিত হন। বাদী পক্ষে এ সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে দালাল আদেশ মোতাবেক অভিযোগ আনা হয়।'

৭ জুলাই '৭২-এর দৈনিক বাংলার রিপোর্ট থেকে ঃ 'পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সাথে হত্যাযজ্ঞ, বিনাদোষে আটক প্রভৃতি কাজে সহযোগিতা করার দায়ে কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দালাল আদেশ বলে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ওয়াকিবহাল মহল সুত্রে জানা গেছে যে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর ২১ জন সহকর্মী এখনো আত্মগোপন করে রয়েছেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক আহমদ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়েছিলেন, পাকিস্তানী বাহিনী যদি বাঙালী নারীদের শ্লীলতাহানী করে তবে তাঁদের কোন পাপ হবে না, কারণ তারা ইসলাম রক্ষার জন্য জেহাদে নিয়েজিত।

'তাঁদের জন্য এই কাজ 'মুতা' বিবাহের পর্যায়ে পড়ে। তখন এবং এখনও ইসলামের সেবক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দানকারী দালাল শিক্ষকদের কেউই সেসময় এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেনি।

দালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তিটি হলেন ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জন বাঙালী অধ্যাপক এবং ২ জন বাঙালী অফিসারের একটি তালিকা তৈরি করে সামরিক হেডকোয়ার্টারে দাখিল করেন। এই তালিকায় অধ্যাপকদের ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে চার ধরনের শাস্তি ১। হত্যা ২। কারাদণ্ড ৩। চাকরি থেকে বহিস্কার এবং ৪। ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করার সুপারিশ করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অনেকেই আল-বদর বাহিনীর হাতে নিহত অথবা নির্যাতিত হন।

সাজ্জাদ হোসেন প্রস্তুতকৃত এই তালিকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড তথ্যানুসন্ধান কমিটির হস্তগত হলেও এর কোনো সুষ্ঠ বিচার হয়নি। সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পাবার পর সাজ্জাদ হোসেন সৌদি আরবে চলে যান। এখন তিনি সেখানকার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (দৈনিক আজাদ ৭/২/৭২)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকা প্রস্তুত সমাপ্ত হবার পর প্রাদেশিক গভর্নর টিক্কা খানের নির্দেশে সাজ্জাদ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্বাসিত দালাল শিক্ষকদের মধ্যে আরবি বিভাগের ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলার ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, মনোবিজ্ঞানের ডঃ মীর ফখরুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল বারী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে কয়েকজন দালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের একাত্তরের কার্যকলাপের সামান্য বর্ণনা দেয়া হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ মীর ফখরুজ্জামান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলীর মেয়ে তাঁর বিভাগের ছাত্রী ছিল। সেই সূত্রে রাও ফরামন আলীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ্য সহচর হিসেবে কাজ করেন। ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব নিহত হবার পর ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট হওয়া সত্ত্বেও একই সাথে তাঁকে জগন্নাথ হলেরও প্রভোস্ট করা হয়। তিনি জগন্নাথ হলের নাম পরিবর্তন করে এর মুসলিম নামকরণের প্রস্তাব করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষলগ্নে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রবেশের খবরে আনন্দিত হয়ে তিনি গরু জবাই করে কাঙালিভোজের আয়োজন করেছিলেন। গভর্নর ডাঃ আবদুল মুত্তালিব মালিকের প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থসংগ্রহের জন্য শিক্ষকদের কাছে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলাদেশপন্থী শিক্ষক এবং ফজলুল হক হলের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের নামের তালিকা তিনি জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে সরবরাহ করেছিলেন বলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অভিযোগ ছিল। মনোবিজ্ঞান বিভাগের বাংলদেশমনা যে সমস্ত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁদের টেলিগ্রাম করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এরপর এ সমস্ত শিক্ষকের বাড়িতে আল-বদর বাহিনী হানা দিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে অন্যত্র পালিয়ে যান বলে তাঁর রক্ষা পেয়ে যান (দৈনিক আজাদ ২৯/১/৭২)

গণিত বিভাগের অধ্যাপক এ. এফ. এম আবদুর রহমান আর একজন উল্লেখযোগ্য পূনর্বাসিত স্বাধীনতাবিরোধী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়া থেকেই তিনি এরা বিরোধিতা করে এসেছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে যে ৫৩ জন বুদ্ধিজীবী পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রবিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আবদুর রহমানের নাম প্রথম ছ' জনের মধ্যে ছিল। ৬৯-৭০ সালের গণ অভ্যুত্থানের সময়ও আবদুর রহমান পাক সামরিক জান্তার পক্ষে ছিলেন।

'৭১-এর ২৫ মার্চের পর স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর থেকে 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার যে উদ্যোগ নেয়া হয়, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান ছিলেন তার পুরোধা। তিনি কিছু দালাল শিক্ষককে নিয়ে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে আশ্বাস দেন। রাও ফরামান আলী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন শতকরা ২০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে। ফরমান আলীর এই কথা আবদুর রহমানই সদম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের জানিয়েছিলেন। সে সময়ে পাক সামরিক বাহিনীর গণহত্যার পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেন তাও উল্লেখ করার মত। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যায়। জগন্নাথ হলে পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা সবারই জানা। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, '২৫-এর রাতে জগন্নাথ হল থেকে ছাত্ররা পাকিস্তানী বাহিনীর ওপর রকেট বোমা ছুঁড়েছিল বলেই তারা হল আক্রমণ করেছিল, না হলে করতো না।'

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহভাজনদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিনের হত্যার সাথে জড়িত বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর অন্যান্য দালাল শিক্ষকদের সাথে তাঁকেও ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ ছুটি ভোগরত অবস্থাতেই তিনি ক্লাস নিতে আসেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা এসময় অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাসবর্জন শুরু করে, কিন্তু আবদুর রহমানের পুনর্বাসনকে তাঁরা ঠেকাতে পারেননি। (দৈনিক সংবাদ, ৩০/৩/৭২)

ফার্মেসী বিভাগের প্রফেসর আবদুল জব্বারের বিরুদ্ধেও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপারেশনাল ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁর কক্ষেই দালাল

শিক্ষকদের সাথে রুদ্ধদ্বার আলোচনা করত, পাক সামরিক অফিসাররাও নিয়মিত তাঁর কাছে যাতায়াত করত, তখনকার পত্র পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শহীদ মিনার ছিল তাঁর ভাষায় পুজার বেদী। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। দখলদারী আমলে তাদের কাছে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডকে তিনি 'দুর্ঘটনা' হিসেবে অভিহিত করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তাঁর ভাষায়' 'পাকিস্তানের জারজ সন্তান।' (দৈনিক গণকণ্ঠ, ২০/৪/৭২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও বিভিন্ন কলেজ-স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষকও পাক বাহিনীর দালালীতে তৎপর ছিলেন। তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী এ ধরনের স্বাধীনতাবিরোধী শিক্ষকদের একটি দৃষ্টান্ত হতে পারেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে তিনি ওই কলেজের নৈশ বিভাগের উপাধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন। তিনি ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার সপক্ষীয় শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল জব্বার, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির এ. কিউ. এম. শফিকুল ইসলাম, এবং আবুল কাশেমের সঙ্গে একযোগে তিনি রাও ফরমান আলীর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীনতার পর তোফায়েল আহমদ চৌধুরীকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা একটি সাধারণ সভায় তোফায়েল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দালালীর অভিযোগ এনে তাঁর অপসারণের দাবীতে ক্লাস বর্জন শুরু করে। এতে তোফায়েল আহমদ চৌধুরীর কিছু হয়নি, তবে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তোফায়েল আহমদ চৌধুরী কলেজের স্থানীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। (দৈনিক গণকণ্ঠ, ২৬/৪/৭২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষকদেরকে সে সময় সুকৌশলে ছাত্র জনতার রোষানল থেকে বাঁচানো হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বরের পর দালাল শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করে এদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে ছুটি দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ জেলে ছিলেন। বাদবাকিরা লিখিত দরখাস্ত পাঠিয়ে নিজেদের সুবিধামত সময় পর্যন্ত ছুটি বাড়িয়ে নেন। তারপর উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে সময় সুযোগমত ফিরে আসেন নিজ নিজ কর্মস্থলে।

একশ্রেণীর সাংবাদিকও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ইত্তেফাকের খোন্দকার আবদুল হামিদের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লুকিয়ে থাকা খোন্দকার আবদুল হামিদ গ্রেফতার হবার পর ১১ ফেব্রুয়ারি '৭২ তারিখের পূর্বদেশ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'এ্যালায় কেমুন বুঝতাছেন' শিরোনামের সংবাদটিতে লেখা হয় 'দালাল খোন্দকার আবদুল হামিদকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় নিউ এলিফেন্ট রোড থেকে লালবাগ পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে

প্রচার চালানোর জন্য বিদেশ গমন করেন। এছাড়া তিনি রেডিও পাকিস্তানের ‘ব্রাহ্মণ, ক্ষমা কর’ স্পষ্ট ভাষণের লেখক ছিলেন।’

ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে আল–বদর খুব তাড়াতাড়ি সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থী দল হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর নজরে পড়তে সক্ষম হয়। এছাড়া এদের মুল উদ্দেশ্য এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাকারী সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ায় পাক বাহিনী এদেরকে দিয়ে তাদের নিজস্ব টার্গেট বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করার কাজ করিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেপ্টেম্বরে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা পেশের পরপরই সরাসরি পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ এ উদ্দেশ্যে আল বদরকে সুসংগঠিত করে তুলতে থাকে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে উল্লেখিত নিউ এজ পত্রিকার রিপোর্টটিতে লেখা হয়—‘আল–বদর সংস্থা সম্পর্কে অতি সম্প্রতি কিছু জানা গেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই অস্ত্রসজ্জিত দলটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল জামাতে ইসলামীর দোসর। আল– বদর বাহিনীর সদস্যদের (প্রধানতঃ ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের তরুণরাই—এর অন্তর্ভুক্ত) মাথায় এই কথাটাই ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামী ও ভারতীয় চরদেব দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

‘বিগত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জনপ্রিয় গেরিলা তৎপরতা যখন চরমে পৌছে তখন পাকিস্তানী জেনারেলরা স্থানীয় পুলিশের ওপর ক্রমশঃ আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাক বাহিনীর সেনাপতির ডায়েরিতে লিখিত বক্তব্য থেকে এ কথার ইংগিত পাওয়া যায়––‘পুলিশ বাহিনীকে উঠিয়ে নিতে হবে। আল–বদরকে ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই উত্তম অস্ত্র দিতে হবে।’

এ সময় আল–বদর বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত দলিলটি থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় সহায়তা হতে পারে এই বিবেচনায় দলিলটি সম্পুর্ণ উদ্ধৃত হল। সংগ্রাম পত্রিকার ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সংখ্যায় ‘সম্পাদক সমীপেষু’ কলামে জনৈক আল– বদর কমাণ্ডার–এর লেখা এই পত্রটি নিম্নরূপঃ

জনাব,

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘আল–বদর’ বাহিনীর নাম আজ প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে পৌছে গেছে। গত ২৭ জুন জামালপুর মহকুমায় আল বদর বাহিনী গঠিত হবার পর আজ সমগ্র মোমেনশাহী জেলা ও প্রদেশের আরও দু’একটি জেলায় এর কাজ শুরু হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আল বদর বাহিনী পাকিস্তানবাদী ইসলামপন্থী দেশ প্রেমিক ছাত্রদের দ্বারা গঠিত। ইস্কুলের ১২ বছরের ছেলে থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র রয়েছে।

‘যতদুর জানা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে জামালপুর মহকুমাতেই পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এখানে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় ৪০% থেকে ৫০% ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে। জামালপুর মহকুমার শেরপুর, নলিতা বাড়ি, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও জামালপুর শহরে দুস্কৃতকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।

'জামালপুরের বিভিন্ন জায়গার সীমান্তবর্তী এলাকায় আল বদর বাহিনী সাহসিকতা ও সাফল্যের সাথে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারিদের মোকাবিলা করেছে। আল বদর বাহিনীর তৎপরতা দেখে ভারতীয় অনুচর নাপাক বাহিনীর লোকেরা জামালপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বলে ক্রমাগত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আল বদর বাহিনীর বৈশিষ্ট হল এর প্রতিটি ছেলেই শিক্ষিত এবং নামাজ পড়ে। ধন সম্পদ ও নারীর প্রতি কোন লোভ নেই। বদর বাহিনীর গত তিন মাসের কাজে কোন চরিত্রগত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়নি। এজন্যই জনগণের কাছে বদর বাহিনী দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। মোমেনশাহী জেনাল জনগণের কাছে আশার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় নাম আল-বদর। জামালপুরে রেজাকার, পুলিশ, মুজাহিদ ও রেঞ্জাররা পুল ও বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ জায়গা পাহারা দিচ্ছে আর পাক ফৌজ ও আল-বদর বাহিনী অপারেশন করছে।

'আমি পূর্ব পাকিস্তানের দেশ প্রেমিক ইসলামপন্থী ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাচ্ছি সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়ে দ্রুত প্রদেশের সর্বত্র আল বদর বাহিনী গঠন করতে। বদর বাহিনী ছাড়া শুধূ রেজাকার ও পুলিশ দিয়ে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে রেজাকার, বদর বাহিনী বা মুজাহিদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা সবাইকে মনে করি সমান। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দালালদের শায়েস্তা করতে আজ তাই প্রদেশের সর্বত্র আল বদর বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন।

দেশের বর্তমান এ নাজুক ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে যত তাড়াতাড়ি আল বদর বাহিনী প্রদেশের সর্বত্র গঠন হয় ততই দেশ ও জাতির মংগল। আল্লাহ আমাদের তার পথে কাজ করার তৌফিক দান করুন।. আমিন।

মুহাম্মদ আবদুল বারী

ইনচার্জ, আল বদর ক্যাম্প, ইসলামপুর থানা, মোমেনশাহী ও
প্রচার সম্পাদক, জামালপুর মহকুমা শান্তি কমিটি।

স্বাধীনতার পর আব্দুর বারীর ব্যক্তিগত ডায়েরিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ১০ মার্চ ১৯৭২ দৈনিক ইত্তেফাকে মুদ্রিত ডায়েরির প্রধান প্রধান বিবরণগুলো হচ্ছেঃ

টাংগাইল-এ Successful operation হয়েছে। হাজার দেড়েকের মত মুক্তিফৌজ মারা পড়েছে আল বদর ও আর্মিদের হাতে।

1. Haider Ali 2. Nazmul Haque. Rs. 25000.00

তিতপল্লার শিমকুড়া গ্রাম—জব্বারের কাছ থেকে ২৯/১০/৭১ (তারিখে) আর তিন হাজার নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।...

'26-10-71... Prostitution Quarter'

'24-10-71, Raping Case .. Hindu Girl'

ডায়েরির এই পৃষ্ঠায় ছাপ মারা সিলে লেখা ছিল দি ডেইলী প্রগ্রেস অব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ, জামালপুর ইউনিট, তারিখ ২৬-৯-৭১।'

সম্পাদক সমীপে আব্দুল বারীর বক্তব্য এবং তার ডায়েরির বিষয়বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্য (বেশ্যাগমন, লুন্ঠন ও হিন্দু মেয়ে ধর্ষণ) ইসলামের ধ্বজাধারী দালালদের তৎকালীন এবং বর্তমান মিথ্যাচারের স্বরূপ প্রকাশে উপযোগী বিবেচিত হতে পারে।

ইতিমধ্যে ২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এই পরিষদের বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চীফ একজিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) আশরাফুজ্জামানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আল বদর কমান্ডাররা অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য শামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিলঃ ১. মোস্তফা শওকত ইমরান ২. নুর মোহাম্মদ মল্লিক ৩. এ কে মোহাম্মদ আলী ৪। আবু মোঃ জাহাঙ্গীর ৫. আশরাফুজ্জামান ৬. আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস ৭. সর্দার আবদুস সালাম।

নভেম্বরের প্রথম থেকেই আল বদর নেতারা প্রকাশ্যে বুদ্ধিজীবীদের হুঁশিয়ারী দিতে থাকে। ৭ নভেম্বর সারাদেশে মহা ঘটা করে পালন করা হয় আল বদর দিবস। এই উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র সংঘ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। নাখালপাড়া আদর্শ শিক্ষায়তনে তেজগাঁও থানা জামায়াতে ইসলামী প্রধান মাহবুবুর রহমান গুরহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল খালেক বলেন, 'পাকিস্তানে অনৈসলামী মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তির সর্বতোমুখী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের জীবনকে বাতেল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুর্তমান প্রতীক হিসেবে কাজ করে যেতে হবে। এ জন্য আল বদর বাহিনীর মত পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য ভুলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে হবে। (দৈনিক সংগ্রাম ৮/১১/৭১)। আল বদর দিবসে ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মসূচীর বর্ণনা দিয়ে ৮ নভেম্বরের দৈনিক সংগ্রামে লেখা হয়—আল বদর দিবসে প্রদেশের জিন্দাদিল তরুণ সমাজের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়েছে তা অভুতপূর্ব। তারা এক বাক্যে ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর মানচিত্রে মানবতার দুশমন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্থানের অস্তিত্ব মুছে না যাওয়া পর্যন্ত আল বদরের অনুপ্রেরণা নিয়েই আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাব।

আল–বদর দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল রোববার ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক বিরাট ছাত্র গণমিছিল বের করা হয়। পবিত্র রমজানের মধ্যে গতকালই প্রথম আল বদরের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত মিছিলকারীদের পদভারে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। মিছিলকারী জিন্দাদিল তরুণের–'বীর মোজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারত ভুমি দখল কর' 'দুনিয়ার মুসলমান এক হও' 'ভারতীয় দালালদের খতম কর' 'হাতে লও মেশিনগান দখল কর হিন্দুস্থান' হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে এক হও 'ইসলামের সমাজ কায়েম কর'

'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে' প্রভৃতি শ্লোগানে রাজধানীর রাজপথ মুখরিত করে তোলে।

'পূর্বাহ্নে বায়তুল মোকাররম প্রাংগনে, এক বিরাট গণ–সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

'ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সংঘের পূর্ব পাক সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী বক্তৃতা করেন।

'আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে বলেন, 'এদেশের তৌহিদবাদী মানুষ মানবতার দুশমন, শান্তির দুশমন, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্থানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। দুনিয়ার মানচিত্র থেকে হিন্দুস্থানের অস্তিত্বকে মুছে ফেলা না পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের বিরাম নেই।

'পূর্ব পাক ইসলামী ছাত্র সংঘ প্রধান ভারতীয় দালালদের বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় দালালরা পাকিস্তানবাদী স্বেচ্ছাসেবীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাচ্ছে। এদের মুখ আমরা চিনি। তিনি জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

'তিনি বলেন, পাকিস্তান শুধু এখানকার মুসলমানদের জন্যই গঠিত হয়নি। পাকিস্তান বিশ্ব মুসলিমের আশ্রয়স্থল। দুনিয়ার মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তানকেই বায়তুল মুকাদ্দস উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম দিল্লীর বুকেই বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন করতে হবে।

পূর্ব পাক ইসলামী ছাত্রসংঘের নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, পাকিস্তানীরা কোন অবস্থায়ই হিন্দুদের গোলামী বরণ করতে প্রস্তুত নয়। তিনি বলেন, আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও দেশের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখবো। সমাবেশ শেষে এক জংগী মিছিল বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে সমাপ্ত হয়।'

এ সময় সম্ভবত বুদ্ধিজীবী হত্যা চক্রান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। ৭ নভেম্বর তারিখেই প্রাদেশিক ছাত্র সংঘ প্রধান আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সংঘের প্রাদেশিক কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন। এরা হল—মুহম্মদ শামসুল হক (ঢাকা শহর), আবদুল হাই ফারুকী (রাজশাহী জেলা), সরদার আবদুস সালাম (ঢাকা জেলা), মোস্তফা শওকত ইমরান (ঢাকা শহর), মতিউর রহমান খান (খুলনা), মীর কাশেম আলী (চট্টগ্রাম), আব্দুল জাহের মুহম্মদ আবু নাসের (চট্টগ্রাম), আশরাফ হোসেন (মোমেনশাহী)। দু'জন মনোনীত সদস্য ছিল এ. কে. মুহম্মদ আলী (ঢাকা শহর) এবং মাজহারুল ইসলাম (রাজশাহী জেলা)।

বিভিন্ন জেলা সদরে নিযুক্তিপ্রাপ্ত এই নেতারা ছিল স্ব–স্ব জেলার আল বদর প্রধান। বিভিন্ন বিভাগে বুদ্ধিজীবী অপহরণের কার্যক্রম এরাই পরিচালনা করেছিল। ঢাকা শহরে আল বদর প্রধান জল্লাদ আশরাফুজ্জামান খানের

উদ্ধারকৃত ডায়েরিতে মুহম্মদ শামসুল হক ও শওকত ইমরানের নাম লিখিত হয়েছিল শহর আল বদর প্রধান হিসেবে। এই ডায়েরিতেই লিখিত ছিল নিহত বুদ্ধিজীবীদের নাম ঠিকানা।

১৪ নভেম্বর তারিখে সংগ্রাম পত্রিকায় আল বদর সর্বাধিনায়ক (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক) মতিউর রহমান নিজামী 'বদর দিবস, পাকিস্তান ও আল বদর' শীর্ষক এক উপসম্পাদকীয়তে লেখেন, 'বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলা ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সুচনা করেছে। সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশী।...........

'হিন্দু বাহিনীর সংখ্যা শক্তি আমাদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশী। তাছাড়া আধুনিক সমরাস্ত্রেও তারা পাকিস্তানের চেয়ে অধিক সুসজ্জিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানে কিছু মুনাফিক তাদের পক্ষ অবলম্বন করে ভেতর থেকে আমাদেরকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের মুকাবিলা করেই– তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করেই পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে, শুধু পাকিস্তান রক্ষার আত্ম রক্ষামুলক প্রচেষ্টা।......

বদরের যুদ্ধ থেকে অনেক কিছুই আমাদের শিখার আছে। এই যুদ্ধের সৈনিকরা কেউ পেশাদার বা বেতনভুক্ত সৈনিক ছিলেন না। মুসলমানরা সবাই ছিলেন সৈনিক, তারা সবাই ছিলেন স্বতঃস্ফুর্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ঈমানের তাগিদেই তারা লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন বিরাট শক্তির মুকাবিলায়। বৈষয়িক কোন স্বার্থই ছিল না তাদের সামনে। মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী–এই ছিল তাদের বিশ্বাসের অংগ। ঈমানের পরীক্ষায় তারা ছিলেন উত্তীর্ণ। সংখ্যায় চেয়ে গুণের প্রাধান্য ছিল সেখানে লক্ষ্যণীয়। পারস্পারিক দ্বন্দ্ব কলহের লেশমাত্র ছিল না তাদের মাঝে। এক রসুলের নেতৃত্বে তারা সবাই ছিলেন সীসা ঢাকা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছিল তাদের সম্বল। আর আল্লাহর সন্তোষ ছিল তাদের কাম্য। আজকের কাফেরদের পর্যুদস্ত করতে হলে আমাদের মধ্যেও অনুরূপ গুণাবলীর সমাবেশ অবশ্যই ঘটাতে হবে।

'আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্রসমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তারাও তিন শত তের জন যুবরকে সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদরযোদ্ধাদের যেই সব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল বদরের তরুণ মধ্যে মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাল্লাহ সেই সব গুণাবলী আমরা দেখতে পাব।

পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আল বদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার

মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস, সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আল বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।'

২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর- পরই প্রাদেশিক ছাত্রসংঘ সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমিক যুবকদের প্রতি আহ্বান জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ২৪/১১/৭১)। এ সময় থেকেই দেশের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয়ে যায়। ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কাছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার জন্য হুঁশিয়ারী দেয়া আল বদরদের চিঠিও এ সময় এসে পৌঁছতে থাকে। এই চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ:

শয়তান নির্মূল অভিযান

শয়তান,

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের যে সব পাচাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের দালাল নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তর আবাসভুমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনটাই আমাদের অজানা নেই। অবিলম্বে হুশিয়ার হও এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিস্তার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মুল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

—শনি

এ সময়ই পাক বাহিনী আল বদরদের কেন্দ্রীয় কমাণ্ডারদের বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের ব্যাপারে চুড়ান্ত 'ব্রিফিং' করে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড তথ্যানুসন্ধান কমিটির অস্থায়ী দপ্তর ঢাকা প্রেসক্লাবে পাকবাহিনীর সাথে আল বদরদের যোগাযোগের বহু দলিল সংগৃহীত হয়। একটি দলিল ছিল ১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখে ঢাকার আল বদর ক্যাম্পের নামে ইস্যু করা একদিনের নির্দেশ। এই দলিল থেকে বোঝা গিয়েছিল এ সময় পাক সেনাবাহিনী এই ক্যাম্পকে হত্যার উপকরণ, যানবাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। পাক সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই খুনীদেরকে হত্যাকর্মে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এতে কোন এক ক্যাম্পে ক্লাস অনুষ্ঠানের সময়সূচীও দেখা গিয়েছিল। এ সমস্ত মস্তিস্ক ধোলাই ক্লাসের সমস্ত লেকচারই উপ- আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সেনা অফিসাররা দিতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

২ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপ-ইউনিটগুলো পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং আটক, নিপীড়ন ও হত্যা প্রভৃতি কাজে আলাদা আলাদা ইউনিট সমূহকে নিযুক্ত করা হয়।

আল বদর বাহিনীর হত্যাকারীদেরও এ সময় বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করে বিভিন্ন এলাকায় অপহরণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। অপহরণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীর বাড়িতে হানা দিতে হবে তার আলাদা আলাদা লিস্ট এদের হাতে দেয়া হয়।

৪ ডিসেম্বর শুরু হয় বুদ্ধিজীবী অপহরণের উদ্দেশ্যে আরোপিত সেই কার্ফ্যু এবং ব্ল্যাক আউট। এদিন থেকে ঢাকা শহরে আল বদর বাহিনী গণসংযোগ অভিযান শুরু করে। আল বদর ব্যানারশোভিত জীপে মাইক লাগিয়ে আল বদররা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী ভারত ধ্বংস হোক, হাতে লও মেশিনগান–ধ্বংস কর হিন্দুস্তান, দাঁত ভেঙ্গে দাও, দাঁত ভঙ্গে দাও হানাদার হিন্দুদের, ব্রাহ্মণ্যবাদের দালালেরা, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার, সাবধান, ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়। পুরনো ঢাকার নবাবপুর, সদরঘাট, চকবাজার, নাজিরাবাজার, বংশাল এবং নতুন শহরের নিউ মার্কেট, সেকেণ্ড ক্যাপিটাল, মোহাম্মদপুর প্রভৃতি এলাকায় তারা পথসভার আয়োজন করে। এ সমস্ত সভায় ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ—বুদ্ধিজীবীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে আল বদরদের প্রস্তুত থাকতে বলে।

এ উপলক্ষে ছাত্র সংঘের পূর্ব পাক সভাপতি আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে 'হানাদার হিন্দুস্তানী বাহিনীর আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দেবার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে মোবারকবাদ' জানিয়ে বলেন, 'এবারও হিন্দুস্তান তস্করের ন্যায় পাকিস্তানের উপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে। ইতিমধ্যেই হিন্দুস্তানের সাথে আমাদের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাতে আমরা আল্লাহর রহমতে সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলছি।

'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গনের সাম্রাজ্যবাদ হিন্দুস্তানী হামলাকে সাফল্যজনকভাবে প্রতিহত করার জন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সাথে সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকেও জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

'হিন্দুস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে এসে হিন্দুস্তান নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের গতকালের বেতার ভাষণকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরাও ঘোষণা করছি যে, এদেশের ছাত্র জনতা '৬৫ সালের মতন এবারও ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে যাবে।

'আমাদের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য যে, মুসলমান কোন দিন পরাজয় বরণ করেনি। এবারও ইনশাল্লাহ আমরা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের বুকে ইসলামের বিজয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাব।'

'পরিশেষে এদেশের ১২ কোটি তৌহিদী জনতাকে বলি কোরআনের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে হাতে সমরাস্ত্র নিয়ে সৈনিকের ভূমিকা পালন করে দুশমন হিন্দুস্তানের উপর মরণ আঘাত হানুন।'

ডিসেম্বরের প্রথম দশদিন এভাবে বুদ্ধিজীবী নিধনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

সেই অতি নৃশংস হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য আল বদররা ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করা শুরু করে ১০ ডিসেম্বর থেকে। কার্ফ্যু এবং ব্ল্যাক আউটের মধ্যে জীপে করে আল বদররা দিন রাত বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদেরকে প্রথমে সারা গায়ে কাদামাখানো একটি বাসে তোলে। এরপর বাস বোঝাই বুদ্ধিজীবীসহ নানা স্তরের বন্দীকে প্রথমে মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের আল বদর হেড কোয়ার্টারে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করা অনেক বন্দীকে কাকরাইল মসজিদ, ধানমন্ডি হাই স্কুল এবং এম এল এ হোস্টেলের আল-বদর নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আল-বদরদের এই অপহরণ স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিত হয় কোনো আল বদর কমাণ্ডার নতুবা পাকবাহিনীর অনধিক ক্যাপ্টেন মর্যাদার কোন অফিসার। সম্ভবত পাক বাহিনীর নিজস্ব টার্গেট বুদ্ধিজীবীদের অপহরণের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যই পাক সেনা অফিসার অপহরণ স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিত।

অপহরণের সময় বুদ্ধিজীবীদের যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, আল বদররা তাঁদেরকে সে অবস্থায়ই ধরে নিয়ে যায়। কাউকে গভীর রাতে ঘুম থেকে তুলে, কাউকে বা দুপুরবেলায় খাবার টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লুঙ্গি, গেঞ্জি, যিনি যে পোশাক পরেছিলেন, সেই পোশাকেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। অপহরণের পরপরই গামছা বা পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে প্রত্যেকের হাত পেছন দিকে শক্ত করে বাঁধা হয়।

আল বদর হেডকোয়ার্টারে রেখে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গভীর রাতে বাস ভর্তি করে বুদ্ধিজীবীদেরকে রায়েরবাজার ইটখোলায় নিয়ে গিয়ে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে।

সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার প্রধান আসামী এ বি এম খালেক মজুমদার ১৯৭১ সালে ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামীর দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। ইতিমধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সারের আল বদর বাহিনীর শিকারে পরিণত হবার খবর জানার পর স্থানীয় কায়েতটুলি মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন শহীদুল্লাহ কায়সারের বাড়িতে গিয়ে জানান, স্থানীয় খালেক মজুমদার কয়েক দিন আগে তাঁর কাছে শহীদুল্লাহ কায়সারের ঠিকানা এবং তিনি রাত্রে কোথায় থাকেন জানতে চেয়েছিলেন। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ছোট কাটরার গেরিলা বাহিনী খালেককে রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্রের

কাছাকাছি একটি গোপন আড্ডা থেকে গ্রেফতার করে। খালেককে আটক করার পর ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে সনাক্ত করেন।

গ্রেফতারের সময় খালেকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১টি পিস্তল, ৪০ রাউণ্ড গুলি, বদর বাহিনীর ট্রেনিংসংক্রান্ত কাগজ, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ব্যাপারে জামায়াতের সর্বশেষ সার্কুলার, সামরিক ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ অনেকগুলো ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যায়। এছাড়া তার ডায়েরির পাতায় কার্ফ্যু জারি করা সংক্রান্ত একটি স্বাক্ষরবিহীন নোটিশ, অপর পাতায় মীরপুর, মোহাম্মদপুর থানার ব্রিগেডিয়ার রাজা, রমনা থানার ব্রিগেডিয়ার আসলাম, তেজগাঁ থানার বিগ্রেডিয়ার শরীফ, সুত্রাপুর থানার ব্রিগেডিয়ার বশির এবং ধানমণ্ডি থানার ব্রিগেডিয়ার শফীর নাম পাওয়া যায়। এই সামরিক অফিসাররা বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যার সাথে জড়িত ছিল।

গ্রেফতারের পর খালেক মজুমদারের স্বাক্ষরকৃত ও পেশকৃত এক বিবৃতিতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আরও ৯ জনের নাম পাওয়া গিয়েছিল, এদের অনেকেই সুপরিচিত হওয়ায় সংবাদপত্রগুলো সঙ্গত কারণেই এদের নাম প্রকাশে বিরত থাকে।

এছাড়া খালেকের উদ্ধারকৃত বিভিন্ন কাগজপত্রে আরও দেখা যায় যে, তার সাথে এবং জামায়াতের অন্যান্য নেতার সাথে টেলিফোনে বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। উল্লেখ্য, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য তুলে নিয়ে যাবার সময় তাদের সবার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছিল।

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার রায় থেকে জানা যায় যে, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পরপরই কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউটের মধ্যে এ বি এম খালেক মজুমদার আরও ছ'সাত জন আল-বদরকে নিয়ে দরজা ভেঙ্গে শহীদুল্লাহ কায়সারের বাড়িতে ঢোকে। তাদের পরনে ছিল ছাই রঙ্গের পোশাক, সাদা কাপড়ে মুখ বাঁধা ছিল। হাতে ছিল রিভলবার, রাইফেল এবং স্টেনগান। দলের তিনজন লোক দোতলা থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার এবং জাকারিয়া হাবিবকে ধরে নিয়ে আসে। এ সময় শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার, ছোট বোন শাহানা বেগম, ভগ্নিপতি নাসির আহমেদসহ উপস্থিত সবাই তাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য চিৎকার করে অনুনয় করতে থাকে। এক পর্যায়ে খালেক মুজমদার ও তার সঙ্গীরা জাকারিয়া হাবিবকে ছেড়ে দিয়ে শহীদুল্লাহ কায়সারকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে তার স্ত্রী এবং আত্মীয়রা আল বদরদের বাধা দেন। তখন খালেক মজুমদার ও তার সঙ্গীরা স্টেনগানের বাঁট দিয়ে ভয়ার্ত আত্মীয়স্বজনকে পিটিয়ে তাঁদেরকে পথ থেকে সরিয়ে শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে চলে যায়।

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলায় খালেক মজুমদারের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। বিচারক স্পেশাল জজ এফ. রহমান আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করে বলেন, 'আসামী হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছে।' অথচ শাস্তি হিসেবে তাকে মাত্র সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিন এখন লণ্ডনে। একাত্তরে জামায়তে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মঈনুদ্দিন এখন লণ্ডনে জামায়াত নিয়ন্ত্রিত 'সাপ্তাহিক দাওয়াত' পত্রিকার বিশেষ সম্পাদক। সাংগঠনিক কাজে তিনি প্রায়ই বাংলাদেশ সফর করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিকে চৌধুরী মঈনুদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন ঘাতককে দৈনিক পূর্বদেশে স্টাফ রিপোর্টারের চাকরি দিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনার অন্যতম কেন্দ্র অবজার্ভার ভবনে নিয়ে আসা হয়। এখান থেকে চৌধুরী মঈনুদ্দিন 'ইনটেলেকচুয়াল অপারেশন' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ, নির্যাতন এরং হত্যায় নিয়োজিত আল বদরদের পরিচালনা করেন। এ ছাড়া বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার বশির আহমদ প্রমুখের কাছে বুদ্ধিজীবীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে দেয়াও ছিল তার দায়িত্ব।

সৌদি আরবে পুনর্বাসিত আল বদরদের দৃষ্টান্ত দেবার জন্য এখানে উপস্থাপন করা হবে আল বদর হাই কমাণ্ডের সদস্য আশরাফুজ্জামানের কথা। এই আশরাফুজ্জামান খান ছিল বদর বাহিনীর প্রধান ঘাতক। স্বহস্তে গুলি করে সে মীরপুর গোরস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষককে হত্যা করে বলে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

যে গাড়ীতে করে হতভাগ্য অধ্যাপকদের গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার চালক মফিজুদ্দিন নামে জনৈক আল বদর আশরাফুজ্জামানকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের 'চীফ এক্সিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) হিসেবে উল্লেখ করেছিল।

১৬ ডিসেম্বরের পর ৩৫০ নাখালপাড়ায় আশরাফুজ্জামান যে বাড়িতে থাকত, সেখান থেকে তার ব্যক্তিগত ডায়েরিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ডায়েরির দু'টি পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডাঃ গোলাম মর্তুজার নাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারের কত নম্বর বাড়িতে তাঁরা থাকেন তা লেখা ছিল। এই ২০ জনের মধ্যে মোট ৮ জন ১৪ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন। এঁরা হচ্ছেন মুনীর চৌধুরী (বাংলা), ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (ইতিহাস), রাশিদুল হাসান (ইংরেজি), ডঃ ফয়জুল মহী (শিক্ষা গবেষণা) এবং ডাঃ মুর্তজা (চিকিৎসক।)।

ড্রাইভার মফিজুদ্দিনের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, আশরাফুজ্জামান খান এঁদের নিজ হাতে গুলি করে মেরেছিল। মফিজুদ্দিনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়েরবাজারের বিল এবং মীরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমি থেকে অধ্যাপকদের গলিত বিকৃত মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ডায়েরিতে উল্লেখিত অবশিষ্ট অধ্যাপকদেরও আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ডায়েরিতে এ ছাড়াও যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হচ্ছেন—ওয়াকিল আহমদ (বাংলা), ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম (বাংলা), ডঃ লতিফ (শিক্ষা গবেষণা), ডঃ মনিরুজ্জামান (ভুগোল), ডঃ কে. এম. সাদউদ্দিন (সমাজ বিজ্ঞান), এ. এম. এম. শহীদুল্লাহ (গণিত), ডঃ সিরাজুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ডঃ আখতার আহমদ (শিক্ষা),

জহিরুল হক (মনোবিজ্ঞান), আহসানুল হক (ইংরেজি), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজি) এবং কবীর চৌধুরী।

ডায়েরির আরেকটি পৃষ্ঠায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলজন দালাল অধ্যাপকের নাম। এ ছাড়াও ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরি মঈনুদ্দিন, আল বদর কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের সদস্য শওকত ইমরান ও ঢাকার বদর বাহিনীর প্রধান শামসুল হকের নাম।

ডায়েরিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী ছাড়াও বহু বাঙালীর নাম ঠিকানা লেখা ছিল। এঁদের সবাই বদর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এক টুকরো কাগজে তৎকালীন পাকিস্তান জুট বোর্ডের ফাইন্যান্স মেম্বার আবদুল খালেকের নাম, পিতার নাম, ঢাকার ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা লেখা ছিল। '৭১-এর ৯ ডিসেম্বর আবদুল খালেককে বদর বাহিনী অফিস থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার মুক্তিপণ হিসেবে বদর বাহিনী ১০ হাজার টাকা দাবি করেছিল। আবদুল খালেকের কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা দিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখিয়ে নিয়ে বদর বাহিনী তাঁর বাড়িতে যায়। আবদুল খালেকের স্ত্রী সে সময় মাত্র ৪৮০ টাকা দিতে পেরেছিলেন। বাকি টাকা তিনি পরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বদর বাহিনীর লোকদের কাছে আব্দুল খালেককে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল খালেক আর ফিরে আসেননি।

আশরাফুজ্জামান কয়েকজন সাংবাদিক হত্যার সাথেও জড়িত ছিল। দৈনিক পূর্বদেশের শিফট ইনচার্জ ও সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফাকেও আশরাফুজ্জামান ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

আশরাফুজ্জামান খান ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। স্বাধীনতার পর সে পাকিস্তানে যায়। বর্তমানে এই ঘাতক রেডিও পাকিস্তানে কর্মরত রয়েছে।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে কোন কোন বিদেশী শক্তি জড়িত ছিল, যথাযথ গবেষণা ছাড়া সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে যাওয়া যুক্তিসংগত নয়, তবে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেবার জন্য দু'-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে প্রথম দলিলটি হচ্ছে '৭২-এর জানুয়ারিতে ভারতের সাপ্তাহিক 'দি নিউ এইজ' পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন। এর অংশবিশেষের বাংলা তরজমা নিম্নরূপঃ

'গণহত্যা তদন্ত কমিটির সভাপতি চলচ্চিত্র প্রযোজক জনাব জহির রায়হান আমাদেরকে জানিয়েছেনঃ 'আল বদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা একই সাথে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইদের দেহের অবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে, দখলদার পাকিস্তানী শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সশস্ত্র গোঁড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি

চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যাঁরা হয়েছেন তাঁরা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

'আল বদর বাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছে সব লেখক ও অধ্যাপকই এক রকম ছিলেন। জহির রায়হান বলছিলেন, এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদের বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে, আল বদরের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকর করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনীদের পেছনে ছিল?

'সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়, শ্রেষ্ঠ বাঙালী সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণ্ডাদেরকে আল বদর বাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত।

'পূর্ব উল্লেখিত পাকিস্তানী জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়েরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় দু'জন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হেইট (Haight) ও ডুসপিক (Dwespic) এদের নামের পাশে লেখা ছোট ছোট অক্ষরে ইউ এস এ (U.S.A.) ও ডি. জি.আই এস (D.G.I. S.)।

অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে—'রাজনৈতিক ৬০-৬২—৭০। অপর এক জায়গায় লেখা আছে—এ দু'জন আমেরিকান পি আই এর একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।

'হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ১৯৪৬—৪৯ সাল পর্যন্ত সৈন্য বাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সি আই এ এজেন্ট ডুসপিকের সাথে গত বছর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সাথে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।

'নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল বদর বাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

স্বভাবতইই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি আই এ চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল বদর বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক এক নায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার জামায়াতে

ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচার পত্রের ভাষা হলঃ 'বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধু দেশ।'

উল্লেখ্য, রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতে যে দু'জন সি আই এ এজেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছিল তারা ইন্দোনেশিয়াতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল এবং ইন্দোনেশীয় সরকার সেজন্য তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারও করেছিল।

২৮ মার্চ ১৯৭২ তারিখে প্রচারিত পুলিশ ডাইরেক্টরেটের একটি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, 'বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ৪২টি মামলা রুজু করা হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজির অধীনে গোয়েন্দা অফিসারদের একটি দল এই মামলা পরিচালনা করছে। আসামী হিসেবে এ পর্যন্ত ৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, এই মামলাগুলোর বেশির ভাগই ছিল সাজানো মামলা। এ বি এম খালেক মজুমদারসহ বদর বাহিনীর যে কয়েকজন নেতার বিচার করা হয়, অপরাধ সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের লঘুদণ্ড দেয়া হয়।

সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হবার পর, বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। জহির রায়হানের সভাপতিত্বে এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন: এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েতুল্লাহ খান, সৈয়দ হাসান ইমাম এবং ডঃ সিরাজুল ইসলাম। এই কমিটি, বিশেষতঃ এর আহবায়ক জহির রায়হান বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল রহস্য উদঘাটনে অনেক দূর এগিয়ে যান।

৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়া হয়। কমিটি ইতিমধ্যে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছিল, কোলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক তা ভারতে নিয়ে চলে যান।

২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রের এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাইস বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবী হত্যার ষড়যন্ত্রে পাক বাহিনী যে জড়িত ছিল, তার প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল, তখন স্টোনহাউস ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মিঃ স্টোনহাউস বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার দশজন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী

হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান।

এই দশজন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনই আমাদের হস্তগত হয়নি। এদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ সরাসরিভাবে পরিচালনাকারি দুই অফিসার জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ২০ ডিসেম্বর একটি বিশেষ বিমানে কোলকাতা নিয়ে যাওয়ার পর কড়া সামরিক প্রহরায় কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিসারকেও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে '৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারিরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারিরা বঙ্গভবনের ফটক অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারিদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতিপূর্বে ৮ই ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের পরিবারের সদস্যদেরও তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভিতরে তাঁকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেননি।

একটি প্রতিনিধি দল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে সামরিক আইন প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়। টিক্কা খান এই প্রতিনিধিদলের সহযোগিতার প্রস্তাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'দুস্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের আশ্রয় না দেওয়া এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌছে দেওয়ার জন্য উপদেশ দেন। সাক্ষাৎকারে টিক্কা খান তাদেরকে 'শুধূ বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় ফলপ্রসূ কাজ করতে নির্দেশ দেন।' বৈঠকশেষে নেতৃবৃন্দ রেডিওতে ভাষণ দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার প্রতিজ্ঞা করেন।

এই সময়ে শান্তি কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা উপস্থিত হয়। টিক্কা খান চেয়েছিলেন প্রদেশের পরস্পরবিরোধী উগ্র ডানপন্থী দলগুলো একই প্লাটফর্মে থেকে সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে সহায়তা করবে। কিন্তু সর্বাধিক সংগঠিত এবং চরমপন্থী জামায়াতে ইসলামী দলের সাথে অন্যান্য মুখ্য দল মুসলিম লীগ (কাউন্সিল, কাইয়ুমপন্থী ও কনভেনশনসহ সকল গ্রুপ), পিডিপি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের নেতৃত্বের কোন্দল দেখা দেয়। বিশেষত উচ্চশিক্ষিত ও অতি উচ্চাভিলাষী মৌলভী ফরিদ আহমদ ও নুরুজ্জামানের

নেতৃত্বাধীন একটি দল জামায়াতের নেতৃত্বে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে ৬ এপ্রিল তারিখেই গোলাম আজম পুনরায় একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে টিক্কা খানের সাথে দেখা করেন।

এই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী। পরস্পরবিরোধী দলগুলোর মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টির জন্য একজন মুরুব্বিস্থানীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, হামিদুল হক চৌধুরী সেই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন।

হামিদুল হক চৌধুরীর মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে দালালদের অন্তর্কলহের অবসান হয় এবং সম্মিলিতভাবে নাগরিক শান্তি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৯ এপ্রিল টিক্কা খান ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীর কাছে প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরই ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি আত্মপ্রকাশ করে। সংবাদপত্রে শান্তি কমিটি গঠনের খরব প্রকাশিত হয় '৭১-এর ১০ এপ্রিলের পরিবর্তে ১১ এপ্রিল। খাজা খয়েরউদ্দিনকে আহবায়ক করে গঠিত ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে শহরের সব শান্তি কমিটিগুলো কাজ করবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়, কমিটিকে আরও সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৪ এপ্রিল বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত একটি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শান্তি কমিটি গঠিত হবার পরপরই এতে নেতৃত্বের কোন্দল উপস্থিত হয়, যার ফলে পরদিন ১০ তারিখেই বিরোধী অংশটি মৌলভী ফরিদ আহমদকে সভাপতি করে নয় সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে মুল শান্তি কমিটি থেকে বেরিয়ে যায়। প্রাক্তন প্রাদেশিক পিপিপি প্রধান নুরুজ্জামানকে এই স্টিয়ারিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির ১০ এপ্রিলের সভায় যারা কার্যকরি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁরা হচ্ছেন কোরবান আলী বার-এট-ল ওয়াজিউল্লাহ, আজিজুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী, এ. কে. নুরুল করিম এবং নব নির্বাচিত এম. পি. এ. মাহমুদ আলী সরকার।

স্টিয়ারিং কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই কমিটি পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল গঠন করে প্রতিটি জেলায় এর শাখা প্রতিষ্ঠা করবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার শান্তিরক্ষা, জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, ভারতীয় বেতারের মিথ্যা প্রচারণার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারিদের কার্যকরিভাবে মোকাবিলার নিমিত্তে জনগণকে প্রস্তুত করতে এই কাউন্সিল কাজ করবে।

গণহত্যাকারি পাক সেনাবাহিনীর সাথে শান্তি কমিটির যোগাযোগ কত উচ্চ পর্যায়ে সুবিস্তৃত ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে। ২৫ জুন ১৯৭১ তারিখের 'আজাদ' পত্রিকায় হেডলাইনে মোটা হরফে লেখা সংবাদটি ছিল এরকমঃ 'অদ্য পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল সফরকালে সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খানকে বিভিন্ন শান্তি কমিটি কর্তৃক

সম্পাদিত বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ এবং বেসামরিক জনতা ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার সৌহার্দ্যের কথা জানানো হয়। জেনারেল হামিদ অদ্য সকালে পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও জিওসিসহ যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, এবং ফরিদপুর সফর করিয়া পূর্বাহ্নে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। জেনারেল হামিদকে জানান হয়, এই অঞ্চলের দেশদরদী জনগণ দেশ হইতে রাষ্ট্রদ্রোহীদের উচ্ছেদে কর্তৃপক্ষককে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিতেছে। এই সমস্ত রাষ্ট্রদ্রোহীর মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিপ্রিয় লোকালয়ে আত্মগোপন করিলে স্থানীয় জনসাধারণ তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তি প্রদান করে। ইহাদের শাস্তি প্রদানের জন্য দেশে বহু রাজাকার বাহিনী গঠিত হইয়াছে।'

যে ১৪০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল' তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ। এই ১৪০ জনের মধ্যে চার থেকে পাঁচ জন বিদেশে রাজনীতি করছেন, দশ বারজনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এবং বাদবাকি সবাই আজ বাংলাদেশে রাজনীতি বা অন্য ক্ষেত্রে উচ্চপদে আসীন। এদের প্রত্যেকের পরিচয় স্বল্প পরিসর এই গ্রন্থে প্রদান করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মূল কাজ ছিল স্বাধীনতামনা বাঙালীদের হত্যার তালিকা প্রস্তুত ও তাদের হত্যা করার কাজে পাক সেনাবাহিনীকে সহায়তা প্রদান এবং রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি বাহিনীকে নিয়োজিত করা। একাত্তরে এদের বক্তৃতা-বিবৃতির আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারলেই এদের প্রকৃত অপরাধ অনুধাবন করা যাবে। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, আব্দুল হামিদ খান, টিক্কা খান বা আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী নিজের হাতে বাঙালী হত্যা না করলেও তারা গণহত্যার অপরাধে অপরাধী। একই অপরাধে অপরাধী শান্তি কমিটির প্রত্যেকটি সদস্য—কারণ, এই কমিটির পরিকল্পনা ও নির্দেশেই রাজাকার, আল বদর, আল শামস ইত্যাদির তৎপরতা পরিচালিত হত।

আজকের জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন অংশ, খেলাফত আন্দোলন, আইডিএল, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই একাত্তরের মুখ্য দালাল। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি, বিএনপির বিভিন্ন অংশ এবং ডানপন্থী অন্যান্য দলেও ঘটেছে কুখ্যাত দালালদের সমাবেশ।

বাংলার বুদ্ধিজীবীদের বিনাশ করতে কুখ্যাত পাক সামরিক চক্র ও তাদের অনুগ্রহলোভী সহযোগিরা যে ব্যাপক চক্রান্তে লিপ্ত হয় তার অন্যতম নিদর্শন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্যাতন। ২৫ শে মার্চ রাত্রির নির্বিচারে হত্যা থেকে শুরু করে কয়েক পর্যায়ে এই নির্যাতন সংঘটিত হয় এবং ক্রমেই তা এক সুসংহত রূপ লাভ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন চিন্তার অনুসারী ও খুনি সরকারের তোষামোদ বিরোধী প্রতিটি শিক্ষক তাদের রোষানলে পতিত হয়, ও

শেষ আঘাতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের সবাইকে হত্যা করার এক পরিকল্পনা করা হয়।

কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক আগেই দেশত্যাগ করায় ও পাক বাহিনীর আকস্মিক পরাজয় বরণে এই মহা পরিকল্পনার অংশবিশেষ মাত্র কার্যকরী হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্যতনের একটি চিত্র নিচে দেওয়া গেল।

মার্চ–এপ্রিলে যাদের হত্যা করা হয়—১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ ও তার কাছাকাছি সময়ে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তারা হলেন—১. ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, (দর্শন) ২. অধ্যক্ষ এ. এন. এম. মনিরুজ্জামান (সংখ্যাতত্ত্ব), ৩. ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা (ইংরেজী), ৪. ডঃ ফজলুর রহমান খান (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), ৫. জনাব এ, মুকতাদির (ভূবিদ্যা), ৬. জনাব শরাফত আলী (অংক), ৭. জনাব এ. আর. কে. খাদেম (পদার্থ বিদ্যা), ৮. শ্রী অনুদ্ধেপায়ন ভট্টাচার্য (ফলিত পদার্থ বিদ্যা), ৯. জনাব এম. সাদত আলী (শিক্ষা ও গবেষণা), ১০. জনাব এম. এ. সাদেক (শিক্ষা ও গবেষণা)।

পাকিস্তানী হানাদারেরা কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে তারা হচ্ছেন—১. ডঃ এ. বি. এম হাবিবুল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস), ২. ডঃ এনামুল হক (বাংলা)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্যপদ থেকে বহিস্কৃত হন—১. ডঃ এনামুল হক ও ২. ডঃ কুদরত–ই–খুদা। যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয় ও রমনা হাজতে দ্বিতীয় রাজধানীতে অবস্থিত পিওডব্লিউ কেজ ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয় তারা হচ্ছেন—১. ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), ২. জনাব রফিকুল ইসলাম (বাংলা), ৩. জনাব আহসানুল হক (ইংরেজী), ৪. জনাব সাদউদ্দিন (সমাজ বিজ্ঞান), ৫. জনাব শহিদুল্লা (অংক), ৬. জনাব রাশিদুল হাসান (ইংরেজী)

যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়, কিন্তু আত্মগোপন করেন, অথবা দেশ ত্যাগ করে বাঁচেন তারা হচ্ছেন—১. ডঃ আহমদ শরিফ (বাংলা), ২. ডঃ ওয়াজিউর রহমান, ৩. আনোয়ার উল্লাহ চোধুরী (সমাজ বিজ্ঞান)। যাদের অর্দ্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াফত করণসহ ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়—১। জনাব আব্দুর রাজ্জাক (রাষ্ট বিজ্ঞান), ২. ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (রাষ্ট বিজ্ঞান), ৩. ডঃ খান সারওয়ার মুরশিদ (ইংরেজী)।

চাকুরী থেকে বরখাস্ত ও আটক রাখার আদেশ প্রাপ্ত—১. ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (বাংলা), ২. ডঃ নিলিমা ইব্রাহিম (বাংলা), ৩. ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী)। যে সমস্ত হাউস টিউটরকে জেরার জন্য ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হয়—১. জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (মহসিন হল), ২. জনাব জহুরুল হক (মহসিন হল)।

১৪ই ডিসেম্বর আল–বদর কর্তৃক ধৃত হয়ে যারা নিহত হনঃ ১. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (বাংলা), ২. জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), ৩. জনাব আনোয়ার পাশা, ৪. ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), ৫. মিঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য (ইতিহাস), ৬. জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), ৭. জনাব রাশিদুল হাসান (ইংরেজী), ৮. ডঃ ফয়জুর মহী (শিক্ষা ও গবেষণা)।

আল–বদর যাঁদের খুঁজে পায়নি—১. ডঃ নিলীমা ইব্রাহীম (বাংলা), ২. ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী), ৩. জনাব আহসানুল হক (ইংরেজী), ৪. জনাব সাদউদ্দিন (সমাজ বিজ্ঞান), ৫. ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া (ভুগোল), ৬. জনাব শহিদুল্লাহ (অংক), ৭. জনাব ওয়াকিল আহমদ (বাংলা), ৮. ডঃ আখতার আহমদ (শিক্ষা ও গবেষণা), ৯. জনাব জহুরুল হক (দর্শন), ১০. ডঃ এস. ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ১১. ডঃ লতিফ (শিক্ষা ও গবেষণা)। এঁদের অনুসন্ধান করা ছাড়াও এঁদের উপর হামলার প্রমাণ পাওয়া যায় আল–বদর আসরাফুজ্জামান খানের ডায়েরিতে (পূর্বদেশ–১১ই জানুয়ারী' ১৯৭২)। আল–বদর আরো যাদের খোঁজ করেছিল, তারা হচ্ছেন ১২. জনাব আব্দুল হাই (দর্শন), ১৩. ডঃ এম. আর. তরফদার (ইসলামের ইতিহাস), জনাব রফিকুল ইসলাম (বাংলা), ১৫. ডঃ তরিমত হোসেন (ভূতত্ত্ব) প্রমুখ।

যাঁরা দেশ ত্যাগ করেন—

১. ডঃ খান সরোয়ার মুরশিদ (ইংরেজী), ২. ডঃ আনিসুর রহমান (অর্থনীতি), ৩. জনাব রেহমান সোবহান (অর্থনীতি), ৪. ডঃ ওয়াহিদুল হক (অর্থনীতি) ৫. ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী (রাষ্টবিজ্ঞান), ৬. ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস), ৭. ডঃ অজয় রায় (পদার্থ বিদ্যা), ৮. জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া (রাষ্টবিজ্ঞান), ৯. ডঃ বেলায়েত হোসেন (পদার্থ বিদ্যা), ১০. ডঃ জিল্লুর রহমান খান (রাষ্টবিজ্ঞান), ১১. জনাব আব্দুল মান্নান চৌধুরী (বাণিজ্য), ১২. মিসেস সুলতানা সারওয়াত আরা (মনস্তত্ত্ব), ১৩. জনাব জয়নুল আবেদীন (রাষ্টবিজ্ঞান), ১৪. মিসেস রাজিয়া খান আমিন (ইংরেজী), ১৫. ডঃ ওয়াজিউর রহমান (শিক্ষা ও গবেষণা), ১৬. ডঃ রওনক জাহান (রাষ্টবিজ্ঞান), ১৭. ডঃ জহুরুল আনোয়ার (ফলিত পদার্থ বিদ্যা), ১৮. শ্রী জয়কুমার সরোজী (পদার্থবিদ্যা), ১৯. শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (বাণিজ্য), ২০. ডঃ এ টি রফিকুর রহমান (রাষ্ট বিজ্ঞান), ২১ শ্রী রংগলাল সেন (সমাজ বিজ্ঞান), ২২. ডঃ আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী (সমাজ বিজ্ঞান) ও আরো অনেকে।

(দৈনিক বাংলা, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।)

চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরী সম্পর্কে শ্যামলী চৌধুরী লিখেছেনঃ

একাত্তরের কিছু আগে আজিমপুরের বাসা থেকে আমরা পুরানা পল্টনের নতুন বাসায় চলে এলাম। বাসাটি ছিল তিনতলা। আলীম সেটি ভাড়া নিয়েছিল নীচের তলায় চোখের ক্লিনিক করবে বলে। কিছু দিনের মধ্যেই ক্লিনিক হয়ে গেল। এক তলায় ক্লিনিক, দোতলা ও তিন তলায় আমরা থাকতাম। আরম্ভ হলো সংগ্রাম। ২৫শে মার্চের রাতেই বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্টপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাদের বাসায় এলেন। তিনি ছিলেন আমার ননদের বাসায়। তাঁকে লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়লো আমাদের ওপর। কয়েকদিন তাঁকে তিনতলার একটি ছোট ঘরে রেখে ২৯শে মার্চ শাড়ী পরিয়ে আমরা সরিয়ে দিলাম। আমার ছোট ভাই স্বপন বোরখা পরিহিত সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সাহেবকে মরহুম আহমেদ ভাইয়ের বাসায় দিয়ে এলো। সেখান থেকেই তাঁকে ঢাকার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

একাত্তরের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মৌলোনা আবদুল মান্নান আমাদের নীচের তলায় এসে আশ্রয় নিলেন। একদিন সকাল দশটার দিকে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ দোতলা থেকে দেখি আমাদের প্রতিবেশী তৎকালীন পিডিপির মতীন সাহেব একজন লোক নিয়ে আমার স্বামীর কাছে এলেন। মতীন সাহেব তাঁকে বললেন— ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন। তাঁর ঘরবাড়ী কে বা কারা জ্বলিয়ে দিয়েছে। তিনি একেবারেই নিরাশ্রয়। এই মুহূর্তে তাঁকে আশ্রয় না দিলে ভদ্রলোকের খুবই অসুবিধা হবে। সব শুনে আলীম ওপরে উঠে এলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমি শুনেই এক কথায় না করে দিলাম। সেও নীচে যেয়ে তাঁদের মানা করে দিল। কিন্তু মৌলানা মান্নান এবং মতীন সাহেবের অনুনয়-বিনয় শুনে আবার আলীম ওপরে উঠে এল। আমাকে সে বোঝাতে চেষ্টা করলো— কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হলাম না। সে তখন আমার শাশুড়ীকে অনুরোধ করলো আমাকে রাজী করানোর জন্য। অগত্যা আমি চুপ করে গেলাম। কিন্তু আমি আর আমার মা সেদিন ঐ লোকটিকে আশ্রয় দিতে হলো বলে রাগে-দুঃখে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম।

মৌলানা মান্নান এক কাপড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে উঠে এলেন আমাদের বাসার এক তলায়। চক্ষু-ক্লিনিকের রোগীর বিছানা ইত্যাদির চাদর পাল্টে তাদের থাকতে দিলাম। ক্লিনিক বন্ধ হয়ে গেলো। চেম্বারটি দোতলায় আমাদের ডয়িং রুমে স্থানান্তর করা হলো। প্রায় ৪/৫ দিন চা-নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। ৭/৮ দিনের মাথায় দেখা গেল— মৌলানার বাড়ী জিনিসে ভরে গেছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা সব সময়ই তাঁর ওখানে আসতো। প্রায়ই রাতভর হৈ-হুল্লোড় চলত সে-বাড়ীতে। কয়েকদিন পর দেখা গেল দু'জন আল-বদর আমাদের দিকের গেটে পাহারারত আর ৪/৫ জন মৌলানার গেটে। তখনও বুঝিনি যে এরা আসলে আমাদের পাহারা দেয়। ভেবেছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে মৌলানা এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েও কোন লাভ হলনা। একদিন মৌলানার কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি চিঠি এল— আলীম ভাই ওপরে না থাকলে তোমাকে কবেই আমরা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতাম। সেদিন থেকে আমাদের দিকের পাহারা আরও জোরদার করা হলো। মনে যাই থাক মুখে মৌলানা খুবই ভাল ব্যবহার দেখাতেন আমার স্বামীর সঙ্গে। তিনি সব সময়ই বলতেন— ডাক্তার সাহেব, আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। আপনার কোনো ভয় নাই। আপনার কোন বিপদ হবে না। যদি কখনও কোনো অসুবিধায় পড়েন, সোজা আমার কাছে চলে আসবেন। আমি আপনাকে রক্ষা করব। আমার জীবন থাকতে আপনার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

আমার স্বামী এই আশ্বাসবাণীতে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। প্রতিদিন চেম্বারে মুক্তিযোদ্ধারা আসতো। এখানে তাঁদের বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা হতো, ওষুধ দেয়া হতো। আবার গাড়ী করে তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়া হতো। আলীম নিহত হওয়ার পরও মুক্তিযোদ্ধার এসে আমাকে বলেছে— এই দেখুন

আমার চোখে এখনও আলীম ভাইয়ের দেয়া ব্যান্ডেজ। এ সম্পর্কে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা বলুনতো মিসেস্ চৌধুরী, আপনাদের নীচের তলায় আল-বদর আর ওপরের তলায় মুক্তিযোদ্ধা আসে, এ আপনাদের কোন ধরনের ব্যবস্থা ছিল? আমি সেদিন কোন উত্তর দিতে পারিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গোপন হাসপাতাল ছিল। সেখানে ডাঃ রাব্বি, আলীম এবং অনেক ডাক্তার যেয়ে চিকিৎসা করতেন। আলীম তাঁর গাড়ীর বনেট ভরে বিভিন্ন ওষুধের কোম্পানীতে ঘুরে ঘুরে ওষুধ সংগ্রহ করতো এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরবরাহ করতো। সে চাঁদাও তুলেছে বহু টাকা অনেকের কাছ থেকে। দুর থেকে আলীমের গাড়ী দেখলে অনেকেই বাড়ীতে নেই বোঝানোর জন্য দরজা বন্ধ করে দিতেন যাতে সে ফিরে যায়। তাঁরা ভয় পেতেন এই ভেবে যে আলীমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে পাছে বিপদে পড়তে হয়। বিপদে পড়া অনেক বাঙালী পরিবারকে আশ্রয় এবং সাহায্য দিতে সব সময়ই আলীম ব্যস্ত থাকতো। এ সব কিছুই পাকিস্তানী হানাদার বাহনীর জানা ছিল বোধ হয়, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম যখন তখন আর শেষ রক্ষা হল না।

একাত্তরের ১৫ই ডিসেম্বর সেদিন। সকাল আটটায় আলীম তৈরী হচ্ছিল সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে যাবার জন্য। তখন সে সেখানে কর্মরত ছিল। মাস দেড়েক আগে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে বদলী করে তাকে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কালেজে নিয়োগ করা হয়েছিল। সে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বল্লাম— এই তো বেরিয়ে যাচ্ছো, আসবেতো সেই কারফিউ আরম্ভ হয়ে গেলে। বুঝতে পারছি আজও আমাদের বাসা থেকে সরে যাওয়া হবে না। আলীম বললো, না ঠিক সময়মতই চলে আসবো। কোথায় যাবো সে জায়াগাও ঠিক করে আসবো। তুমি নীপা, শম্পাকে নিয়ে তৈরি থেকো। এখন তাড়াতাড়ি কেরাসিনের টিনটা দাও। টিনটা দিলাম। হাতে নিয়ে দোতলা থেকে সে নীচে নেমে গেল। ওপরের জানালার পর্দা সরিয়ে অপসৃয়মান মরিস মাইনর গাড়ীটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ ভয়ে ভেতরটা কেঁপে উঠলো। মনে হল, মানুষটি যদি প্রাণ নিয়ে ফিরে না আসে। সেই ভয় নিয়েই কাটলো কয়েক ঘন্টা। বেলা ১টা বেজে গেল। কারফিউ আরম্ভ হয়ে গেলো আবার। ঠিক তখনি গাড়ীর শব্দ পেলাম। বুঝতে পারলাম, এসেছে। গাড়ী গ্যারাজে রেখে ওপরে উঠে এলো। হাতে কেরোসিনের টিন। বললো, দিয়েছো তো একটা ফুটো টিন। অর্ধেক কেরোসিনই পড়ে গেছে। অভিযোগ নীরবে শুনে আমি পাল্টা অভিযোগ করলাম, বললাম— বলেছিলাম না তুমি দেরী করে আসবে। আজও তো আমাদের বাড়ী ছাড়া হলো না। সে বললো, কালকে ঠিক দেখো চলে যাবো। আজ কোনরকমে থাকি।

কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় বোমাবর্ষণ। ভারতীয় মিগ তখন পাকিস্তানী ঘাঁটির ওপর অনবরত আক্রমণ চালাচ্ছিল। আমরা কোনোরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। বেলা প্রায় সাড়ে চারটার দিকে দোতলার সামনের বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আলীম, মা আর আমি দেখছিলাম পিলখানার ওপরে প্রচন্ড বোমাবর্ষণ। সে বলছিল, এদেশের পাকিস্তানীরা বোকার স্বর্গে বাস করছে! ভারতীয় বিমানকে বাধা দেয়ার ক্ষমতাই তাদের নেই। দ্যাখো, ওরা ইচ্ছামতো

বোমা ফেলছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন এটা তাদের আকাশ। আর এরা বলে কিনা আমেরিকার সপ্তম নৌবহর এসে এদের বাঁচাবে। গতকালও মৌলানা বলেছে, ২/১ দিনের মধ্যেই নাকি সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে যাবে। বলেই খুব হাসছিল সে।

ঠিক তার একটু পরেই আমরা একটি গাড়ীর শব্দ পেলাম। দাঁড়িয়ে দেখলাম, মাটি দিয়ে লেপা একটি ছোট মাইক্রোবাস এসে আমাদের বাসার নীচের তলায় মৌলানার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। এরকম গাড়ী প্রতিদিনই আসতো সময়ে অসময়ে তার কাছে। কাজেই গাড়ী দেখে আমাদের অন্য কিছু আর মনে হয়নি। আলীম শুধু বললো, উঁকি ঝুঁকি দিয়ো না।, ভেতরে যাও। এই বলে সে বাথরুমে গেল। আমি আর মা ভেতরে চলে এলাম।

প্রায় ৪৫ মিনিট পর আমাদের সিঁড়ির নীচের বাইরের দিকের দরজায় বেল বেজে উঠলো। ওপর থেকে দেখলাম দু'জন আল-বদর বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতে বলছে। আমি আলীমকে জিজ্ঞেস করলাম, খুলবো নাকি। সে বললো, খুলে দাও। বলেই সে নীচের তলায় মৌলানার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। আমি বললাম, কোথায় যাও। বললো, মৌলানা সাহেবের কাছে। তিনি তো অসুবিধা হলেই যেতে বলেছেন। আমি বাধা দিইনি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মৌলানার দরজায় সে প্রাণপণে শব্দ করতে লাগলো আর বললো, মৌলানা সাহেব, একটু দরজাটা খুলুন। অনেকবার বলার পরও মৌলানা দরজা খুললেন না। শুধু ভেতর থেকে বললেন, আপনি যান, আমি আছি।

আলীম তখন দৌড়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষনে ওরা ঢুকে গেছে ভেতরে। তাঁকে দেখেই বললো, হ্যান্ডস-আপ। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আলীম বললো, কেন? ওরা বললো, দরকার আছে। সে কাপড় বদলে আসতে চাইলে ওরা বললো, অন্য কাপড়ের দরকার নেই। কোথায় যেতে হবে জানতে চাইলে বললো, তা গেলেই জানতে পারবেন। লুঙ্গি আর সার্ট পরেই আলীম ওদের সাথে চলে গেলো। ওরা দরজার বাইরে যেতেই কাজের ছেলে দুটি ওপরে দৌড়ে এসে বললো, সাহেবকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে মৌলানার কাছ গেলাম। যার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হতো সেই আমি তাঁর পায়ে পড়ে গেলাম। আকুল হয়ে কেঁদে বললাম, মৌলানা সাহেব, এখনও গাড়ীটা ছাড়েনি, আপনি একটু দেখুন। ওদের একটু বলুন। মৌলানা চুপ করে বসে রইলেন। গাড়ীটা ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। তখন তিনি আমাকে বললেন, ঘাবড়াবেন না। ওরা আমার ছাত্র। ওরাই উনাকে নিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার রাব্বি এবং আরো অনেককে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন নিয়ে যাচ্ছে? তিনি বললেন, চিকিৎসার জন্য। আবার জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় নিয়ে গেল? বললেন, 'সি. এম. এইচ-এ।'

আমি কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসেই মিসেস রাব্বিকে ফোন করতে চেষ্টা করলাম। অনেক চেষ্টার পর একবার পেলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বিকেল চারটায় নিয়ে গেছে। আর কি ওরা ফিরবে? আমি একথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আবার নীচে ছুটে এলাম। মৌলানাকে বললাম, আপনি আমাকে একটু সঠিক খবর দিন। আমার অস্থিরতা দেখে তিনি বললেন, এতো উতলা

হচ্ছেন কেন? বললাম তো চিকৎসার জন্য নিয়ে গেছে। কাজ হয়ে গেলেই দিয়ে যাবে। বললাম, শীতের কাপড়তো নেয়নি। ওগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বলরেন, সে ব্যবস্থা ওরা করবে। ওপরে উঠে আবার ফোন করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তখন আমার ফোনটির আর কোন শব্দ নেই— ডেড। আমি আরও দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আবার গেলাম মৌলানার কাছে। বললাম, আমার টেলিফোন ডেড। আপনি একটু হাসপাতালে ফোন করুন, আমি আলীমের সাথে কথা বলবো। তিনি বললেন, পাগল হয়েছেন— এখন ওরা ভীষণ ব্যস্ত। এখন ফোন করা যাবে না আমি তবু পীড়াপীড়ি করতে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, চলুন আপনাকে ডাক্তার সাহেবের কাছে নিয়ে যাই। আমি খুব খুশী হয়ে ওপরে উঠে এলাম। মাকে বললাম— যাই। মা গম্ভীর হয়ে বললেন, না, তুমি যাবে না। তোমার ছোট দুটি বাচ্চাকে রেখে তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। মার কথায় দমে গেলাম। কি করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। ফোনের কাছে এসে ব্যর্থ চেষ্টা করলাম ফোন করতে। রাত বাড়তে থাকলো। কান পেতে রইলাম, দরজার কড়ানাড়া শোনার জন্যে। সামান্যতম আওয়াজেও সচকিত হয়ে উঠছিলাম। বার বার শুধু মনে হচ্ছিল, এবার সে এসেছে।

কিন্তু না, সে আসেনি। সে রাতে নয়, কোনো রাতেই নয়। পথের দিকে চেয়ে চেয়ে রাত ভোর হল একসময়। হঠাৎ কানে এল, জয়বাংলা ধ্বনি। ছাদে ছাদে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে সবাই জয়োল্লাস করছে। আমার চোখে তখন অন্ধকার। বুকে সর্বনাশের ঘন্টাধ্বনি। আমি পথে নেমে এলাম, আমার স্বামীকে খোঁজার জন্য। একটি রাস্তায় দেখতে পেলাম বিজয়োল্লাস করে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসছে। আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে খুঁজলাম একটি মুখ, না সে নেই। দিশেহারা আমি তখন বাসায় এসে কাজের ছেলেদের পাঠালাম আলীমের ছোটভাই হাফিজের কাছে গেন্ডারিয়ায়। ওরা ফিরে এলো। রাস্তায় এলোপাথাড়ি গুলি চলছে, তাই যেতে পরেনি। মুক্তিযোদ্ধা এলো কয়েকজন, বললো, আলীম ভাইকে যে মেরেছে সে কোথায়? বললাম, জানিনা। মৌলানা আবদুল মান্নান তখন পালিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও সে আমাদের খাওয়ার ঘরে লুকিয়েছিল, পরে পালিয়ে গেছে।

১৭ই ডিসেম্বর হাফিজ আসতে পারলো কোনরকমে। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ভাইয়ের খোঁজে। লুকিয়ে থাকা মিলিশিয়াদের গুলি কয়েকদফা তার গাড়ীর ওপরে এসে পড়লো। কিন্তু ভাইয়ের খোঁজে সেও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। ১৮ই ডিসেম্বর রায়ের বাজারের ইটখোলার বধ্যভূমিতে আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর সাথে পাওয়া গেল আলীমের লাশ। গায়ের শার্টটি গায়েই ছিল। হাত দু'টো দড়ি দিয়ে পেছনে বাঁধা। চোখ বাঁধার গামছাটা গলায় এসে ঠেকেছে। বুকটা গুলিতে ঝাঁঝ্‌রা হয়ে গেছে। তলপেটের ও কপালের বাঁদিকে বেয়নেটের আঘাত। হয়তো আরও ছিল আঘাতের চিহ্ন কিন্তু আমি আর দেখতে পারিনি। আজিমপুর নতুন গোরস্থানে তাঁর বাবার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হলো।

আমাকে বলা হয়েছিলো স্মৃতিচারণ করতে—আলীমের সঙ্গে আমার বিয়ে; দাম্পত্য-জীবন, সন্তান, সংসার— সব ঘিরে যে অজস্র স্মৃতি রয়েছে তার মধ্যে

প্রধান হচ্ছে তার চলে যাওয়া, ওভাবে চলে যাওয়া, তাই আমি আর কোনো স্মৃতিকে প্রাধান্য দিতে চাইনে।

ঝর্ণা রহমান তাঁর স্বামী আ.ন.ম গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে লিখেছেনঃ
যে মানুষটি কখনো মুরগী জবাই দেখতে পারতো না, নিজের শরীরে বেয়োনেটের খোঁচা তার কেমন লেগেছিল? নাকি একটি বুলেট তার সমস্ত টেনশনের অবসান করে দিয়েছিল? নির্যাতন শুরু হওয়ার আগেই কি মানুষটি মৃত্যুবরণ করেছিল? নাকি স্থিরভাবে সহ্য করেছিল সমস্ত আঘাত?

না, কিছুই জানা যায়নি। কারণ মোস্তফার লাশই পাওয়া যায়নি। সেই যে ১১ই ডিসেম্বর (১৯৭১) কাকভোর সকালে শিশুপুত্রকে বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসে চলে গেল, আর ফিরে এলো না।

দেশ স্বাধীন হলো, অনেক মুক্তিযোদ্ধা ফিরে এল ঘর আলো করে কিন্তু মোস্তফার আত্মীয় স্বজনরা তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশটাও খুঁজে পেলোনা। চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল মানুষটা।

মোস্তফার কথা মনে পড়লেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, একটু টেনে টেনে হেঁটে চলেছে একটি মানুষ। গোপীবাগ রেল লাইন পার হয়ে হেঁটে চলেছে মতিঝিলে পূর্বদেশ অফিসে। কখনো সকালে, কখনো দুপুরে, কখনো সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে। সেই একই দৃশ্য। দৃশ্যটা তাই খুবই পরিচিত।

আমার সঙ্গে মোস্তফার নিকট–সান্নিধ্য ছিল মাত্র এক বছরের। ১৯৭০–১৯৭১। মোস্তফাকে নিয়ে আমার যে স্মৃতি তাও এই এক বছরের। সেজন্যে আমার স্মৃতিও খুবই সামান্য।

আমার থেকে বয়সে প্রায় এগার বছরের বড় মানুষটি আমাকে কখনো তাঁর প্রতি প্রচন্ড কৌতূহলী করে তুলেছে, কখনো আমি বিষন্ন হয়ে পড়েছি, কখনোবা শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছি। প্রচণ্ড হাসতে পারতো মোস্তফা। হৈ হৈ করে কথা বলা আর প্রাণখোলা হাসির জন্য বন্ধু মহলে একটা ভালবাসার স্থান করে নিয়েছিল। একই সঙ্গে রাগও ছিল প্রচন্ড, দপ করে যেমন রেগে জ্বলে উঠতো তেমনি আবার নিভেও যেতো। বন্ধুরা এই রাগের আভাস পেয়েছে কিনা জানি না তবে আমরা যারা বাড়ীর লোক ছিলাম তাদেরকে প্রায়ই এই রাগের সম্মুখীন হতে হতো। কখন কিসে যে রেগে যাবে এটা বোঝা একটু মুশকিল ছিল। আর রাগলে তো কথাই নেই। ধামধুম করে সব আছড়ে ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবে বাসা থেকে। আধঘন্টা পর যখন মাথা ঠাণ্ডা করে ফিরে আসতো তখন দেখলে কেউ বলবেনা এই মানুষটি একটু আগে এমন তুলকালাম করেছে।

এই রাগটাকে আমি খুব ভয় পেতাম। তাই রাগের কথা এমন করে মনে আছে। কিছুতেই হাসিখুশী মজার লোকটার চরিত্রের এই দিকটা আমি মেলাতে পারতাম না।

আরো একটা দিক ছিল তাঁর চরিত্রের। সেটা হল নিজের আধিপত্য বজায় রাখা। সমালোচনা একদম সহ্য করতে পারতো না। মনে করতো, সবাই তাঁর চিন্তাধারায় চলবে। সে যা বলবে সেটাই হবে একমাত্র সত্য। সে যা ভাবছে,

সংসারকে যেমন ভাবে দেখছে, বাকী সবাই তেমনি ভাবনা আর চোখ নিয়ে সংসারকে দেখবে। তাই যখন তার এক ছোট ভাই দিনাজপুর কলেজে চাকরি নিয়ে গেল, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মোস্তফা। একান্নবর্তী সংসার গড়ার ইচ্ছা ছিল তার। ভাবতেও পারেনি, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন করে কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। মোস্তফা ছিল আবেগ চালিত। যুক্তির থেকে আবেগকেই বেশী মূল্য দিয়েছে সে। এবং এটা গৌরব করে বলতেও তার দ্বিধা ছিল না। এ কারণে দুঃখও পেয়েছে। কিছুতেই বুঝতে চাইতোনা সব কিছু তাঁর মন মত হবে না। এক একজনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এক একরকম।

তবে অসম্ভব ভালবাসতে পারতো। বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন যাকেই মন থেকে ভালবেসেছে তার জন্য করতে পারে না এমন কাজ ছিল না তার কাছে। কারো চাকরির তদবির, কারো ভর্তি—এমনি নানা কাজে অনেকটা সময় তাকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি।

আর সবচেয়ে যে ভালবাসার লোকটি মোস্তফার জীবনে ছিলেন, তিনি তাঁর বাবা। বাবার প্রতি অন্ধ ভালবাসায় জীবনের অনেক কিছুকেই তুচ্ছজ্ঞান করেছে। সে অনেক সাধ আহলাদকে বিসর্জন দিয়েছে। অনেক সময় নিজের বউ–এর ভালো লাগা মন্দ লাগাকে উপেক্ষা করেছে। এ ভালবাসা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমি আমার এই জীবনে আর এমনটা দেখিনি। বাবার খুশীকে নিজের খুশী হিসেবে গ্রহণ করার যেন ব্রত নিয়েছিল সে।

কবিতা পড়তে, কবিতা আবৃত্তি করতে ভালবাসতো মোস্তফা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তবে দুঃখের বিষয় গলার স্বর তেমন গুরু গম্ভীর ছিল না বলে আবৃত্তি–শিল্পী হতে পারেনি। তবে একথাটা কিন্তু বলার উপায় ছিল না। খুব রাগ হতো তাহলে।

মোস্তফা ভাগ্যকে বিশ্বাস করতো না। বলতো তার ভাগ্য তার নিয়ন্ত্রণে। মোস্তফার হাতের ভাগ্যরখাটা ছিল স্পষ্ট এবং সোজা। তাই নিয়ে নিজেই বলতো '' আমার সাফল্যকে কে রুখবে? এমন ভাগ্যরেখা আর কারো আছে?'' নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে মোস্তফার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু বর্তমানে দৈনিক দেশ–এর নিউজ এডিটর বোরহান আহমেদ একদিন বাসায় বেড়াতে এসে মোস্তফার হাত দেখেছিলেন কৌতুহলবশত। উনি মোস্তফাকে বলেছিলেন– মোস্তফা বিখ্যাত হবে, খুব নাম হবে তার। এর মাসখানেকের মধ্যেই মোস্তফা নিখোঁজ হয়।

বোরহান ভাইয়ের সাথে এখনো মাঝে মাঝে দেখা হয়। খুব জানতে ইচ্ছে করে উনি কি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন--মোস্তফা এরকম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমর হবে?

ছোটদের সঙ্গে মোস্তফার খাতির ছিল খুব। যে কোন ছোট বাচ্চা ওকে খুব পছন্দ করতো। মনগড়া গল্প ফেঁদে বাচ্চাদের আকর্ষণ করতো। মোস্তফার বন্ধু মনজুর আহমেদের ছেলে বাপীকে মজার মজার গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলতো। যে গল্পের সব নায়কই ছিল বাপী, অনু নাম নিয়ে। বাপীকে কথা দিয়েছিল এই গল্পগুলো নিয়ে একটি বই লিখবে। যে বইয়ের নাম হবে 'অনুর

কাণ্ডকারকানা'–এবং বইটা উৎসর্গ করবে বাপীকেই। মোস্তফা বাপীকে দেয়া কথা রাখতে পারেনি। অনুকে তুলে দিকে পারেনি বাপীর হাতে।

যুদ্ধের ন'মাস মোস্তফা খুব অস্থির ছিল। তখন সদ্য সে বাবা হয়েছে। ছেলের নাম রেখেছে অভী। অস্থিরতার মধ্যে এক একটা সময়ে হঠাৎ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতো। আমরা বলতাম, টেলিপ্যাথিতে সে ছেলের সাথে কথা বলে। স্বপ্ন দেখতো—তার ছেলে স্বাধীন দেশের নাগরিক হবে। ঐ সময় তার আর একটি প্রিয় কাজ ছিল দেশ স্বাধীন হলে কী কী করবে তার একটা লিষ্ট করা। সেই লিস্টে তার বাবা ভাই ছেলে কেউ বাদ পড়তো না।

যুদ্ধের ন'মাসে যখন মানুষ ফিস ফিস করে কথা বলতো—তখন মোস্তফা কথা বলতো চিৎকার করে। এটাকে কী বলবো? সরলতা নাকি বোকামী। শুধু বাড়ীতেই নয়, অফিসেও তার আচরণ ছিল একই রকম। বন্ধুরা বারণ করলেও শুনতো না। মনে করতো ওর কোন ক্ষতি কেউ করবে না। আর ঘাতক চৌধুরী মঈনুদ্দিন? তার সম্পর্কেত চিন্তাই করা যায় না। কারণ 'পূর্বদেশে' মঈনুদ্দিনের চাকরির জন্য নাকি মোস্তফাই তদবির করেছিল।

বাড়ীর সকলকে সে আশ্বাস দিয়েছিল ভয় না পেতে। কারণ পাকিস্তান সরকার কথা দিয়েছে সাংবাদিকদের কোন ক্ষতি করবে না।

পরে মোস্তফার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলী আকবরের কাছে শুনেছি, সবাই যখন কিছু একটা সন্দেহ করে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন নাকি সে বলেছিল––''আমি কি করে পালাবো, আমার বাড়ীতে ন'মাসের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ রয়েছে। এদের আমি কার কাছে রেখে যাবো। তার উপর আমার স্ত্রী আবার সন্তান সম্ভবা।''

আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে, সেটা ডিসেম্বরের (১৯৭১) দুই কি তিন তারিখ হবে। মোস্তফা তাঁর শশুরবাড়ী রায়ের বাজার গিয়েছিল সম্বন্ধির বউভাত খেতে। সকালে যখন সকলে বারান্দায় বসে রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছে হঠাৎ করে রাজাকাররা ঘিরে ফেললো ঐ বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকে সব ছেলেদের টেনে বের করে নিয়ে গেল মাঠে। সার্চ করা হল পুরো বাড়ী। তারপর এক এক করে পরিচয়ের পালা। মোস্তফা এবং মনজুর আহমেদের সাংবাদিকের পরিচয়পত্র দেখে হঠাৎ কি হল অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ক্ষমাটমা চেয়ে ছেড়ে দিল সবাইকে। এ ঘটনায় মোস্তফা তার পেশা নিয়ে আরো গর্বিত হয়ে উঠেছিল। আরো নির্ভয় হয়েছিল। নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল স্বাধীন দেশ সম্পর্কে।

কিন্তু তারপর। তাঁর এই বিশ্বাসের স্থায়ীকাল ছিল মাত্র এক সপ্তাহ। এসে গেল সেই ভয়াবহ দিনটি। যে দিনটির স্মৃতি আমার অতীতের সকল স্মৃতিকে মুছে দিয়েছে।

১০ই ডিসেম্বর সারারাত অভী চিৎকার করে বাড়ী মাথায় করছিল। কিছুতেই ঘুম পাড়ানো যাচ্ছিল না। মোস্তফাকে আঁকড়ে ধরে ন'মাসের অভী কেঁদে একাকার হচ্ছিল। আমরা বাড়ীসুদ্ধ সবাই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম ওর কান্নায়। কিন্তু কোন কারণও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কান্নাও থামানো যাচ্ছিল না। রাত দুটোর দিকে মোস্তফার কোলে ঘুমিয়ে পড়লো অভী। কিন্তু বিছানায় শোয়ানো গেল না তাকে। মোস্তফার কোল থেকে নামানোও গেল না। মোস্তফা অভীকে বুকের

উপর নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে যার যার ঘরে শুয়ে পড়লাম। আমি অসুস্থ। আমার গর্ভে তখন আর এক সন্তান বেড়ে উঠছে। রাত চারটার দিকে আবার অভী কেঁদে জেগে উঠলো। মোস্তফা তাড়াতাড়ি অভীকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। দুরে তখন আজানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তখনো অন্ধকার কাটেনি। অভীর দাদা নামাজ পড়ার জন্য উঠেছেন। মোস্তফা বাড়ীর লনে হেঁটে বেড়াচ্ছিল অভীকে কোলে নিয়ে। আর আমরা সবাই ঘুমে অচেতন।

এমন সময় বারো তেরোজন লোক এসে বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালো। হাতে বন্দুক, পরনে ইউনিফর্ম। গেট খুলে দুজন বাড়ীর ভিতর ঢুকে বারান্দায় দাঁড়ানো মোস্তফার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো ''এটা কি মোস্তফা সাহেবের বাড়ী? মোস্তফা কোথায়।''—এগিয়ে এল মোস্তফা, কোলে অভী, বললো আমি মোস্তফা। ওরা বললো—''কাইন্ডলি আমাদের সাথে একটু আসুন। বাচ্চাকে রেখে আসুন। ভয়ের কিছু নেই, আমরা আপনাকে পূর্বদেশ অফিসে নিয়ে যাবো। ওখানে আপনার আইডেনটিটি কার্ডটা একটু পরীক্ষা করবো।'' না ঐ মুহূর্তেও ভয় পায়নি মোস্তফা। ওঁতো জানে সাংবাদিকদের কোন ক্ষতি করবে না কেউ। আইডেনটিটি কার্ডটা ঐ সময় তার পরে থাকা পাঞ্জাবির পকেটেই ছিল। শুধু অভীকে বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল মোস্তফা।

আমাদের কারো সাথে দেখা হল না। আমাকে কেউ ডাকেনি। ঘুম ভেঙে শুনলাম মোস্তফাকে নিযে গেছে। সাথে সাথে মোস্তফার ছোট ভাই পূর্বদেশ অফিসে গেল তার খোঁজে। না, ওখানে মোস্তাফাকে নিযে যায়নি কেউ। কেউ বলতে পারে না কোথায় নিতে পারে মোস্তাফাকে। এরই মধ্যে দশটা বাজার সাথে সাথে কার্ফূ জারী করা হল। এক নাগাড়ে এক দু'ঘন্টা বিরতি দিয়ে কার্ফূ চললো ১৫ তারিখ পর্যন্ত। মোস্তফার খোঁজ করা গেল না। হারিয়ে গেল, নিখোঁজ হয়ে গেল মোস্তফা। পর শুনেছি সেদিনই তাঁর পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। মোস্তফা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। মোস্তফার মেয়ে উর্মি জন্মের আগেই পিতৃহারা হল।

মোস্তফার মৃত্যুর পর বিভিন্ন সুত্রে পাওয়া সরকার প্রদত্ত টাকা দিয়ে দিনাজপুরে অবস্থিত মোস্তফার বাবার বাড়ী পুনঃনির্মান করা হয়েছে। যেখানে মোস্তফার সন্তানেরা ঠাঁই পায়নি। মোস্তফার ভাইদের বাড়ী এখন ওটা। মোস্তাফার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তাদের নানাবাড়ীতে।

আর অকাল বিধবা স্ত্রী? থাক সে কথা। সেটা অন্যপ্রসঙ্গ।

মাসতুরা খানম—মীর আব্দুল কাইয়ুমের স্ত্রী। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেনঃ
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছি। কিছু কথা, কিছু অনুভূতি, কিছু স্মৃতি ভাষার গাঁথুনী দিয়ে ধরা যায় না। আমি নিরুপায়। ১৯৭১-এর ২৫শে নভেম্বর আর আজ ১৯৮৮ শেষ হতে আর মাত্র ক'টা দিন বাকী। অনেকটা পথ তো পেরিয়ে এলাম স্মৃতির অনুভূতি আর বাস্তবের কঠিন পথ ধরে। সুখ-দুঃখের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই, তাই বলব না আমি কেমন ছিলাম,

কেমন আছি। আজ আমার বারবার মনে হচ্ছে—আমরা সবাই কেমন আছি। কেমন থাকার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১-এ স্বাধীনতার ডাকে কেমন অকুতোভয় বলিষ্ঠ পদচারণা, কেমন আত্মহুতি, তারপর এলো স্বাধীনতা। কিন্তু সেই স্বপ্নের গোলাপকে কি আমরা তেমন সতেজ ও নির্মল রাখতে পারলাম? আজ আমাদের সেই কণ্ঠ রুদ্ধ—তাই স্মৃতির মণিকোঠায় চিরভাস্বর সেই মানুষটির কথা কোন ভাষায়, কোন অনুভূতিতে, কোন আনন্দ নিয়ে আমি লিখব।

কিছু, কিছু স্মৃতি আছে যা বেদনাদায়ক হলেও মানুষকে অন্য এক ধরনের আনন্দ দেয়। যা হারিয়ে যায় তা তো আর ফিরে আসে না—কিন্তু তাঁর স্মৃতি হৃদয়ে একটা রেশ রেখে যায়, একটি অনুরণন তৈরী করে, যার ঝংকার চলার পথে অনুপ্রেরণা দেয়। আমি তেমনি এক ঝঙ্কৃত বীণার সুর ধরেই চলেছি। ২৫শে নভেম্বর ১৯৭১-এর ভয়াবহ রাতে মীর আবদুল কাইয়ুম নামের প্রাণবন্ত হাসিখুশী মানুষটি হারিয়ে গেছে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৯৭১-এর ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক তাজা প্রাণই ঝরে গেছে, তারমধ্যে কাইয়ুমও একজন। সবার দুঃখের সঙ্গে আমার দুঃখও আজ মিলেমিশে একাকার।

ময়মনসিং-এর ঘাগরা গ্রামের মীর পরিবারের সন্তান কাইয়ুম। বাবা ছিল না, মা-ভাইবোন সবার আদরের ধন। গফরগাঁও কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, আনন্দমোহন কলেজ থেকে বি.এ. এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এ. পড়েছিল ১৯৬২ সালে। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিল। একজন নির্বিবাদী মানুষ, স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ কেমন করে হানাদারদের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল। অথচ অগণিত নির্দোষ, দেশপ্রেমিক মানুষদের যারা হত্যা করেছে, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধন যুগিয়েছে তারা আজ অনেকেই অবাধে সমাজে বিচরণ করছে। কেন এমন হলো—এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

আমরা দুজনই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। তাঁকে জেনেছি কেবল আমার স্বামী হিসেবেই নয়, আমার সন্তানের পিতা হিসেবে, আমার কর্মজীবনের সঙ্গী হিসেবে, একান্ত বন্ধু হিসেবে। সমস্ত স্মৃতিই একান্তই আমার, নিবিড় আনন্দের, তবু একটি কথা বলি—সে ছিল সবার অতি প্রিয়। কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা ছোট বড় সবাইকে ছুঁয়ে যায়। তাঁর ছিল এমনই এক ব্যক্তিত্ব। ছোটদের হাসিখুশীতে মাতিয়ে রাখা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি মমত্ব, যে কোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার সহজ একটি ক্ষমতা তাঁর মাঝে আমি সব সময়ই লক্ষ্য করেছি। নিরহংকার একটি মন তাঁর মধ্যে ছিল। এই মুহূর্তে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিক্সায় বাড়ী ফিরছি, হঠাৎ দেখি আমাদের পেছনের রিক্সায় আমাদের এক স্যার (তখন যদিও সহকর্মী আমরা সবাই)। ওঁ রিক্সাওয়ালাকে বলল, ''এই রিক্সা, আস্তে চলো, পেছনের রিক্সাকে সামনে যেতে দাও।'' স্যার আমাদের পিছনে পিছনে আসবেন তাই কি হয়। এ ধরনের ছোটখাট ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা খুব বেশী ছিল। বিভাগের যে কোন কাজে সদাহাস্য কাইয়ুমকে দেখা যেত

নাওয়া খাওয়া ভুলে কাজের মধ্যে ডুবে যেতে। ছাত্রছাত্রীদের কাছেও সে ছিল খুব প্রিয় স্যার। তার সম্পর্ক কেবল ক্লাশরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না, যে কোন সমস্যা নিয়ে সবাই নিঃসঙ্কোচে তার কাছে আসতে। এখনও মনোবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরীতে আলমারীর বিভিন্ন লকারের গায়ে তাঁর হাতের লেখা কাগজে কোন লকারে কোন জিনিষ থাকবে তা আটকানো রয়েছে। খুব যত্ন সহকারে আন্তরিকতার সাথে সে প্রতিটি কাজ করত।

সংসার জীবনে মা-ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিবিড় একটা আত্মিক যোগাযোগ তাঁর ছিল। মাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ সহজে সে করত না। বাচ্চারা তখন খুব ছোট, তাদের স্মৃতিতে বাবা খুব একটা উজ্জ্বল নয়, ছেলেমেয়ে অন্তপ্রাণ কেমন করে হারিয়ে গেছে বাচ্চাদের আমি তা অনেকদিনই বোঝাতে পারতাম না। সংসারের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতো কাইয়ুম। রাজনীতিতে তাঁর একটা গভীর জ্ঞান ছিল, দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী তার নখদর্পনে থাকত। গভীর মনোযোগ ও সততার সঙ্গে যে কোন বিষয় চিন্তা করবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আমি দেখেছি। মাঝে মাঝে বলত, ''ছেলেমেয়েরা বড় হলে তুমি সংসারের হাল ধরবে, আমি হয়ত রাজনীতির অঙ্গনে পা বাড়াতেও পারি।'' অবশ্য তখনকার রাজনীতি আজকের মত এত নোংরা ও কেবল স্বার্থসর্বস্ব ছিল না। যে কোন মুক্তবুদ্ধি মানুষ দেশের সমস্যা নিয়ে সচেতনভাবে চিন্তা করতে পারবে, তাঁর মতামত অকপটে ব্যক্ত করবার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে-এটাই তো স্বাধীনতা। সেই আলোকেই তাঁর চিন্তাধারা আবর্তিত হতো। তখন মূল্যবোধের এমন অবক্ষয় হয়নি। তাই আজ ভাবি, যে মুক্ত মন নিয়ে ১৮৬৯ থেকে ১৯৭১-এ সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা চিন্তা করতে তা আজ কেমন করে কোন অন্ধকারে তলিয়ে গেল। আমার স্বামীও সেভাবেই চিন্তা করতেন। যে মানসিক শক্তি দিয়ে '৭১-এ পাকিস্তানী হানাদারদের পরাস্ত করেছি সেই শক্তি দিয়ে এখন আর আমরা সমাজের আবর্জনাকে দূর করতে পারছি না এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি আর থাকতে পারে একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের জন্য। যখন '৭১-এ অনেকেই দেশ ছেড়ে ওপারে গেলেন তখনও কাইয়ূমের কণ্ঠে একই কথা—''দেশ ছেড়ে যাব না, দেশে থেকেই দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবব, দেশ একদিন স্বাধীন হবেই, কিন্তু দেখে যেতে পারব তো?'' তাঁর এই সংশয়ই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো, স্বাধীনতা আর দেখে যাওয়া হলো না। এখন আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, দিন চলে গেছে, দিন চলে যাচ্ছে, দিন চলে যাবে কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সেই আত্মার আহ্বান আমরা আর শুনতে পাচ্ছি না। এ যন্ত্রণা শুধু আমার একার নয়, সবার। এত বছর পর হ'লেও আমরা কি সবাই মিলে আর একবার জেগে উঠতে পারি না?

আমাকে কিছু স্মৃতিচারণ করতে বলা হয়েছিল। আমার অক্ষমতা, আমি তা তেমনভাবে পারলাম না। একটা ক্ষোভের দেয়াল আমার স্মৃতি ও আমার অতি

প্রিয় দেশের আজকের এই অবস্থায় মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে পারি না আমার সন্তানদের জবাব দিতে। তাদের বাবার স্বপ্নের স্বাধীনতার এমন জীর্ণ দশা কেন?

মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর অগ্রজ কবীর চৌধুরীঃ
মুনীরের কী স্মৃতিচারণ করবো আমি? হাজারো ছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলবো? আমরা তো শুধু পিঠাপিঠি সহোদর ভাই ছিলাম না, ছেলেবেলা থেকেই ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো বন্ধুত্বের, ভালোবাসার, সহমর্মিতার, আবার সেই সঙ্গে পরম স্নেহ ও গভীর শ্রদ্ধার। তখনো আমি স্কুলের গন্ডী পার হইনি। খুব মন দিয়ে একটা ইংরেজী কবিতার সংক্ষিপ্তসার লেখার চেষ্টা করছি, এমন সময় সদা-চঞ্চল মুনীর এসে ইচ্ছে করে নানা কথা বলে আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করলো। নিছক দুষ্টুমির তাগিদে। ছেলেবেলায় রীতিমত দুরন্ত ছিলো। আমি বারণ করলাম কিন্তু ও কিছুতেই শুনবে না। শেষে কোনরকমে ওকে ঘর থেকে বারান্দায় পার করে দিয়ে আমি কাঁচের বড় দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। দু'চার মিনিট বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে মুনীর দরজার সামনে এসে কাঁচের গায়ে হাল্কা আঘাত করে হাত আর মুখভঙ্গি দ্বারা বোঝালো যে, দরজা খুলে না দিলে সে ঘুষি মেরে কাঁচ ভেঙ্গে ফেলবে। আমি চোখ তুলে একবার তাকালাম বটে কিন্তু বিশেষ পাত্তা দিলাম না। তারপরই ঝন্‌ঝন্ শব্দ। সত্যিই ও ঘুষি মেরে কাঁচ ভেঙ্গে ফেলেছে, আর তার চাইতেও যা মারাত্মক-ওর কব্জির কাছটায় অনেকখানি কেটে গেছে, এবং সেখান থেকে প্রবল বেগে রক্ত ঝরছে। পরে ডাক্তার বলেছিলেন যে, আর সামান্য একটু গভীর হয়ে কাটলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারতো।

ছেলেবেলায় মুনীর খেতে খুব ভালোবাসতো, বড়ো হয়ে খাওয়াতো। যখন সে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত, অধ্যাপক, গবেষক, নাট্যকার, অজস্র কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য যখন তার সময়ের প্রচণ্ড টানাটানি, তখনও সে নিয়মিত বাজার করতো, মৌসুমের নতুন ওঠা ফল আর সব্জী কিনতো আগ্রহ নিয়ে, প্রায়ই বৃদ্ধ বাবা-মা-র জন্য সেসব নিজের হাতে নিয়ে আসতো তাঁদের ধানমণ্ডির সেন্ট্রাল রোডের বাড়িতে। এই ছবি, এবং এর সঙ্গে আরেকটি ছবিও, আজো আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভাসে। শুক্রবারের দুপুর। ঘড়ির কাঁটা ধরে মুনীর তার গাড়ি নিয়ে এসেছে, বাবাকে জুম্মার নামাজের জন্য মসজিদে পৌঁছে দেবে, তারপর সে ধানমণ্ডির কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় নিজের বাসায় ফিরে যাবে, এবং পরে যথাসময়ে আবার মসজিদে গিয়ে বাবাকে তুলে বাড়িতে পৌঁছে দেবে। বাবা গতায়ূ হয়েছেন ১৯৭০-এর এপ্রিলে, মুনীরের মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে। আজও আমাদের অশীতিপর বৃদ্ধা মা প্রায়ই দুচোখে টলটলে অশ্রু নিয়ে মুনীরের এসব স্মৃতিচারণ করেন।

মুনীর যে ছেলেবেলায় খেতে খুব ভালোবাসতো তার কথা উল্লেখ করেছি। আমাদের খাবার ঘরে জালের একটা আলমারী ছিলো। মুনীরের জন্যই মা সেই আমলামীতে তালা দিয়ে রাখতেন। একদিন ও পেছন দিকে ছুরি দিয়ে নিপুণভাবে

জাল কেটে বড় এক শিশি আচার সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলেছিলো। খাবার ব্যাপারে ছেলেবেলার আর একটি ঘটনার ছবি আমার মনে গভীর দাগ কেটে আছে। আমি, মুনীর এবং আরো জনতিনেক ছোট ছোট ভাইবোন খেতে বসেছি। মা বেড়ে দিচ্ছেন। মাছ দেখে মুনীর বললো যে, সে মাছ খাবে না। মা তাকে ডিম ভেজে দিলেন। মুনীর ডিম, তরিতরকারী আর ডাল দিয়ে খানিকটা খেয়ে নিয়েই মাকে এবার মাছ দিতে বললো। মা বললেন, ও, এটা তোমার একটা ফন্দী। চালাকী করে আগে ডিম খেয়ে এখন আবার মাছ চাইছো? না, আজ আর তুমি মাছ পাবে না। হঠাৎ কি হল, মুনীর বোধহয় খুব অপমানিত বোধ করলো, কিম্বা প্রচণ্ড অভিমান হল, সে একটি কথাও না বলে ভাতের থালাটা সামনে ঠেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। মা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি অত ভেবে কথাটা বলেননি। আমি তাঁকে বললাম, মা, আমি তো খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কখনো অনুযোগ করিনা, ও একটু খেতে ভালোবাসে, মাছটা ওকে দিলেই হত। মা বোধহয় নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকার জন্য একটু রাগের সঙ্গেই বললেন, না, ভীষণ দুষ্টু হয়েছে ওটা, ঠিক আছে, তোমরা খাও। একবেলা কম খেলে ওর বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি খেতে পারলাম না। মাকে বললাম, আমি আসছি। বলেই উপরে উঠে গেলাম। মুনীর দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে আছে। আমি দরজা ধাক্কা দিয়ে বললাম, মুনীর, দরজা খোলো, খেতে চলো। তুমি কি আমাকে আমার খাওয়া শেষ করতে দেবে না? দু'বার বলতেই ও দরজা খুলে দিলো এবং চোখেমুখে পানির ঝাপ্টা দিয়ে শান্তভাবে আমার সঙ্গে নিচে নেমে এসে আবার খেতে বসলো। মা এবার তার পাতে দু'টুকরা মাছ তুলে দিলে সে দিব্যি খেয়ে নিলো।

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দুপুর বেলা, স্বাধীনতার মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা আগে, আমাদের ধানমণ্ডি সেন্ট্রাল রোডের পৈত্রিক বাড়িতে মুনীর স্নান শেষ করে চুল আঁচড়াচ্ছিলো। মা তার খাবার বেড়ে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় দখলদার পাক সেনাবাহিনীর বর্বর ফ্যাসিস্ট সহযোগী আল-বদরের লোকরা গাড়ি নিয়ে এসে মুনীরকে বললো যে ওকে তাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে, খানিকক্ষণ পরে তারা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। মা মুনীরকে কিছু খেয়ে নিতে বলেছিলেন। মুনীর বলেছিলো ফিরে এসে খাবে। আর সে ফিরে আসেনি। তার মৃতদেহও আমরা খুঁজে পাইনি।

মুনীরের মরদেহ হারিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু স্মৃতি সত্তায় তার যে অজস্র ছবি উৎকীর্ণ হয়ে আছে তা কোনদিন হারাবার নয়। একটা ছবি মনে পড়ছে খুব। সম্ভবত ১৯৪৬ সালের কথা। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে মুনীরের সদ্য রচিত একাংকিকা ''রাজার জন্মদিনে'' মঞ্চস্থ হবে। পরে এ নাটক পাণ্ডুলিপি আকারেই হারিয়ে যায় তবে কাহিনীর চুম্বকটি আমার মনে আছে। ব্যঙ্গধর্মী নাটিকা, কৌতুকসক্রান্ত, একটু উদ্ভটের ছোঁয়াও ছিলো। নায়ক প্রগতিশীল তরুন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উজ্জীবিত। যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে তার পিতা কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর মানুষ, খুব সম্ভব একজন

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। ছেলেটি যেদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কন্যার পিতার কাছে যাবে সেদিন খবরের কাগজে খবর বেরুলো যে রাজার জন্মদিনে উপলক্ষে মেয়েটির বাবা খান বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। ব্যস, আর বিয়ের প্রস্তাব করা হল না। তার ভালোবাসা উবে না গেলেও কোন খান বাহাদুর তনয়াকে তার পক্ষে আর বিয়ে করা সম্ভব নয়। যাই হোক, আমি নাটকটি দেখতে গিয়েছিলাম।

ছাত্রের লেখা একটি নাটক—হলের ছাত্রসংসদ রীতিমত বড় অনুষ্ঠান করে হল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ করছে—সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এটাও ছিলো একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। আমি নাটক শুরু হবার একটু আগেই গিয়েছিলাম, মুনীরের অনুরোধে। আমাকে দেখে সে একটু লাজুক ভঙ্গিতে এগিয়ে এসেছিলো। ওর চোখে মুখে আশ্চর্য উৎসাহের দীপ্তি দেখেছিলাম সেদিন, সৃষ্টিশীলতার দ্যুতি। পরে আরো অনেকবার তার চোখে সে আলো দেখেছি, যখন তার নিজের কোন নতুন লেখা পড়ে শুনিয়েছে কিংবা অপরের লেখা কোন নতুন সাহিত্যকর্ম পড়ে আলোড়িত হয়েছে কিংবা বাংলা টাইপরাইটারের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নতুন কী-বোর্ড তৈরীর জটিল প্রক্রিয়ার কোন স্তরে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। এসব ছবি রক্তমাংসে বাস্তবে আর কোনদিন দেখবো না কিন্তু আমার কাছে এসব শুধু ছবি নয়, তার চাইতে অনেক বেশী স্থায়ী, অনেক বেশী অক্ষয়।

চট্টগ্রামের দন্ত চিকিৎসক ডাঃ শফির স্ত্রী মুশতারী শফি লিখেছেনঃ

১৯৫৫ সাল। ১৬ জানুয়ারী। আমার বয়স ১৫ পেরোবার পরের দিন। ডাঃ শফীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। তাঁর সাথে আমার বয়সের বেশ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁর সদাহাস্য প্রাণচঞ্চল আমুদে স্বভাব, তারণ্য, আমার প্রতি উদার মনোভাব, অগাধ ভালোবাসা আমাকে অভিভুত করেছিলো। আমি যেন এক নিশ্চিত আশ্রয় পেলাম। শিশুকালে মাতৃ-পিতৃহীনা হওয়ায় আমার লেখাপড়া তেমন হয়নি, কিন্তু তিনি আমার শিক্ষার পিপাসা মেটাতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রচুর বইপত্র, ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতির জ্ঞান দান, শিক্ষক তিনি নিজেই। শুধু তাই নয়, গৃহশিক্ষক রেখে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম, পরে গীটার শিক্ষা। সব কিছুতেই তিনি যেন আমাকে পুরোপুরিভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সফল হইনি, সে-ব্যর্থতা আমার। দেখেছি অনেককে প্রথমে রোগী হয়ে আসতে, পরে এমন বন্ধু হয়ে যেতেন যে কেবল তাঁরই নয়, পরিবারের সবার-এমনকি তাঁর আত্মীয় পরিচয়ে কেউ এলে তাঁদের কাছ থেকেও তিনি ফী নিতেন না। ডাঃ শফী প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক অথচ ধার্মিক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলের রাজবন্দীদের চুক্তির ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন। আর এ জন্য তাঁর পক্ষে আরো সম্ভব হয়েছিল গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে কড়া পুলিশ প্রহরায় রাজবন্দীদের নিয়ে আসা হতো আমাদের গৃহ সংলগ্ন তাঁর চেম্বারে। জেল কর্তৃপক্ষকে বলে এ কর্মটি তিনিই করেছিলেন কৌশলে। বিয়ের পর থেকেই দেখছি বাড়ীতে গভীর রাত পর্যন্ত চলে রাজনৈতিক আড্ডা, মাঝে মাঝে গণসঙ্গীতের আসর। এ সময় চট্টগামে গড়ে ওঠে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'প্রান্তিক' পরে 'জাগৃতি'। এই দুটো

প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠাপোষক। প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন এই প্রতিষ্ঠান দুটোকে। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলে অনেক রাজনৈতিক নেতা গ্রেফতার হন, অনেকে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। যাঁরা আন্ডার গ্রাউণ্ডে ছিলেন তাঁরা আসতেন গভীর রাতে হঠাৎ-হঠাৎ।

ডাঃ শফীকে দেখতাম তখন আনন্দে আত্মহারা হতে। আমাকে অনুরোধ করতেন তাঁদের রেঁধে খাওয়াতে, পরে একাজ আমার গা-সওয়া হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে আমি বিরক্ত হলে তিনি বলতেন—এঁদের সেবা করা মানেই দেশের কাজ। একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, 'দেশের কাজ বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?' তিনি বলেছিলেন, 'দেশমুক্তির কাজ'। আমি অবাক। দেশ মুক্তি মানে? আমাদের দেশ তো একটা স্বাধীন দেশ।' তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বুঝবে না, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। ঠিক আছে পূর্ণেন্দুদা অথবা হারুন এলে ওঁদের কাছে থেকে জেনে নিও।'

ডাঃ শফী নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন গভীরভাবে। সেই সাথে বিশ্বাস করতেন নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ছাড়া সামাজিক কল্যাণ ও দেশের অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁর একান্ত সাহায্য সহযোগিতায় আমি গড়ে তুলেছিলাম 'বান্ধবী-সংঘ' নামে একটি সমজকল্যাণমূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ডাঃ শফী প্রথম জীবনে বেহালা বাজাতেন, ছবিও আঁকতেন। কিন্তু পেশাগত কারণে সে সবের চর্চা আর অব্যাহত থাকেনি। তবে ছবি তোলার শখ ছিল তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত। 'বান্ধবী সংঘে'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনিই ছিলেন একমাত্র বিনে-পয়সার ক্যামেরাম্যান। ১৯৬৮ সালে সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ''মেয়েদের প্রেস' নামে একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানা আমরা প্রতিষ্ঠা করি আমারই বাসগৃহে। এই প্রতিষ্ঠার পিছনেও ডাঃ শফীর ছিল অপরিসীম উৎসাহ। এর সিংহভাগ অর্থ তিনিই দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়। চেম্বারে রোগী দেখার পরের সময়টুকুও তিনি প্রেসের জন্যে শ্রম দিতেন।

ডাঃ শফীর স্মৃতিকথা বলতে গেলে—দেশ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তাই তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে একাত্তরের কথা বলতেই হবে। ১৯৭১ সাল। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামের অবাঙালী এলাকায় বাঙ্গালী নিধন চলছে পুরোদমে। এ সময় একদিন আমাদের পাড়া এনায়েত বাজারের বাঙালী ছেলেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দা, ছুরি, হকিস্টিক, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে অবাঙ্গালী বাড়ী আক্রমণ করতে হৈ হৈ করে ছুটে এলো। আমাদের এই এলাকায় আগাখানী ও বিহারী সম্প্রদায়ের অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের বসবাস বেশী। ডঃ শফীকে দেখলাম সেই ক্ষুব্ধ জনতার সামনে ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে, বক্তৃতা করে, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ ব্যাখ্য করে, এমনকি নিজের জীবনদানের জন্যে প্রস্তুত বলে জানালো। সেই উন্মত্ত জনতা থেমে যায়, ফিরে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল তাঁর রোগী। ডাঃ শফীর আরেকটি গুণ ছিল—দরিদ্র প্রতিবেশী এবং শ্রমজীবী মানুষদের কাছ থেকে কখনোই ফী নিতেন না। শুধু তাই নয়, অনেকেই বুঝতো না 'ডেন্টাল সার্জেন' মানে কেবলই দাঁতের চিকিৎসক সাইনবোর্ডে

'ডাক্তার' লেখা আছে তাই যেকোনো রোগের জন্যই ওরা আসতো, এমনকি গভীর রাতেও আসতো। তিনি বিরক্ত হতেন না, দেখতাম হাসি মুখে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ দিচ্ছেন। বড় রকমের কিছু হলে চিঠি লিখে পাঠাতেন অন্য ডাক্তারের কাছে—যাতে ফী না নেয়। অথবা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থা করতেন, ভালো না হওয়া পর্যন্ত খোঁজ খবর নিতেন। এ কারণেই তিনি সবার পরিচিত ছিলেন, অনেকেই তাঁকে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, আর তাই অবাঙ্গালী প্রতিবেশীরাও সেদিন রক্ষা পেয়েছিল।

এলো সেই কালরাত ২৫শে মার্চ। চট্টগ্রাম শহর হঠাৎ করেই যেন ভয়ানক রকম থমথমে হয়ে উঠলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা, ফিসফিস, নিম্নস্বরে আলোচনা। ডাঃ শফীর অনেক বন্ধু সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছেন আমাদের বাসায়। ডাঃ শফী আগেই বেশি করে চাল, ডাল, তেল, নুন কিনে ফেলেছিলেন। বলেছিলাম, 'এত কেন'? জবাবে বললেন, 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এসব কিছুই পাওয়া যাবে না'। বলেছিলাম 'যুদ্ধ তাহলে সত্যিই হবে? কিন্তু এহিয়ার সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা?' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'কেন যে শেখ সাহেব ওদের মিষ্টি কথায় ভুলে আলোচনায় বসতে গেলেন? এই আলোচনা ওদের একটা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

রাত প্রায় ১০টা। পথঘাট নিঝুম। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ইলেকট্রিসিটি নাই। সারা শহর অন্ধকার। বিকেলের দিকে কে একজন উড়ো ফোনে বলেছিল, 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।' শংকা সবার মনে। সেই অবস্থায় ডাঃ শফী গোসল করে এলেন (তাঁর চিরদিনের অভ্যাস খুব ভোরে আর রাতে ঘুমুতে যাবার আগে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা)। মন শান্ত ও স্থির করার জন্যই কি না জানি না, গীটারটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বাজাতে অনুরোধ করলেন। আমি রেগে বললাম, 'তোমার কি মাথা খরাপ হয়েছে? গান বাজনা করার মতো মনের অবস্থা আছে?' তাঁর মুখ কিন্তু প্রসন্নতায় ভরা। বললেন, 'তুমি ভীত ও বিচলিত। আমার কিন্তু আনন্দ হচ্ছে। বাঙালীদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এবার পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এইবার পাকিস্তানীরা পাততাড়ি না গুটিয়ে পারবে না, দেখে নিও। যাকগে, একটু বাজাও না?' তিনি আমাকে সহজ করতে চাইলেও আমি সহজ হতে পারছিনা। বুক কাঁপছে। হাত কাঁপছে। কি বাজাবো? সুর তো সব ভুলে যাচ্ছি। একটা নজরুল গীতির সুর বাজাতে চেষ্টা করলাম। বেসুরো হলো। তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অত কঠিন সুরে কেন? রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটি বাজাও, 'নাই নাই ভয় হবে জয়।' —বাজালাম।

রাত পোনে বারোটার দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হলে আমি বাচ্চাদের ও বাড়ির নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেও তিনি তেমন হননি। পরদিন ২৬ মার্চ, কলকাতা রেডিওতে 'জীবন থেকে নেয়া' ছবি থেকে গৃহীত সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে 'আমার সোনার বাংলা' গান ও ঘোষকের কণ্ঠে 'পূর্ব-পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু' হওয়ার ঘোষণা শুনে ডাঃ শফী উত্তেজনায় টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন, 'দেখে নিও, আমাদের দেশ এবার স্বাধীন হবেই।' বলতে বলতে আবেগে তাঁর চোখে পানি এলো।

ঢাকার সাথে টেলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। খবর রটেছে ঢাকায় ম্যাসাকার হয়ে গেছে। পুরুষরা সবাই বেরিয়ে পড়েছে খবরাখবর জানতে। কেবল বেলাল মোহাম্মদ ও ডাঃ শফী আছেন বাসায়। হঠাৎ বেলাল ভাই বললেন, 'আচ্ছা ভাবী, যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে পারে করবে, কিন্তু যারা পারবে না, তাদের করণীয় কি?' আমি নির্বাক চেয়ে রইলাম। তিনি আবার বললেন, 'ঢাকা রেডিও স্তব্ধ। চট্টগ্রাম রেডিওটা তো কাজে লাগাতে পারি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নাম দিয়ে চালু করে দিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব শুনে ডাঃ শফী আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বেলাল মোহাম্মদ বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় বলে গেলেন কথাটা এখন যেন প্রকাশ না করি। সেদিনই সন্ধ্যায় আবুল কাশেমের কণ্ঠ শোনা গেল, 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি।' অবশ্য আগেই বেলাল ভাই ফোনে বলেছিলেন 'রেডিওটা অন করে রেখো।' আমাদের উল্লাস আর ধরে না। ডাঃ শফী রেডিওর ভলিয়ুম এমন বাড়িয়ে দিলেন যে, বাড়ীর সামনে ভিড় জমে গেল। ডাঃ শফী বললেন, 'আমাদের এবারের কাজ হবে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, আকাশবাণী কেবল নিয়মিত শোনা নয়, যে যা শুনবে কাগজে টুকে রাখতে হবে, বেলালদের কাজে লাগাবে।' আমি আর আমার ভাই এহসান (এম. কম শেষ বর্ষের ছাত্র তখন, ডাঃ শফীর সাথে তাকেও হারিয়েছি।) মিলে তাই করলাম। শুনছি আর দ্রুত লিখছি। বেলাল ভাইসহ 'স্বাধীন বাংলা বেতার' কর্মীরা ফিরে এলো রাত সোয়া ১১টায়। ডাঃ শফীর এই নির্দেশ দারুণ কাজে লাগলো। রাত জেগে, মোমের আলোয় সেইসব খবর ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে তৈরী করা হলে আগামী দিন প্রচারের জন্যে কিছু মেটেরিয়ালস্। এইভাবে আমার বাসায় ডাঃ শফীর সম্পূর্ণ সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলা বেতারের কাজ চলতে লাগলো ২৯ মার্চ পর্যন্ত।

২৭ মার্চ। এইদিন ডাঃ শফী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আরেকটি দুঃসাহসিক কাজ করলেন। সন্ধ্যায় ন্যাপ নেতা চৌধুরী হারুন অর রশীদ এলেন আমার বাসায়। ব্যস্ত হয়ে ডাঃ শফীকে নিয়ে ঢুকে গেলেন চেম্বারে। দরজা বন্ধ করে কাটালেন কিছু সময়। শুনলাম টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ। অল্প পরে ডাঃ শফী আমাকেও ডেকে নিলেন ভিতরে। চৌধুরী হারুন বললেন, 'ভাবী আপনার এখানে আমরা কিছু জিনিষ রাখবো। কিছু এ্যামুনেশনস্।' আমি ভয় পেয়ে বললাম, এই মধ্য—শহরে, বাড়ীর দু'পাশে রাস্তা, চারদিকে অবাঙ্গালী, এ অবস্থায় এসব এখানে রাখা কি ঠিক হবে?' ডাঃ শফী বললেন, 'ভাবছো কেন? দেশকে মুক্ত করতে হলে বুকে সাহস রাখতে হবে। তাছাড়া ভয়ের কোনো কারণ নেই। হারুণ সব ব্যবস্থা করেছে। হ্যাঁ চৌধুরী হারুন এইভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন—আমার বাড়ীর দোতলাটা খালি পড়ে ছিল। সেটা একটা অবাঙ্গালীর নামে কোর্ট ষ্ট্যাম্প পেপারে বাড়ী ভাড়ার চুক্তিনামা ইংরেজিতে টাইপ করা হয়েছে। তারিখ দেয়া হয়েছে এক বছর আগের। বাড়ীর মালিক হিসেবে সই করলাম আমি, অবাঙ্গালী ভাড়াটিয়ার নাম সই করলেন চৌধুরী হারুন। রাত ৯টার দিকে দুটো ট্রাক এসে থামলো, তিন চারজন কর্মী ছেলেসহ চৌধুরী হারুন, ডাঃ শফী, আমার ভাই

এহসান সবাই মিলে গুলি ভর্তি কাঠের বাক্সগুলো ওপরে তুলতে লাগলো। আর তখন থেকেই অশুভ আশঙ্খায় আমার বুক কাঁপতে থাকে—থেকে থেকে।

২৯ মার্চ। চট্টগ্রাম শহর পুরো দখলে চলে গেল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর। পুরো চট্টগ্রাম তাদের দখলে চলে গেলে আমার আতঙ্কের কথা বেলাল ভাইকে জানিয়েছিলাম—তিনিও শংকিত হয়ে ডাঃ শফীকে অনুরোধ করেছিলেন ওগুলো সরিয়ে ফেলতে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের কাজে লাগাতে পারে, অতএব ওগুলো মেজর জিয়াকে দিয়ে দেয়া হোক। হারুণ ভাইকে প্রস্তাবটা জানিয়েছিলাম, তিনি রাজি হননি। আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম ডাঃ শফী বাইনোকুলার নিয়ে ছাদে সারাক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখেন পাকসেনাদের কোথায় কোথায় দেখা যাচ্ছে। আমার বাড়ীর পূর্বদিকে পাহাড়ের ওপর কোর্ট বিল্ডিং। পশ্চিমেও পাহাড়। তার ওপর সিআরবি অফিস আর 'ইপিআর'-এর হেড কোয়ার্টার। কোর্ট বিল্ডিং ওরা দখল করে কামান বাসিয়েছে ইপিআর হেড-কোয়ার্টারমুখো। যে কোনো সময় গোলা ছুঁড়লে আমার বাড়ীর ওপর এসে পড়তে পারে। এই ভয়ে অনেকেই আমাদের বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

এলো ৭ এপ্রিল। যে তারিখটি রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে আমার বুকের গভীরে। এইদিনেই হারিয়েছি আমি আমার একটি মাত্র ভাইকে, আমার সন্তানেরা হারিয়েছে ওদের স্নেহময় পিতাকে।

সকাল ৯টা। একটা জীপ আর একটা লরী এসে থামলো বাড়ীর সামনে। চোখের নিমেষে সৈন্যরা আমার বাড়ী ঘিরে ফেললো। তারপর ড্রইংরুমের দরজায় দুমদাম ধাক্কা। ডাঃ শফী নিজেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, ওরা জানতে চাইলো, 'ডাঃ শফী কে?' তিনি বললেন, 'আমি।' 'তুমি এখানে দাঁড়াও।' ওঁকে ড্রইংরুমে দাঁড় করিয়ে রাখলো। সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়লো বাড়ীর ভিতরে। প্রতিটি বাথরুম, রান্নাঘর তছনছ করে খুঁজলো। ভয়ে আমি কাঠ। যদি এবার দোতলায় যায় এবং তালা ভাঙ্গে তারপর। কিন্তু না ওরা দোতলায় গেল না। অফিসারকে কি যেন বলে লরীতে গিয়ে উঠলো, সাথে ডাঃ শফীকেও নিয়ে গেল সার্কিট হাউসে।

আমার আকুল অনুনয় বিনয়, বাচ্চাদের কান্না, কোনো কিছুতেই ওদের মন গললো না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে দুপুর ১২টার দিকে তিনি ফিরে এলেন। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না, ডাঃ শফী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বাচ্চারা আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে ওর আব্বাকে। সবার হাজার প্রশ্ন 'কি করে এ সম্ভব হলো?' ডাঃ শফী ম্লান হেসে বললেন, ফিরে এসেছি ব্রিগেডিয়ার বেগ-এর জন্যে। পাকিস্তানের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মীর্জা আসলাম বেগ ছিলেন ডাঃ শফীর রোগী। জেনারেল বেগ-এর দাঁতে ক্যান্সার হয়েছে, এই তথ্য মিথ্যে প্রমাণ করে তিনি তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। আমি এবার কেঁদে বললাম, এসেছো যখন আর এক মুহূর্ত এ বাড়ীতে নয়, এক্ষুনি চলো অন্য কোথাও। তিনি এবার রাজী। বললেন, 'নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু এই দিনের বেলা বেরুতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা। সবার দৃষ্টি এখন আমাদের দিকে। সন্ধ্যা হোক।' দুপুর ১টা। ভাত দেয়া হয়েছে টেবিলে। বাচ্চাদের নিযে তিনি সবে খেতে বসেছেন। আবার গুলির শব্দ, বেরিয়ে দেখি ৪০/৫০ জন সৈন্য আমার বাড়ী

আবার ঘিরে ফেলেছে। এরা অন্য গ্রুপ। সাথে দু'জন অফিসার। সৈন্যরা আবার ঢুকে পড়লো বাড়ীর ভিতর। ডাঃ শফী খাওয়া ছেড়ে উঠে গেলেন ওদের সামনে। আমিও গেলাম ওঁর সাথে। আমার ভাই এহসানও এসে দাঁড়ালো পাশে।

ওরা বললো, 'তুমি আর তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে এলিগেশন আছে। তোমরা আওয়ামী লীগ করো। গোপন রেডিওর সাথে যুক্ত, তোমাদের এখানে গোপন অস্ত্রও আছে।'

'শেষের কথায় বুকটা ধড়াস করে উঠলো। এত যে সাহসী ডাঃ শফী, তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ আমিই সাহসের সাথে প্রতিবাদ করলে ওরা হেসে একটা টাইপ করা কাগজ খুলে ধরেছিল আমাদের চোখের সামনে। হ্যাঁ, এক, দুই করে এগারোটি অভিযোগ রয়েছে আমাদের নামে। আর তাতে স্বাক্ষর রয়েছে আমাদের অবাঙ্গালী প্রতিবেশী দুজনের, তার মধ্যে একজন ডাক্তার। এদেরকেই ডাঃ শফী একদিন বাঁচিয়েছিলেন। সৈন্যরা এবার দুপদাপ শব্দে উঠে গেল দোতলায়। ওরা দুমদাম শব্দে তালা ভাঙ্গছে। সে সময়ের অনুভূতি প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আমরা মৃত্যুর প্রহর গুনছি। তালা ভাঙ্গা শেষ হতেই ওরা উত্তেজনায় ছুটে এলো। তড়বড়িয়ে মেজরদের কি বলতেই 'হোয়াট' বলে হুঙ্কার ছাড়ল মেজর। আগুন ঝরছে ওদের চোখে। মুখে কুটিল হাসি। বললো, 'চলো ওপরে।' আমরা তিনজনই ওদের সাথে গেলাম ওপরে। মেজর বোখারী মুচকি হেসে বললো, 'মিসেস শফী তুমি বলেছো তোমার ভাড়াটিয়ারা এসব রেখে গেছেন গত বছর ফেব্রুয়ারীতে। দেখ তো প্রতিটি বাক্সের ওপর কত তারিখ লেখা আছে?' আমরা তিনজনই প্রচণ্ড বিস্ময়ে দেখলাম প্রতিটি বাক্সের ওপর লাল কালিতে ইংরেজিতে লেখা ২৭.৩.১৯৭১। ওরা এবার ডাঃ শফী আর এহসানকে দিয়েই বাক্সগুলো তোলালো ট্রাকে। আর আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে বললাম, 'হারুন ভাই, এ আপনি করলেন?' আমরা তৈরী হলাম। কিন্তু না, ওরা আমাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করলো না। গুলির বাক্সগুলো ট্রাকে তোলা হলে আমাদের তিজনকেই বললো জীপে উঠতে। আমার ভাই এহসান অনুমতি চাইলো ওদের কাছে–'আমি একটু অজু করে আসি।' ওরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বললো, 'যাও।' আমি বোবা কান্নায় ইশারায় বললাম, তুই আর এখানে আসিস না ভাই, পালিয়ে যা।

কিন্তু না, এহসান ঠিক অজু করে লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরে এলো। বাচ্চাদের কান্না চিৎকার পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে গেলাম জীপের কাছে। উঠতে যাব, দুই মেজর পাঞ্জাবী ভাষায় নিজেরা কি যেন বললো; তারপর একজন আমাকে বললো উর্দুতে, 'মিসেস শফী—তুমি এখন থাকো। তোমার বাচ্চারা বড় বেশী কাঁদছে। প্রয়োজন হলে পরে নেব তোমাকে। কিন্তু খবরদার পালাবার চেষ্টা করবে না। তাহলে তোমার স্বামী আর ভাইকে তো পাবেই না—বাড়ীটাও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেব।'

এই প্রথম আমি মেজরের দুই হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম, 'তোমরা তো আমার ভাই আর স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছ, এই ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আমি কোথায় যেতে পারি? কিন্তু তোমরা কথা দিয়ে যাও ওদের ফিরিয়ে দেবে?' ওরা

বলেছিল, 'আমরা কথা দিচ্ছি ওরা ফিরে আসবে।' পাঠান পাঞ্জাবীরা নাকি মিথ্যা কথা বলে না। তবু ঐ সময় ওদের ঐ কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও মনে হলো ডাঃ শফী যেন বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তাঁর মুখ সামান্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল প্রচ্ছন্ন আশায়। আমাকে শেষ কথা বলেছিলেন, 'তুমি ভেবো না, ঘরে যাও বাচ্চাদের কাছে। দেখো আমি আবার ঠিক ফিরে আসবো।' না, তিনি আর ফিরে আসেননি। এর পরের কাহিনী এক সুবিশাল বিস্তৃত অভিজ্ঞতার কাহিনী। দেশের মুক্তিযুদ্ধ আর আমার জীবন যুদ্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যে স্মৃতিসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অবগাহন করে আমি আজো এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি আমার একটিমাত্র ভাই ও আমার স্বামী ডাঃ শফী সহ সকল দেশপ্রেমিক শহীদরা ফিরে আসবেন এই বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে।

পান্না কায়সার তাঁর প্রিয়তম স্বামী সাংবাদিক–লেখক শহীদুল্লাহ্ কায়সার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেনঃ

আমার সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয় যেজন তাঁকে নিয়ে কিছু লিখার জন্য যখন বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হলো; আমি বুঝতে পারিনি, কাজটা আমার জন্য কত কঠিন।

অনেক সময় শমি অমি ওদের বাবা সম্পর্কে অনেক কিছু শুনতে চায়, জানতে চায়। কিন্তু আমি বলতে গিয়ে থেমে যাই। আমি জানি ওদেরকে ওদের বাবার আদর্শে গড়ে তুলতে হলে বাবার গল্প ওদের শোনা দরকার। মনে হয় যা কিছু স্মৃতি তা কিন্তু আমার। এখানটায় আমি বড় স্বার্থপর।

শহীদুল্লাহর সঙ্গে দুই বছর দশ মাসের বিবাহিত জীবনের পুরো সময়টাই ছিল আনন্দের আর উচ্ছ্বাসের। যে মানুষটা আমাকে এক ভুবন থেকে আরেক ভুবনে নিয়ে এসে জীবনের আরেক শিক্ষা দিয়েছে। রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়েছি। ওঁর পাশে এসে যখন দাঁড়ালাম দেখলাম, পৃথিবীটা অনেক বড়। ওঁর সংস্পর্শে এসে জীবনকে আমি নতুন করে বুঝতে শিখলাম।

যাঁর সঙ্গের গ্রথিত স্মৃতিগুলো নিয়ে আজও আমি নির্ভয়ে পথ চলি। ওঁর স্মৃতি, ওর প্রতিটি কথা আমাকে এমন করে ঘিরে রেখেছে—আমার কখনও মনে হয় না আমি একা। কত শত স্মৃতি কত শত ঘটনা এসে ভিড় জমায়—ভাবতে গেলে ভাবনা শেষ হবে না—লিখতে গেলে ফুরাবে না। বলতে গেলে আমি একদিক দিয়ে ভাগ্যবতী। আমি সোনার মানুষটির সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি। তাঁর সন্তানদের যারা এ সান্নিধ্যের পরম সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে—সেই দালাল ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে আমার ও আমার সন্তানদের আজন্মের ঘৃণা দিয়েই শুরু করলাম।

আমার জীবনে দুটো কারফিউ এসেছিল। '৬৯ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারীর কারফিউতে আমি শহীদুল্লাহ্ কায়সারের হাত ধরে এক সুন্দর জীবনে প্রবেশ করেছিলাম, আর '৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বরের কারফিউ–এ শহীদুল্লাহ্ আমার সুন্দর জীবন থেকে হারিয়ে গেল। আর আমি ছিটকে পড়লাম—এক কঠিন

সংগ্রামময় জীবনে। এখানে বেঁচে থাকার যুদ্ধ। সমাজের অনেক প্রতিকূল অবস্থায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ। ছেলে মেয়েদের ভালভাবে মানুষ করে গড়ে তোলার যুদ্ধ। আমার এ জগতে দুঃখ বেদনা যুদ্ধ আর সংগ্রামের একমাত্র সাথী শহীদুল্লাহ্র স্মৃতি। এটকুই এখন আমার বেঁচে থাকার শক্তি।

দোষে গুণেই একজন মানুষ। কিন্তু কোনদিন শহীদুল্লাহ্র কোন আচরণ আমাকে কষ্ট দেয়নি। শুধু আমি কেন—এ কথা সকলেই বলবেন। বিচিত্র গুণের সমাবেশ ছিলো মানুষটির মধ্যে। আমি যতই দেখেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। শ্রদ্ধায় মাথা আমার নত হয়ে যেত। পিতা রূপে, বন্ধু রূপে, ভাই রূপে, আত্মীয় রূপে, স্বামী রূপে শহীদুল্লাহ্ সকলকে হৃদয়ের কাছে টেনে নিয়েছে। মানুষকে সহজে আকর্ষণ করার আশ্চর্য শক্তি ছিল ওঁর। এ কথা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করবেন।

প্রফুল্ল চিত্তের এ মানুষটি সারা দিন যে অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে থাকতো—দেখে মনেই হত না।

সকাল সাড়ে পাঁচটা ছটায় ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম সেরে সবগুলো দৈনিক পত্রিকা এবং বড় এক পট চা নিয়ে যখন খোলা বারান্দায় বসতো তখন ওর সাথী থাকতেন আমার শাশুড়ি। সারাদিনের পারিবারিক কাজ, বা পারিবারিক সমস্যা নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করতো। কোথায় কোন আত্মীয়ের অসুখ—কোন আত্মীয়ের কি অসুবিধা—এসব আলোচনায় সকালের অনেকটা সময় কেটে যেত। শহীদুল্লাহ্র মতো অন্য কোনো ছেলেকে মাকে এতো ভালবাসতে দেখিনি। কাজে বের হবে; মা'র ঘরে ঢুকে হয়ত দেখল মা বাথরুমে। যতক্ষন না মা বাথরুম থেকে বের হবেন শহীদুল্লাহ্ মা'র ঘরে পায়চারি করতে থাকবে। একান্নবর্তী পরিবার। স্বভাবতই বড় পরিবার। খাবার সময় সবাইকে এক সঙ্গে খেতে হত। টেবিলে অনেক সময় জায়গা হত না—তবুও খাওয়ার সময় একপাশে আমাকে, আরেক পাশে মাকে নিয়ে বসত। মাকে নিজের হাতে মাছটা বেছে দেয়া, পছন্দের খাবারটা নিজেই তুলে দিত এবং সঙ্গে আমাকেও। সবাইর সামনে আমাকে তুলে দিতে গেলে—আমি খুব লজ্জা পেতাম—কিন্তু ওঁর কাছে মনে হত এটাও ওঁর একটা দায়িত্ব। পাশেই জহির রায়হানকে বলত, জহির, সুচন্দাকে একটু তুলে দাওনা। বাড়ীর সকলে ওদের বড়দাকে যে কি ভালবাসত—এমন সচরাচর দেখা যায় না। বড়দা ছিল পরিবারের মধ্যমণি।

জহির হয়ত শুটিং করে অনেক রাতে বাড়ী ফিরল—তার জন্য আমার ঘরেও একজন উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করত—বুঝতে পারতাম। জহির ফিরে আগেই ঢুকত বড়দার ঘরে। হয়ত রাত তখন দেড়টা বা দু'টো। শুরু হয়ে গেল ওদের রাজনীতি, সাহিত্য, ছবি ইত্যাদি নানান গল্প।

প্রথম প্রথম আমার কাছে ব্যাপারগুলো অবাক লাগত কিন্তু পরের দিকে এসব গল্প শুনতে আমারও ভাল লাগত।

শহীদুল্লাহ্ অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করত। কিন্তু ততক্ষন আমাকে পাশে থাকতে হত। যা কিছু লিখবে—শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেটা পড়তে হত। শুধু তাই নয়, লেখা পড়ে মন্তব্যও করতে হত। অনেক সময় সংবাদের জন্য

সম্পাদকীয় লিখছে—কি বিষয়ে লিখছে তাও জানানো চাই, এমনকি অনেক সময় সেটা পড়তে হত। আমি কিছু বুঝতাম কিছু বুঝতাম না। এখন বুঝি আসলে শহীদুল্লাহ্ আমাকে ওঁর মত করে তৈরী করতে চেয়েছিল। বাইরের অনেক মিটিং—এ, এমনকি ঢাকা শহরের বাইরের মিটিংগুলোতেও আমাকে জোর করে নিয়ে যেত। আমি বলতাম এসবের আমি কি বুঝি--। উত্তরে বলত মানুষ শুনতে শুনতে অনেক শেখে—ঘর থেকে বের না হলে শুনতেও পাবেনা--শিখতেও পারবে না। এ ভাবে চলতে চলতে আমি যে কখন ওঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথী হয়ে গেলাম—বুঝিনি। যখন ও হারিয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম।

মনে পড়ে ২৫শে মার্চের ঘটনার কথা। চারিদিকে গোলাগুলি। শহীদুল্লাহ্ বাসায় নেই। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেও খোঁজ পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখি রাত দু'টোর দিকে শহীদুল্লাহ্ ফিরে এলো। ওকে অক্ষত এবং জীবিত অবস্থায় দেখে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরছিল না। ঘরে ঢুকে হু হু করে কেঁদে উঠল—আমার দেশের মানুষগুলোকে ওরা শেয়াল কুকুরের মত করে মেরে চলেছে। এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে আঁচ করেছিলাম। বন্দুকের নলের মুখে ঘুমন্ত মানুষকে ছেড়ে দিয়ে আমরা নেতারা দেশ ত্যাগ করব—আর দেশের মানুষগুলোর কি হবে? সে আরো অনেক কথা। সে কথা আজ নাই-বা লিখলাম। ওঁর ওপারে না যাবার এটাও অন্যতম কারণ। ওঁর নিরাপত্তার জন্যে আমার শাশুড়ি অনেক কান্নাকাটি করেছেন। কিন্তু ওর প্রথম থেকে একই কথা আমার কিছু হবেনা—আর মরতে যদি হয় সবার সঙ্গেই মরব।

২৭শে মার্চ কারফিউ কিছুক্ষণের জন্য উঠেছিল। আমাকে বা বাসার কাউকে না বলেই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল। জগন্নাথ হল, শিশু মতিউর পার্ক, রাজারবাগ ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে সব দেখে এলো। রাস্তার ধারে ছোট ছোট দোকানগুলো এ ফাঁকে খুলেছিল। শহীদুল্লাহ সেসব দোকান থেকে জিনিষপত্র কেনা—কাটা করে বন্ধুর বাড়ী, আত্মীয়ের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলো। কে কোথায় কিভাবে আছে, বেঁচে আছে কিনা—এ দায়িত্ব সেরে তবে সে বাড়ী ফিরল। বোধকরি তাদেরও সে কথা মনে আছে। সমগ্র জাতি যেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি সেখানে শহীদুল্লাহ্ নিজের কথা না ভেবে—অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন।

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা ওঁকে উদ্বিগ্নই দেখেছি। রাতে মোম জ্বালিয়ে লিখত। দিনের বেলায় সেটাকে লুকিয়ে রাখত। আমাকে সব সময় বলত, আমি না থাকলে—দুঃখ করো না। আমি থাকব আমার সাহিত্যে—আমি থাকব দেশের মানুষের সাথে। কথাটা সেও বাড়িয়ে বলেনি—আমি আজ পলে পলে অনুভব করি। তেমনি নিশ্চয়ই অনুভব করেন দেশবাসীও।—

জহির রায়হান যেদিন ভারতে চলে যায়—ওঁর বড়দার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল--কাঁদতে কাঁদতে চোখটা একেবারে জবাফুলের মত হয়ে গেল--চলে যাবার ব্যাপারটা গোপন বলে—আমার কাছেও সরাসরি কিছু বলতে

পারছিল না। দুই ভাই অনেকক্ষণ জড়াজড়ি করে প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুই ভাইয়ের যে এ—ই শেষ দেখা তা কে জানত। তখন শহীদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি ''আমি রইলাম এ দেশের মাটিতে—'' এ দেশের মাটির পরে যে এত টান যে এ দেশের মাটিতেই ও মিশে আছে।

যুদ্ধ যখন শুরু হল, আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলত—''আমি দুটো স্বাধীনতা দেখব—এ স্বাধীনতার জন্য কতদিন অপেক্ষা করে আছি। আর তুমি দেখবে মাত্র একটি স্বাধীনতা—।'' কিন্তু দুটো স্বাধীনতা যে ওর আর দেখার সেরাগ্য হল না।

যুদ্ধের মধ্যে সারা ঢাকা শহর ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে মোম জ্বালিয়ে হয়ত আমি বাচ্চাদের কোন কাজে ব্যস্ত--টেনে আমাকে নিয়ে যেত টেবিলের কাছে, 'সংবাদ' যেদিন প্রথম বের হবে—হেড লাইন কেমন হবে—কি লিখবে—। আমাকে অনর্গল এসব বলে আসলে মনের অস্থিরতাই কমাত। কিন্তু সেই 'সংবাদ'ই যে ওকে নিয়ে হেড লাইন করবে, বিধাতা তা আগেই ঠিক করে রেখেছে। মানুষ শহীদুল্লাহ্, স্বামী শহীদুল্লাহ্, বন্ধু শহীদুল্লাহ্—এমন মহৎ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আমি আসতে পেরেছি এ—ই আমার গর্ব।

বিয়ের পর মাত্র একবার তিনদিনের জন্য আমাদের গ্রামের বাড়ী গিয়েছিল--গ্রামের লোক এখনও ভুলতে পারে না—আর আমি কেমন করে ভুলি?

অধ্যাপক জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা পঁচিশে মার্চ হানাদার বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হবার পর তাঁর স্ত্রী বাসন্তি গুহঠাকুরতাকে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে বলেছিলেন। 'একাত্তরের স্মৃতি' গ্রন্থে বাসন্তি গুহঠাকুরতা সেই মর্মস্পর্শী ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনে, সাড়ে বারটা—একটার দিকে গোলাগুলির শব্দে উঠে গেলাম। বললাম, ''যুদ্ধ কি লেগেই গেল?'' আমার স্বামী বললো, ''ও কিছু নয়—ছেলেরা প্রাকটিস করছে। শব্দ ক্রমেই কাছে, খুব কাছে এগিয়ে এল। তখন দোলাকে আমার ঘরের বিছানায় নিয়ে এলাম। ওঁর ঘরের বাতি নিবিয়ে দিলাম, সবুজ বাতিটা জ্বলতে থাকলো। একটু পরেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ হতে থাকলো। সে কী শব্দ! আমাদের বাড়িটা কেঁপে কেঁপে ভূমিকম্পের মতো ঝন্ ঝন্ কাঁচের শব্দ হতে থাকলো। স্বর্ণকে আমাদের ঘরে আসতে বলে আমরা তিনজনে খাটের তলায় বেঢকভার বিছিয়ে মাথা পেতে থাকলাম। স্বর্ণ এলো না। বলে, ''মরি, মরূম, আমার ঘরেই মরূম।'' গোপালকেও ডাকা হয়েছিল। কেউ এলো না। দোলার বাবা বললো, ''বুঝলি দোলা, যুদ্ধ লেগে গেল। যুদ্ধ হলে এরকম করে ট্রেঞ্চে শুয়ে থাকতে হবে। খাওযা, শোওয়া, পায়খানা—সব এক জায়ায়।'' এতো সাধারণ গোলাগুলি না! অনেক ভারী শব্দ। জগন্নাথ হলের আকাশ আলো হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, আর ভারী মেশিন গানের গুলীতে 'হল' তোলপাড়। কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ নেই, হবেই বা কোথেকে, কামানের

শব্দে সব মানুষ, পাখির শব্দ ডুবে গেছে। মাঝে মধ্যে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জগন্নাথ হলের মালীদের গরুগুলো অসহায় চিৎকার করছে। এ এলাকায় বৃক্ষরাজির সব কাক উঠে কোথায় যে গেল! আমি খাটের নীচে ছটফট করছি, উঠে একটু চুপি দিয়ে দেখতে চাই। আমাকে বাপ মেয়ে ধরে রাখছে। গোলাগুলি একটু নিস্তেজ হলে আমি সাপের শিসের মতো হিস্‌হিস্ শব্দ শুনেই লাফিয়ে উঠলাম। ওরা আমাকে আটকাতে পারলো না। এক লাফে আমি গেটের দিকের জানালা দিয়ে পর্দা চোখের সমান করে ফাঁক করে চুপি দিলাম। আমার স্বামী হাত টেনে ধরে বলছে, ''মাথা নীচু কর, গুলী লাগবে।'' আমি দেখলাম জীপসহ একটা মিলিটারী গাড়ির বহর রোকেয়া হলের দিক থেকে আস্তে আস্তে এসে মোড়ের ব্যারিকেডে থেমে গেল। একটা অফিসার আমাদের গেটের শিকলটা একটানে ছিঁড়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানগুলো বন্যার স্রোতের বেগে ৩৪ নম্বর বিল্ডিংয়ের সবগুলো তলায় উঠে গেল। আর প্রত্যেক তলায় দু'টি ফ্ল্যাটের চারটি দরজায় দুড়ুম দুড়ুম লাথি মারতে লাগলো। সে শব্দের কি গতি! গোলাগলির শব্দে কান বধির হয়ে গেল যেন। এদিকে অফিসারটা গেটের কাছে আমার মেয়ের ঘরের জানালার কাঁচ ভেঙে, বেয়োনেট দিয়ে জানালার জাল কেটে, পর্দা ফাঁক করে দেখলো। মেয়ের ঘরে সবুজ বাতি জ্বলছিল, আর দক্ষিণের বাগানে আলো জ্বালা ছিল—কোন ঘর পুরো অন্ধকার হয়নি। তাই আমাদের মাথা খাটের তলায় থাকলেও পা দেখা যাচ্ছিল। যেই না পা দেখলো, অমনি দৌড়ে পশ্চিম দিক দিয়ে আমার বাগানের মধ্যে হাজির। ব্যাপারটা মুহূর্তের। আমি আলনা থেকে পাঞ্জাবী নিয়ে আমার স্বামীকে দিয়ে বললাম, ''তোমাকে arrest করতে এসেছে, তৈরী হয়ে নাও।'' আমাদের দু'জনের ধারণা তাঁকেই যেন ওরা চায়। সে বললো, ''দোলাকে, ডইংরুমে শুইয়ে দাও।'' গোপাল গ্যারাজের দোতলার ঘর থেকে আমাকে দরজা খুলতে মানা করছিল—কিন্তু না খুলে পারলাম না, দোলা ডইং রুমে বুকে বালিশ চেপে গিয়ে দেখে সেখানেও দরজা ভাঙছে। দৌড়ে বারান্দায় এলো। এদিকে অফিসারটা একটানে রান্না ঘরের দরজা খুলে স্বর্ণকে কনুই দিয়ে এক ধাক্কায় বাগানে ফেলে বারান্দায় ঢুকে পড়লো। আমি সামনে গেলাম। বললো, ''প্রফেসর সাহেব হ্যায়?'' মিথ্যে বলে লাভ নেই। বললাম, ''হ্যায়।'' ও বললো, ''উন্‌কো লে যায়গা।'' আমি ওর হাত ধরে বললাম, ''কাহা লে যায়গা ভাই?'' ও আমার দিকে না চেয়ে মাটির দিকে চেয়ে আমাদের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চললো আর টেনে টেনে বললো, ''লে যায়গা।'' আমি ওর পিছে চলছি, বাড়ি যেন ওর। বললাম, ''তুমিই তো ঢুকেছ, ওরা কেন এখনও সামনের দুই দরজা ভাঙছে?'' তখন ও নাম ধরে বললো, ''হাম ইধার পর হ্যায়। ইয়াকুব। দরোজা মত ভাঙ্গো।'' সঙ্গে সঙ্গে লাথি মারা বন্ধ হয়ে গেল।

আমার শোবার ঘরে যেতে যেতে ও বললো, ''আওর কই যোয়ান আদমি হ্যায়?'' আমি বললাম, ''হামারা একই লাড়কি হ্যায়।'' ''ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, লাড়কি কো কোউন ডর নেই হ্যায়।'' শোবার ঘরে ঢুকে দেখি জ্যোতির্ময় পাঞ্জাবী হাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ও তার বাঁ হাতটা চেপে ধরলো, আমি

পাঞ্জাবীটা পরিয়ে দিয়ে বললাম, ''তোমাকে অ্যারেষ্ট করতে এসেছে!'' মিলিটারী জিজ্ঞেস করলো, ''আপ প্রফেসার সাব হ্যায়?'' আমার স্বামী ভারী গলায় বললো ''Yes'' ''আপকো লে যায়গা।'' জ্যোতির্ময় দৃঢ়ভাবে ভারী গলায় বললো, ''Why?'' আর কথা নয়, হিড় হিড় করে টেনে পেছনের বাগান দিয়ে নিয়ে গেল। আমি স্যাণ্ডেল জোড়া নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পেলাম না। ফিরে যখন এলাম বারান্দার জালের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম মিসেস মনিরুজ্জামান কয়েক সিঁড়ি ওপরে দাঁড়িয়ে, নীচে ল্যাণ্ডিংয়ে ডঃ মনিরুজ্জামান, তাঁর ছেলে, তাঁর ভাগনে ও আরেকজন ভদ্রলোককে জোয়ানরা প্রাণপনে টানাটানি করছে। মিসেস মনিরুজ্জামান বললেন, ''দেখছেন দিদি, এরা আমাদের লোকজনদের কী রকম টানাটানি করছে?''

ভদ্র মহিলার সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ। তারা তো আমাদের তেতলায় এসেছেন মাত্র মার্চের পাঁচ তারিখে। আমি বললাম, ''দিয়ে দেন, আপনার সাহেবকে, নইলে মেরে ফেলবে, আমার সাহেবকে তো নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে।'' এমন সময় বাইরে দু'টো গুলী হলো। আমার মেয়ে দু'কান চেপে ধরলো। অফিসার আবার ফিরে এসে আমার খাবার ঘরের তালা ভাঙতে লাগলো। গডরেজের তালা, আমি খুলে দিলাম। তারপর পর পর তিনটি বাথরুম চেক করলো। দোলার বাথরুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, ''মুজিবুর রহমান কাঁহা রতা হ্যায়?'' দোলা বললো, ''We don't Know him. অমনি সে এমন জোরে এক ধমক লাগালো—দোলা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মিলিটারীটা আবার বাগান দিয়েই চলে গেল। আমি যখন মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় তখনই আমাদের সিঁড়িকোঠায় পটপট গুলী হলো আটটা। আমি দৌড়ে জালের দরজায় গিয়ে দেখি লেফট রাইট করে জোয়ানরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ডঃ মনিরুজ্জামান আমার ডইং রুমের দরজার পাশে পড়ে আছেন, আর তিনজন ৩৪ বি-এর দরজার পাশে হুমড়ি খেয়ে কোঁকাচ্ছে। রক্তে ভাসাভাসি। মিসেস জামান কেঁদে বলছেন, ''কি হলো দিদি? আপনি যে বললেন মারবে না, এখন যে মারলো?'' কিইবা জবাব দেবো তাকে? তারা সবাই পানি চাচ্ছে। ডঃ মনিরুজ্জামান গোঙাচ্ছেন।

মিসেস জামান সবাইকে পানি খাওয়াচ্ছেন। এমন সময় মোড়ের ব্যারিকেড পরিষ্কার হলে সেই মিলিটারী বহর এগারটা ট্রাক জীপ নিয়ে, শহীদ মিনারের দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এত কম সময়ে ওরা কতগুলো বীভৎস কাজ করে গেল। গাড়িগুলো চলে গেলে স্বর্ণ গোপালের ঘর থেকে এসে বললো, ''দিদিমনি। দাদাবাবু কই?'' বললাম ''এ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেছে, তুমি দোলাকে দেখ।'' আমি নিশ্চিত—তাকে প্রথম গাড়িটাতে নিয়ে গেছে। আবার আমি তারের জালের দরজায় যেতেই মিসেস জামান অনুরোধ করলেন, ''দিদি আমার সাহেবকে একটু হাসপাতালে নিয়ে যান।'' আমি বললাম, ''শুনছেন না, মাইক দিয়ে ভ্যানে বলে যাচ্ছে কারফিউ?'' আমি আবার মেয়ের কাছ গেলাম। এর মধ্যেই মিসেস জামানের আবার হাঁকডাক, ''ও দিদি, আপনার সাহেবকে তো গুলী করে ফেলে রেখে গেছে বাইরে। আমি পানি খাইয়ে এলাম। তিনি ভাল আছেন, কথা বলছেন। যান, হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি বাঁচবেন।'' দোলা তখন বললো, ''মা আমি শুনেছি, বাবা দোলা বলে ডেকেছেন।'' তখন মা, মেয়ে স্বর্ণ বাগান দিয়ে দৌড়ে

গেলাম। দেখি বাইরের গেট বরাবর আমাদের বিল্ডিংয়ের পাশে ঘাসের উপর চিৎ হয়ে জ্যোতির্ময় পড়ে আছে। আমাদের দেখেই ভারী গলায় বললো, ''তোমরা শোননি? আমি যে তোমাদের ডেকেছি?'' দোলা বললো, ''সে শুনেছে।'' ''আমাকে তো ঘাড়ের ডানদিকে গুলী করেছে, আমার শরীর প্যারা-লাইসিস হয়ে গেছে, আমাকে তুলে ঘরে নাও।''

জ্যোতির্ময় কখনো কোন বক্তৃতা শুনতে যেতো না। সে বলতো, ''বক্তৃতা তো কাগজে পড়েই জানা যায়।'' কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় ৭ই মার্চ বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল। সকাল থেকেই আমাদের সকলের মনে উত্তেজনা--শেখ সাহেব কি বক্তৃতা দেবেন তাই নিয়ে। যে আমি স্কুলে না যেয়ে পারি না, সেই আমিও সেদিন গেন্ডারিয়া গেলাম না। কিন্তু রেসকোর্সে যাই কেমন করে। ময়দানে হাজার হাজার মানুষের মাথা গিজ গিজ করছে। কার্জন হলের বর্তমান দোয়েল চত্তর দিয়ে বাংলা একাডেমী পর্যন্তও কোন রকমে যাওয়া যায় না, ময়দানতো দুরের কথা। আমরা ঐ রাস্তায় যেতে না পেরে গাড়ি ঘুরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে গাড়ি রেখে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাঙা দেয়ালে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ময়দানের শ্রোতাদের কথাও শোনা যাচ্ছে। একজন বয়স্কা বৈষ্ণবীকেও স্বদেশ প্রেমের গান গাইতে দেখলাম। দেখতে দেখতে আমাদের চারপাশে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আমাদের চেনাশুনা বন্ধুদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মসজিদের ভেতরে নীচু দেয়ালে হোন্ডা রেখে কাবুলি পোশাকে একজন বসে, মনে হলো, আমাদের প্রতিটি কথা শুনছে। তাকে সেদিন ইনটেলিজেন্সের লোক মনে হয়েছিল। হাসপাতালে তাকে দেখে আজ কোন সন্দেহ থাকলো না।

এতদিনে আমার ভয় হলো--কারা আসে, কারা যায়, কি বলে, ওরা লক্ষ্য করছে। অধ্যাপকরাও কতজন যে এসেছেন সারা দিনে, তা আমি সবাইকে দেখিনি। মা, মেয়ে, স্বর্ণ আমরা পালা করে ওয়ার্ডে থাকছি। গোপাল বললো ২৯ তারিখে এসেছিল গিয়াসউদ্দিন—তার চোখে জল ছিল। হাসপাতালে ফিজিওলজির প্রফেসর বন্ধু ডঃ শহীদুল্লাহ তো একবার বেডের কাছে এসে আর কাছে আসেননি। কাঁচের জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রায়ই। হলের সহকর্মী শিক্ষক, কর্মচারীরা অনেকেই এসেছেন। ধীরেনদা-দারোয়ান ২৭শের সকালে বাসায়, বিকেলে হাসপাতালে দেখে গ্রামে চলে গিয়েছিল, ৩০ তারিখে মৃত্যুর পরে আবার এলো, ফুল দিলো।

হাজারীরা ফেরার পথে দোলাকে ইন্দিরা রোডে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল, রাতে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। আবার কার্ফিউ শুরু হয়। হাসপাতালের বাড়তি লোকের ভিড় কমে। ডাক্তার নার্সদের কর্মতৎপরতা বাড়ে। সন্ধ্যার পর ওয়ার্ডের টেলিভিশনটা চালিয়ে দেয়। ১ নম্বরে বেডের শিয়রে একটা আলমারীর উপরে T V সেটটি। এদিকে আমার স্বামী গুণ গুণ করে গাইছিলো আগে থেকেই—বোধ হয় জ্বর হয়েছে—জ্বর হলে সে সব সময় গান গাইত। আজ গাইছে, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া''। তাঁর বাবার প্রিয় একটি গান। কোন এক সময়ে T.V-তে ভায়োলিন বাজছিল—ভারী সুন্দর সুরে। তখন জ্যোতির্ময় চোখ বুজেই বলছে—''How lovely! how nice! wonderful!

full of life, full of vigour. আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পরে বললাম, ''একটা বুড়ো সাহেব টেকো মাথা ঘুরে ঘুরে ভায়োলিন বাজাচ্ছে।'' তখনও দেখি ঐ কাবুলি পোশাকটা পশ্চিমের বেডের কোনায় বসে আছে।

রাত গভীর হলে আবার ভুতের লীলাখেলা শুরু হয়, এবার শহীদ মিনারে নয়, একটু বা অনেকটা দুরে, উত্তর পশ্চিম কোনায়। ওয়ার্ডে বাতিও নিভলো, আবার যুদ্ধ, মনে হলো যুদ্ধ, থেমেও গেল এক সময়। শেষ রাতে অনেক আহত এলো হাসপাতালে। আমাদের করিডোরে, পরপর খাটিয়ায় ভরে গেল। জোয়ান পুষ্ট চেহারার হ্যাফ-প্যান্ট পরা--কারুর গায়ে গেঞ্জিও আছে। এরাই কি ই.পি আর? কী তাদের স্বাস্থ্য, জোয়ানরা রক্তে লেপ্টে আছে। কারুর তখনও তাজা রক্ত ঝরছে। শুকনা রক্তের গন্ধটা করিডোরের বদ্ধ দেয়ালে আটকে গিয়ে নরকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবুও এ নরকে আমাদের দুঃখের চতুর্থ রজনী পোহাল।

রাত পোহালে ২৯ তারিখে প্রথম এলেন আমার স্কুলের সেক্রেটারী ডাক্তার ওয়াহিদ। তিনি ২ নম্বর বেডের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন--"X-Ray হয়েছে?'' আমি বললাম ''না। এখানে X-Ray Plate নেই। গৌরাঙ্গ মিত্র বলে যে ছাত্রটি (এখন ও হলিক্রস নটরডেমে বিজ্ঞান পড়ায়) কাল বেরিয়ে গেছে প্লেট কিনতে, এখনও ফিরে আসেনি।'' ডাক্তার সাহেব তখন কোথায় যেন গেলেন। এসে বললেন—''আধ ঘন্টার মধ্যে X-Ray হবে''। তারপর ''আসুন'' বলে আমাকে একটা ঘরের দরজায় নিয়ে বলে, ''এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন''। একজন লোককে দেখিয়ে বললেন, ''এ ঘর থেকে বেরুলেই লোকটাকে টেনে নিয়ে যাবেন।'' তারপর তিনি লেগে গেলেন ই.পি. আর-দের সেবা করতে। এ-রুম ও-রুমে ঢুকে তুলা নিয়ে ওদের ক্ষতের রক্ত মুছে, কাউকে তুলা লাগিয়ে, কাউকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। আমিও ট্রে ধরে সঙ্গে ঘুরছি। সেদিন বিকেলেও আবার এলেন। তিনি ডাক্তার, তিনি জানেন জ্যোতির্ময় বাঁচবে না। বেলা হলে ডঃ মতিউর রহমান এলে বললাম ''আমার স্বামীর জ্বর বেশি বোধ হয়''। জ্বর হলে উনি গান করেন। তখনও জ্যোতির্ময় গান গাইছিল। ডাক্তার প্রেসার ও জ্বর মাপলেন। জ্বর ১০৬ ডিগ্রী। বরফের ব্যবস্থা করতে বললেন। আমারও প্রেসার মাপলেন। প্রেসার বেশি, কত বেশি বলেননি। আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ''দেখুন আপনি খুব শক্ত, তাই বলছি, উনি আর বেশিক্ষণ নেই।''

মাত্র গত ২৩শে মার্চ বিকেলে হাজারী, তার স্ত্রী জেলী এবং অজিত নিয়োগী একসঙ্গে আমাদের বাসায় এসেছিল। আমি সেদিন কালো জামদানী শাড়ি পড়েছিলাম। নিয়োগী প্রথম দেখাতেই বলেছিলো, ''আপনার কালো শাড়ি আমি সহ্য করতে পারছি না। যান, শাড়িটা বদলে আসুন''। আমি শাড়ি না পাল্টাতে তিনি বার বার ঐ একই কথা বলতে থাকলেন। আমি হেসে বললাম, ''সে কি! সেই সকাল বেলা থেকে এই শাড়ি দেখে কতজন যে আওয়াজ দিলো। না, এ শাড়ি আমি বদলাবো না''। নিয়োগী তখন বললেন, আপনার একটা দারুণ পরিবর্তন আসছে। ''যেই না বলা, অমনি জ্যোতির্ময় ওঁর সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল--''দেখো তো, আমার এ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হবে নাকি! আমার হাতে আয়ু সত্তর বছর। আমি তো এখন মারা যেতে পারিনে।''

আমি ডাক্তারকে বললাম, ''তাকে কি চার পাঁচ মাসও পঙ্গু অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা যায় না''? তিনি বলেন, ''পাঁচ দিনও যা পাঁচ মাসও তাই''। আমার কথা পাঁচ মাস ও কথা বলতে পারলে বই তো লেখা যায়!

X-Ray হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন, গলায় কফ জমলে যন্ত্র দিয়ে বের করা চলতে লাগলো। আমার প্রাক্তন ছাত্রী--প্রিয় ছাত্রী, অনাথ আশ্রমে মানুষ ভারতী ভালো নার্স। ডিউটির সময়টুকু ছাড়া সারাদিন সে আমাদের কাজ করেছে, সব ফ্রিজে, বাটিতে, প্যানে, পানি রেখে বরফ জমিয়ে এনে দিয়েছে, আর স্বর্ণ মাথায় ধরে রেখেছে। সারা রাত ধরে করেছে। ডাক্তাররা ঠাট্টা করেছেন, কে হয়? এত বাড়তি কাজ? বলে, ''আমাদের জামাই বাবু।'' ডাক্তার আমাকে বললেন, ''আজ আর আপনি রাত জাগবেন না। ছোকরা ডাক্তার আমাকে প্রেসারের ও ঘুমের বড়ি দিল, নাম যেন কী সেনগুপ্ত। বললো, ''আজ রাতে আমি ডিউটি দেবো।'' আজ তো গোপাল ফিরে এসেছে, স্বর্ন আছে। আমার আর চিন্তা নেই। আমি জানি ছোকরা ডাক্তার কেন আমাকে রাত জাগতে দেবে না। কিন্তু আমি কি ঘুমাতে পারি?

কেমন করে ২৯—এর রাত শেষ হয়ে ৩০ মার্চের সুর্য উঠলো? রাতে বৃষ্টি হয়েছে--অনেক আগুন নিভে গেছে শহরে। লাল সুর্যের প্রভাতী আলো কালো পিচের বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় চকচক করছে। আমি ডায়েরীতে লিখলাম, ''একটি সুর্য উঠছে, আরেকটি নিভছে। আমি সেই চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম''। আমাকে এসে কে যেন Sick রুম থেকে ডেকে নিয়ে গেল। স্বর্ণ বললো, ''দাদাবাবুকে একটু জল দ্যান।'' ও আমার হাতে জল দিলো, আমি তাই তো দিলাম। প্রায় সকাল নটায় 'জীবন প্রদীপ' নিভলো।

সারাদেশে আবিস্কৃত বধ্যভূমিতে অসংখ্য বিকৃত লাশের সংবাদ পেয়ে সমস্ত বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সমগ্র মানবতার বিরূদ্ধে এই অপকর্মের প্রতিবাদ জানিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে থাকে শোকবার্তা। জাতিসংঘে গণহত্যার নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কায়রোতে আফ্রো-এশিয়া গণসংস্থার সম্মেলনে বাংলাদেশে সুপরিকল্পিতভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করায় নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মাদার তেরেসার নেতৃত্বাধীন 'ক্রিসটাস' সংস্থা থেকে বাংলাদেশে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের নিন্দা করে নির্যাতিতদের সহায়তার জন্য মাদার তেরেসাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানবতাবাদী নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে আসেন। বিভিন্ন বধ্যভূমিতে অকল্পনীয় নির্যাতনের চিহ্নসহ অজস্র বিকৃত মৃতদেহ এবং হাড় কংকালের স্তুপ চাক্ষুস দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে যান। আন্তর্জাতিক রেডক্রস, বিশ্ব শান্তি কমিশন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধিদল এসেছিলেন মুলতঃ যুদ্ধবন্দী এবং তাদের দেশীয় দোসরদের সময় তারা যাতে জেনেভা কনভেনশনের সুবিধা পায়, বাংলাদেশ সরকারকে সে বিষয়ে প্রভাবান্বিত করাবার জন্য। কিন্তু দেশ জুড়ে

অসংখ্য বধ্যভূমিতে হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা দেখে তারা নিজেরাই এদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ প্রতিনিধি দলের নেত্রী মাদাম ইসাবেলা ব্লুম ২০/১/৭২ তারিখে সাংবাদিকদের বলেন, ''শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমিতে বাঙালী হত্যাযজ্ঞের যে লোমহর্ষক নৃশংসতার স্বাক্ষর আমি দেখেছি--তাতে আমি শোকাভিভূত ও সন্ত্রস্ত হয়ে গেছি। এই হত্যাকান্ড নাৎসী গ্যাস চেম্বারের হত্যাযজ্ঞের চেয়ে অনেক বেশী বীভৎস''। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে পরিষদের সভাপতির কাছে এই গণহত্যার জন্য আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাবেন বলে জানান। (আজাদ, ২২/১/৭২)।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত দলটির অপর একজন সদস্য বলেন, ''আমি যা দেখে এসেছি তা আমি বিশ্বাস করতে চাই না। আমাকে আজীবন এই স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।''

স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থক মার্কিন সিনেটের ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য এ্যাডলাই স্টিভেনসন কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বধ্যভূমিগুলো দেখে এসে ৩০ জানুয়ারি বলেন, ''বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংসতা ছিল ভয়াবহ এবং মানবজাতির ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। এই বর্বরতা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।'' (আজাদ, ৩১/১/৭২)

মার্কিন সিনেটের অপর সদস্য এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, ''মানুষের মস্তিস্কে এ ধরনের বর্বরতার চিহ্ন আসতে পারে এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়''। (আজাদ ১৭/২/৭২)

সারাদেশে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যথাযথ বিচারের মাধ্যমে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য দাবী ওঠে।

এই জঘন্য হত্যাকান্ডের খবর বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য এবং এর সাথে জড়িত পাক সামরিক অফিসার ও তাদের এদেশীয় দালালদের বিচার করার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীদের বিচারের উদ্দেশ্যে বার্টান্ড রাসেল, জ্যাঁ পল সার্ত, আঁদ্রে মালরো প্রমুখ বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বের সমন্বয় গঠনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে বিচারের দাবী করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকেও আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য দাবী জানানো হয়।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার এই হত্যাযজ্ঞকে নজীরবিহীন বর্বরতা বলে উল্লেখ করে এর বিচারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। এই ভয়াবহ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা জেনেভা কনভেনশনের সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে হারিয়েছে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি বা সমপর্যায়ের কোন মনোনীত ব্যক্তির নেতৃত্বে কমিশন পাক বাহিনী ও তাদের দালালদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের মৌখিক ও লিখিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ব্যাপক রিপোর্ট পেশ করবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই দিন রমনা রেসকোর্স ময়দানে ক্রন্দনরত অবস্থায় শেখ মুজিব বলেন, ''বিশ্বকে এই জঘন্যতম হত্যাকান্ডের তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক দল এই বর্বরতার তদন্ত করুক এই আমার কামনা। (দৈনিক বাংলা, ১১/১/৭২)

এর পর থেকে তিনি বিভিন্ন সভায়, সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে কিংবা দেশী বিদেশী অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে গণহত্যার নিন্দা করে বাংলার মাটিতে দালালদের অবশ্যই বিচার করা হবে বলে বক্তব্য রাখেন।

১০ জানুয়ারীর জনসভাতেই তিনি বলেন, ''যারা দালালী করেছে, আমার শত শত দেশবাসীকে হত্যা করেছে, মা বোনকে বেইজ্জতী করেছে, তাদের কি করে ক্ষমা করা যায়? তাদের কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা হবে না, বিচার করে তাদের অবশ্যই শাস্তি দেযা হবে।'' এ জন্য দায়িত্ব সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমরা দেখিয়ে দিতে চাই শান্তিপ্রিয় বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে জানে– তেমনি শান্তি বজায় রাখতেও জানে''।

১২ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর শেখ মুজিব গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না দৃঢ়মত প্রকাশ করে বলেন, ''লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের কাহিনী আমি শুনেছি, তবু বাংলার মানুষ এত নীচে নামবে না, বরং যা মানবিক তাই করবে, তবে অপরাধীদের আইনানুযায়ী অবশ্যই বিচার হবে।' (দৈনিক বাংলা, ১৩/১/৭২)।

১৪ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ অফিসে তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতিশোধ গ্রহণের পথ পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ''দালালদেরকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দেয়া হবে''। (পূর্বদেশ, ১৫/১/৭২)

৬ ফেব্রয়ারী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দশ লক্ষ লোকের বৃহত্তম জন সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ''যারা গণহত্যা চালিয়েছে তারা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, এদের ক্ষমা করলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না''। (দৈনিক বাংলা, ৭/২/৭২)

ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারির জনসভায় তিনি বলেন ''বাংলার মাটিতেই খুনীদের বিচার হবে।' (দৈনিক বাংলা, ২৩/২/৭২)

৩০শে মার্চ চট্টগ্রামের জনসভায় গণহত্যাকারীদের 'নমরূদ' বলে আখ্যায়িত করে তিনি প্রশ্ন করেন––দালালদের ক্ষমা করা হবে কিনা, সমবেত জনতা হাত তুলে বলেন, ''না'।' (পুর্বদেশ, ৩১/১/৭২)

৩১ মার্চ খুলনার জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, ''বর্বর হানাদার বাহিনীর সাথে স্থানীয় সহযোগী রাজাকার আল–বদর, জামাত প্রভৃতি যোগ দেয়। তারা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যদি কেউ দালালদের জন্য সুপারিশ করতে আসে তবে তাকেই দালাল সাব্যস্ত করা হবে। দালালদের কখনোই ক্ষমা করে দেয়া হবে না''। (পুর্বদেশ ১/৪/৭২)

২৬ এপ্রিল তিনি দিল্লী স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের সংগে সাক্ষাৎকারে বলেন, ''যারা গণহত্যা করেছে তাদের এর পরিণতি থেকে রেহাই দেয়া যায় না। এরা আমার ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে। এদের ক্ষমা করলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এবং বিশ্ব সমাজ আমাদের ক্ষমা করবে না''। (দৈনিক বাংলা ৩০/৪/৭২)

৬ মে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এবিসি) সাথে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের প্রসংগে বলেন,''আমি অবশ্যই তাদের বিচার করব, এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। যেখানে তারা ত্রিশ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে, সেখানে কোন দেশ কি তাদের ছেড়ে দিতে পারে?'' এই সাক্ষাৎকারেই দালালদের প্রসংগে তিনি বলেন, ''দালালদের কেসগুলো একটি তদন্ত কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হবে। আমরা তদন্ত করছি এবং নির্দোষ লোকদের ছেড়ে দিচ্ছি, অবশ্য যারা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।'' (আজাদ' ১৫/৫/৭২)

শেখ মুজিব ও তার সরকারের অন্যান্য সদস্যদের এ ধরনের বক্তৃতা বিবৃতির পাশাপাশি চলতে থাকে দালালদের সুরক্ষার আয়োজন। বিভিন্ন মহল থেকে দালালদের বিচারের জন্য সংক্ষিপ্ত আদালতের দাবীকে উপেক্ষা করে ২৪ জানুয়ারী জারী করা হয় বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২। দালালদের বিচারের জন্য এই আইনে দু'বছরের জেল থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী আসামীর ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল করাবার অধিকার থাকলেও ফরিয়াদীকে ট্রাইব্যুনালের বিচার্য অপরাধের জন্য কোন আদালতের বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

গণহত্যাকারী ও দালাল নেতাদের সুকৌশলে রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়েছিল এই আইন। কারণ আইনের ৭ ধারায় বলা হয়েছিল, থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি যদি কোন অপরাধকে অপরাধ না বলেন তবে অন্য কারও কথা বিশ্বাস করা হবে না, অন্য কারও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইবুন্যানালে। অন্য কোন আদালতেও মামলা দায়ের করা যাবে না। দালালদের আত্মীয় স্বজনের ওসিকে তুষ্ট করার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, স্বজন হারানো নির্যাতিত দরিদ্র জনসাধারণের তা ছিল না।

দালাল আইন কুখ্যাত খুনী দালালদের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে দেখা যায়। যে শান্তি কমিটির মুল কাজ ছিল নিরপরাধ বাঙালীদের হত্যা তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের হত্যার জন্য পাক সেনাকে সহায়তা করা, তার সদস্যরা সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদন্ড পেয়ে নিস্তার পেয়ে যায়। শান্তি কমিটির নিজস্ব ঘোষণা অনুযায়ীই এর মুল কাজ ছিল তাদের ভাষায়—'দুস্কৃতিকারী ও ভারতীয় চরদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদেরকে নির্মুল করা।' সুতরাং যে কোন দালালের সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার জন্য তার শান্তি কমিটির সদস্য প্রমাণিত হওয়াই ছিল যথেষ্ট।

৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত দালাল অধ্যাদেশে অভিযুক্ত মোট ৩৭ হাজার ৪শ' ৭১ জনের মধ্যে ২ হাজার ৮ শত ৪৮ জনের মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল। এর মধ্যে দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল ৭ শত ৫২ জন বাকী ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এর মধ্যে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় মাত্র একজন রাজাকারকে। সুতরাং সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি গণহত্যাযজ্ঞের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে দালালরা কোন মানুষকে হত্যা করেনি, নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মানুষের জবানবন্দি কি সবই মনগড়া গল্প ছিল? নারকীয় বধ্যভূমিগুলোতে প্রাপ্ত বহুবিধ নৃশংস নির্যাতনের চিত্রসহ বিকৃত লাশগুলোর সবই কি ছিল শুধু পাক সেনার শিকার?

২৩ জুলাই ১৯৭২ তারিখের দৈনিক বাংলায় এ বিষয়ে 'দালাল আইন সংশোধনের প্রয়োজন' শীর্ষক একটি রিপোর্টে লেখা হয়--দেশ স্বাধীন হবার পর দালাল বলে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের শতকরা ৭৫ জনেরই মুক্তি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।''

''পুলিশের সংখ্যা এমনিতেই অপ্রতুল। তদুপরি কোলবরেটর অ্যাক্ট এ অভিযোগ তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে শুধু থানার ওসিকে। কিন্তু ওসির পক্ষে একা অসংখ্য মামলার তদন্ত করা এক প্রকার অসম্ভব।.......

''এছাড়া দালাল আইন সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য রয়েছে আইন বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা বলেছেন, দালাল আইন করা হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার জন্য। কাজেই সে অপরাধ প্রমাণের জন্যে থাকতে হবে সাক্ষ্য প্রমাণের বিশেষ ধরন। কিন্তু বর্তমান আইনের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য অনুসরণ করতে হয় একশ' বছরের পুরনো 'ইভিডেন্স অ্যাক্ট'। এই অ্যাক্ট হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতির অপরাধের প্রমাণের জন্য প্রণীত ইভিডেন্স এ্যাক্ট অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা জটিলতা। ফলে অপরাধ প্রমাণ করা হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য।

''একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে পরিষ্কারভাবে। ধরা যাক একজন রাজাকার অপহরণ করেছে কোন এক ব্যক্তিকে, তারপর থেকে সে ব্যক্তির আর কোন সন্ধান মেলেনি। এই অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছে এই সিদ্ধান্ত করা যায় স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু যদি সেই রাজাকারটির বিরুদ্ধে মামলা চলে দালাল আইনে, তবে তার বিরুদ্ধে আনা যাবে না হত্যার অভিযোগ। অভিযোগ আনা হবে হত্যার জন্য অপহরণ করা হয়েছে। কারণ ইভিডেন্স অ্যাক্টে হত্যার চাক্ষুস সাক্ষ্য প্রমাণ না এনে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে যদিও লোকটি খুন হয়েছে তবুও আইনের মারপ্যাঁচে আসামীকে খুনী প্রমাণ করা যাবে না।''

বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার বাধ্য হয় এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য। ৪ আগস্ট ১৯৭২ তারিখে মন্ত্রীসভা সাব কমিটির এক বৈঠকে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তিদানের বিধান রাখার জন্য দালাল আইন

সংশোধনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই তৎকালীন আইন মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর গণহত্যা-কারীদের সহায়তাকারীদের বিচারের জন্য রাষ্টকে ক্ষমতা দেবার উদ্দেশ্যে আনীত সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটিতে বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব করে গণহত্যাকারীদের দোসরদের বিচার করার জন্য রাষ্টকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেবার কথা বলা হয়।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর একটি আকস্মিক সরকারী ঘোষণায় দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন সকল আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত দালালকে ছেড়ে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী এই দালালদের দেশ গড়ার কাজে সামিল হওয়ার জন্যও আহবান জানান।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই মালেক মন্ত্রী সভার সদস্যবর্গ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলামের নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার চক্রান্তকারী দালালসহ মুল স্বাধীনতা বিরোধী উম্মাদদের আবার স্বজন হারানো জনতার মাঝে ছেড়ে দেয়া হয়। এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও সরকারী গেজেটে আত্মগোপনকারী দালালদের নাম ঠিকানাসহ আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ এবং অন্যথায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুঁশিয়ারী জানিয়ে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা সমন প্রকাশিত হতে থাকে, কারণ ইতিমধ্যেই তা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের কেন ক্ষমা করা হল এ নিয়ে আওয়ামী লীগ মহল ও বিরোধী ধারণা সম্পর্ণ বিপরীতমুখী। অনেকে মনে করেন দালালদের ক্ষমা করাটা ছিল 'বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতা'। পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালীদের উদ্ধার করার জন্য নাকি দালালদের ক্ষমা করতে সরকার বাধ্য হয়েছিলেন। বিরোধী পক্ষ অবশ্য এ যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন, আটকে পড়া বাঙালীদের মুক্তির জন্য ৯৬ হাজার যুদ্ধবন্দী পাক বাহিনী যথেষ্ট ছিল।

৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের মাতা, পিতা, স্ত্রী ও পুত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে কিভাবে দেখেন ঢাকার একটি সাপ্তাহিকে পরবর্তীকালে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ তরুণ মুক্তিযোদ্ধা রুমির মা লেখিকা জাহানারা ইমাম বলেছেন, ''গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যায় যাদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পর পরই তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সাধারণ ক্ষমার জন্য তা হয়নি। তৎকালীন সরকারের সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত ছিল মারাত্মক একটি ভুল। সেদিন ক্ষমা ঘোষণা না করা হলে ঘাতকরা নিজেদের সমাজে পুনর্বাসিত করার সুযোগ পেত না।''

প্রখ্যাত সাংবাদিক শহীদ শহীদুল্লাহ্ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার বলেন, বর্তমানে রাজাকার, আল-বদরদের যে দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে তা শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমারই ফল। ওই ক্ষমা ছিল বিচার বুদ্ধিহীন। সেদিন সরকার যদি ঘাতকদের বিচার করে সাজা দিত, তাহলে আজ এ অবস্থা হত না।'' ''তাঁরা আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যাথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন। তাই আজ খালেকের মত ঘাতকরা বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নতুন হত্যার ইন্ধন যোগাচ্ছে। আমার মেয়ে যখন ঘাতক খালেকের বই পড়ে নানা প্রশ্ন করে, আমি উত্তর দিতে পারি না।''

দেশ স্বাধীন হবার একদিন আগে, ১৫ ডিসেম্বর আল-বদর, রাজাকাররা এক পরিবারের তিন সহোদর ভাইকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর, যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের দিনে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তিন ভাইয়ের লাশ পাওয়া যায়। এই তিন ভাই হচ্ছেন শহীদ বদিউজ্জামান বদি, শহীদ শাহজাহান ও শহীদ করিমুজ্জামান ওরফে মুল্লুক জাহান।

তিন শহীদ ভাইয়ের পিতা-মাতা অনেক আগেই মারা গেছেন। এখন শুধু শহীদ বদির বিধবা স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে বেঁচে আছে। অপর দু'ভাই অবিবাহিত ছিলেন। বর্তমানে শহীদ বদি পরিবারের সার্বিক দেখাশোনা করেন তাঁদের ফুপাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হুদা। তিনি ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দারের অধীনে যুদ্ধ করেছেন।

শহীদ বদি পরিবারের মুখপাত্র হয়ে মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম আওয়ামী লীগ সরকারের সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলেন, ''রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু যারা লাখ লাখ স্বাধীনতাকামী লোককে হত্যা করেছিল, তাদের ক্ষমা করে দেয়া অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। ছিল একটি চরম ভূল সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, শুধু ক্ষমা নয়, ঐ সরকার শহীদ পরিবারগুলোর প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞাও প্রদর্শনকরেনি।''

সাধারণ ক্ষমার কারণে ৭১-এর ঘাতকরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে--এ কথা উল্লেখ করে শামসুল হুদা বলেন, ''এই দেশ যদি সত্যি স্বাধীন হয়ে থাকে, তাহলে এই স্বাধীন দেশে ঘাতকদের রাজনীতি করার অধিকার বন্ধ করে দিতে হবে।''

দশম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ বদির পুত্র তুরানুজ্জামানের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধ আল-বদরদের হত্যাকান্ড সবই একটি ধোঁয়াটে ব্যাপার। কিছুটা বিভ্রান্তও সে। তবে ১৬ বছরের তুরান এ কথা বলেন যে, ''আমার পিতার হত্যাকারীদের বিচার না হওয়ায় আমি ক্ষুব্ধ।''

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ও প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক শহীদ ডাঃ মর্তুজার স্ত্রী মিসেস মর্তুজা বলেন, ''যাদের প্রাণ গেছে, তাদের আত্মীয় স্বজনরাই বুঝতে পেরেছেন, শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমার মর্মান্তিক মর্মটা।''

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভে হানাদার বাহিনীর দোরসদের হাতে নিহত, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানের অমর সুরকার শহীদ

আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী সারা মাহমুদ বলেন,''সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা কোনভাবেই উচিত হয়নি। সেদিন সাধারণ ক্ষমা না করা হলে, অন্ততঃ আমার স্বামীকে হত্যা করে কোথায় দাফন করা হয়েছিল তা জানতে পারতাম। কিন্তু সাধারণ ক্ষমার ফলে আমার স্বামীর বধ্য ভূমির ঠিকানা ও পাইনি।''

তিনি বলেন, ''ঘাতকদের অনেককে আমরা চিনি। সেদিন যদি তাদের ফাঁসি দেয়া হতো তাহলেও কিছুটা শান্তি পেতাম। অন্ততঃ বুঝতাম যে, হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। তবে এখনো তাদের শাস্তি দেয়া যায়। আমি আশা করবো সরকার এটা বিবেচনা করবেন।''

মিসেস সারা মাহমুদ ঘাতকদের বর্তমান তৎপরতা সম্পর্কে বলেন, ''৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সংগে মিলে যারা একের পর এক হত্যাকান্ড চালিয়েছে, তারাই আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একইভাবে কাজ করছে। আর এটা ঐ সাধারণ ক্ষমারই ফল।''

শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর স্ত্রী মিসেস মনোয়ারা চৌধুরী বলেন, ''ঘাতকদের সাধারণ ক্ষমা করা হবে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু সরকার সাধারণ ক্ষমা করে দিলেন। আমরা ভেবেছিলাম শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এসে ঘাতকদের বিচার করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। শেখ মুজিব তো ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চিনতেন। সে চেনা জানাটুকুও কাজে লাগালো না।''

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার বিধবা স্ত্রী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন যে, ''১শ' ৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী পাক সামরিক অফিসারদের কেন বিচার হলো না? শেখ মুজিব তো বহুবার বললেন, যুদ্ধাপরাধী পাক সামরিক অফিসারদের বিচার করবেন। কিন্তু পারলেন না। আবার তিনি এদেশীয় ঘাতকদেরও ক্ষমা করে দিলেন। আর এই ক্ষমাই সবকিছু এলোমেলো করে দিলো। সেদিন যদি ক্ষমা না করে অন্ততঃ দু'একজন ঘাতকেরও যদি সাজা হতো তাহলে অনেক শহীদ পরিবারই শান্তি পেতেন। তাছাড়া ঘাতকরাও আজ আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারতো না।''

শহীদ অধ্যাপক সিরাজুল হকের স্ত্রী বেগম সুরাইয়া খানম বলেন, ''ঘাতকদের তো ক্ষমা করিনি। ক্ষমা করেছে সরকার। আমরা ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু তা পাইনি। এত বছর পরে বিচার চাইবোই বা কার কাছে?''

শহীদ অধ্যাপক মোহাম্মদ সাদেকের স্ত্রী শামসুন্নাহার হতাশায়, ভয়ে কাতর। তিনি গভীর উদ্বেগ নিয়ে শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলেন, ''যাদের ক্ষমা করা হয়েছে তাদের আমরা চোখে দেখি। সেই ক্ষমার জোরে আজ সেই সব দালাল রাজাকাররা এখন আমাদের বাড়ি থেকে উৎখাতের চেষ্টা করছে।''

তিনি বলেন, ''সাধারণ ক্ষমা একটা গুরুতর অপরাধ ছিল। সে সব ঘাতককে আমরা সবাই চিনি এবং জানি। তারা আমাদের চারপাশেই আছে। কিন্তু আমাদের করার কিছু নেই।''

এদেশের সংবাদপত্র জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং দৈনিক ইত্তেফাকের 'মঞ্চ নেপথ্য' কলামের লেখক সিরাউদ্দিন হোসেনের জ্যৈষ্ঠ পুত্র শাহীন রেজা বলেন, ''শুধু সাধারণ ক্ষমা নয়, এর আগে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়েছিল। হত্যার

সংগে জড়িত ব্যক্তিদের সুকৌশলে রেহাই দেয়া হয়। অথচ যাদের বিরূদ্ধে হত্যাকান্ডের কোন প্রমাণ ছিল না তাদেরকে জেলে ঢোকানো হয়। এছাড়াও যারা হত্যার মুল পরিকল্পনা করেছিল তারাও অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সকল দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ রকম প্রহসনমুলক বিচারের পর আবার আসলো সাধারণ ক্ষমা।''

''এধরনের বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এর সাথে একমাত্র তুলনা হয় জার্মান একনায়ক হিটলারের 'কনসেন্ট্রেশন' ক্যাম্পের হত্যাকান্ডের। অথচ জঘন্য হত্যাকারীদের সরকার ক্ষমা করে দিলেন। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছিল। আর এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকারের অদুরদর্শিতাই প্রমাণিত হয়েছিল।''

''সরকার হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিয়ছিল বলেই আজ তারা সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়েছে। শহীদদের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতে '৭১-এর ঘাতকদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই ক্ষমা ছিল এক অদ্ভুত খেয়ালীপনা। পৃথিবীতে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। খুনীদের ক্ষমা করে দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে তা মেনে নেয়া যায় না।'' তিনি বলেন, ''এটা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় যে-যারা হত্যা করে, তাদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি। আর এই না হওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে।''

ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য অনুষ্ঠিত নুরেণবার্গ ট্রায়ালের কথা এখানে স্মরনযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাৎসী যুদ্ধ অপরাধীদের আজও বিচার করা হচ্ছে। আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের মানবতার শত্রু একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের সংগে জড়িত নরঘাতকদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই।''

পরিশিষ্ট—১

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা

শহীদ শিক্ষাবিদ (বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) ও আইনজীবীদের জেলাওয়ারী তালিকা—

শিক্ষাবিদ

জেলা ও বিভাগ	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	আইনজীবী
ঢাকা	৩৭	৮	১০	৬
ফরিদপুর	২৭	১২	৪	২
টাঙ্গাইল	২০	৭	২	
ময়মনসিংহ	৪৬	২৮		২
ঢাকা বিভাগ	১৩০	৫৫	১৭	১০
চট্টগ্রাম	৩৯	১৬	৭	১
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৯	৪		১
সিলেট	১৯	৭		২
কুমিল্লা	৪৫	৩৩	১	৪
নোয়াখালী	২৬	১৩	৪	২
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৩৮	৭৩	১৩	১০
খুলনা	৪৮	১৫	২	২
যশোর	৫৫	৩১	৫	৪
বরিশাল	৫০	২১	৪	
পটুয়াখালী	৩	১		
কুষ্টিয়া	২৮	১৩	৪	
খুলনা বিভাগ	১৮৪	৮১	১৫	৬
রাজশাহী	৩৯	৮	৩	৫
রংপুর	৪১	২২	৯	৩
দিনাজপুর	৫০	১০		২
বগুড়া	১৪	১২		২
পাবনা	৪৩	৯		২
রাজশাহী বিভাগ	১৮৭	৬১	১৪	১৫
বাংলাদেশ	৬৩৯	২৭০	৫৯	৪১

(১) শহীদ শিক্ষাবিদদের মোট সংখ্যা ১৬৮

(২) শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ২১

.................................মোট শিক্ষাবিদ.. ১৮৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

(১) এ এন এম মুনীর চৌধুরী
(২) ডঃ জি সি দেব
(৩) মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
(৪) আনোয়ার পাশা
(৫) ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা
(৬) আব্দুল মুকতাদির
(৭) এস এম রাশীদুল হাসান
(৮) ডঃ এন এম ফয়জুল মহী
(৯) ফজলুর রহমান খান
(১০) এ এন এম মুনীরুজ্জামান
(১১) ডঃ সিরাজুল হক খান
(১২) ডঃ শাহাদাত আলী
(১৩) ডঃ এম এ খায়ের
(১৪) এ আর খান খাদিম
(১৫) মোঃ সাদেক
(১৬) শরাফত আলী
(১৭) গিয়াসউদ্দিন আহমদ
(১৮) আনন্দ পয়ান ভট্টাচার্য
(১৯) ডঃ আবুল কালাম আজাদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

(১) অধ্যাপক কাইয়ুম
(২) হাবীবুর রহমান
(৩) শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার

সাবেক গলভুষেদ সদস্য

(১) মসিউর রহমান
(২) আমজাদ হোসেন
(৩) আমিনুদ্দীন
(৪) নজমুল হক সরকার
(৫) আবদুল হক
(৬) ডাঃ জিকরুল হক
(৭) সৈয়দ আনোয়ার আলী
(৮) এ কে সরদার।

সাংবাদিক

(১) শিরাজুদ্দীন হোসেন
(২) শহীদুল্লাহ্ কায়সার
(৩) খোন্দকার আবু তালেব
(৪) নিজামুদ্দীন আহমদ

(৫) আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা
(৬) শহীদ সাবের
(৭) শেখ আব্দুল মান্নান (লাডু)
(৮) নজমুল হক
(৯) এম আখতার
(১০) আবুল বাসার
(১১) চিশতী হেলালুর রহমান
(১২) শিবসদন চক্রবর্তী
(১৩) সেলিনা আখতার

চিকিৎসাবিদ

(১) মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী
(২) আবদুল আলীম চৌধুরী
(৩) সামসুদ্দীন আহমদ
(৪) আজহারুল হক
(৫) হুমায়ুন কবীর
(৬) সোলায়মান খান
(৭) কায়সার উদ্দীন
(৮) মনসুর আলী
(৯) গোলাম মর্তুজা
(১০) হাফেজ উদ্দীন খান
(১১) জাহাঙ্গীর
(১২) আবদুল জব্বার
(১৩) এস কে লাল
(১৪) হেমচন্দ্র বসাক
(১৫) কাজী ওবায়দুল হক
(১৬) মিসেস আয়েশা বেদৌরা চৌধুরী
(১৭) আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন
(১৮) হাসিময় হাজরা
(১৯) নরেন ঘোষ
(২০) জিকরুল হক
(২১) সামসুল হক
(২২) এস রহমান
(২৩) এ গফুর
(২৪) মনসুর আলী
(২৫) এস কে সেন
(২৬) মফিজ উদ্দিন
(২৭) অমুল্য কুমার চক্রবর্তী
(২৮) আতিকুর রহমান
(২৯) গোলাম সরওয়ার
(৩০) আর সি দাশ
(৩১) মিহির কুমার সেন
(৩২) সালেহ আহমদ
(৩৩) অনীল কুমার সিংহ
(৩৪) সুশীল চন্দ্র শর্মা
(৩৫) এ কে এম গোলাম মোস্তফা
(৩৬) মকবুল আহমদ
(৩৭) এনামুল হক
(৩৮) মনসুর (কানু)
(৩৯) আশরাফ আলী তালুকদার
(৪০ লেঃ জিয়ায়ুর রহমান
(৪১ লেঃ কঃ জাহাঙ্গীর
(৪২) বদিউল আলম
(৪৩) লেঃ কঃ হাই
(৪৪) মেজর রেজাউর রহমান
(৪৫) মেজর নাজমুল ইসলাম
(৪৬) আসাদুল হক
(৪৭) নাজির উদ্দিন
(৪৮) লেঃ নুরুল ইসলাম
(৪৯) কাজল ভদ্র
(৫০) মনসুর উদ্দীন

অন্যান্য

(১) জহির রায়হান (সাহিত্যিক)
(২) পুর্নেন্দু দস্তিদার (সাহিত্যিক)
(৩) ফেরদৌস দৌলা (সাহিত্যিক)
(৪) ইন্দু সাহা (সাহিত্যিক)
(৫) মেহরুন্নেসা (সাহিত্যিক)
(৬) আলতাফ মাহমুদ (শিল্পী)
(৭) দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা
(৮) ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত (রাজনৈতিক নেতা)
(৯) যোগেশ চন্দ্র ঘোষ (আর্যূবেদশাস্ত্রী)
(১০) শামসুজ্জামান (চীফ ইঞ্জিনিয়ার)
(১১) মাহবুব আহমদ (সরকারী কর্মচারী)
(১২) খুরশীদ আলম (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৩) নজরুল ইসলাম (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৪) মোজাম্মেল হক চৌধুরী (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৫) মহসিন আলী (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৬) মুজিবুল হক (সরকারী কর্মচারী)

পরিশিষ্ট—২

বাংলাদেশে গণহত্যা—
বিদেশীদের চোখে

'রক্তই যদি কোন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারের মূল্য বলে বিবেচিত হয় তবে বাংলাদেশ অনেক বেশী দাম দিয়েছে।'' বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একথা স্বীকার করেন লণ্ডনের ''নিউ টাইমস'' পত্রিকা ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সংখ্যায়।

মাত্র নয় মাসের পরিসরে জেনারেল ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে তিরিশ লক্ষেরও বেশী মানুষ হত্যা করে। বাঙালি জাতিকে চিরতরে দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য ইয়াহিয়া এবং তার সেনাপতিরা বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তি সমূহকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল করতে চেয়েছিল।

সেদিন সমগ্র বিশ্ববাসী ও তার নেতৃবৃন্দ একটা দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপরে পুরোপুরি সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

সারা বিশ্বের সকল সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন এই গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে।

সেই ভয়াবহ ঘটনার দু'জন চাক্ষুষদর্শীর বিবরণী সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এ'রা দু'জন হলেন লণ্ডনের ''ডেইলী টেলিগ্রাফ'' পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ডিং ও ''নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর'' সংবাদদাতা সিড্নি এইচ্ শ্যানবার্গ।

১৯৭১ সালের ২৬শে ও ২৭শে মার্চ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী যখন রাজধানী ঢাকা থেকে সকল বিদেশী সাংবাদিককে বহিষ্কৃত করে সাইমন ডিং তখন রাজধানী ঢাকাতেই আত্মগোপন করেন।

সান্ধ্য আইন স্বল্প সময়ের জন্য প্রত্যাহার হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ৭২ ঘন্টাব্যাপী রাজধানী ঢাকার বুকে যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল তা দেখতে ও সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন। সেই ৭২ ঘন্টায় যা ঘটেছে তার সবকিছু তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব না হলেও তাঁর বিবরণী থেকে এই বর্বরতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদশে পাকিস্তানী কতৃপক্ষ কিভাবে তথাকথিত ''স্বাভাবিক অবস্থা'' ফিরিয়ে এনেছে—তা দেখবার জন্য ১৯৭১ সালের জুন মাসে যে সকল বিদেশী সাংবাদিককে ঢাকা প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছিল শ্যানবার্গ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্যানবার্গকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত করে, কারণ শ্যানবার্গ তাঁর প্রেরিত সংবাদমালার মাধ্যমে পাকিস্তান কর্তপক্ষের দাবীর অসারতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উদঘাটন করে দেন।

৩০ শে মার্চ ''ওয়াশিংটন পোষ্ট'' পত্রিকায় ''ঢাকা কিভাবে 'ঐক্যবদ্ধ' পাকিস্তানের জন্য খেসারত দিয়েছে'' শিরোনামে প্রকাশিত সাইমন ডিংয়ের রিপোর্ট বলা হয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল.......

নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে, অন্যান্যরা নিহত। মুজিবুরের সমর্থক দুটো সংবাদপত্র অফিস ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

পঁচিশে মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তার চলমান ট্যাংকগুলো প্রথম লক্ষ্য ছিল ছাত্ররা।

ঢাকার উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে, সাঁজোয়া, গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীর আনুমানিক তিনটি ব্যাটালিয়ন ব্যবহার করা হয়। রাত দশটার কিছু আগে তারা তাদের সৈন্য ছাউনি ত্যাগ করা শুরু করে। এগারোটার মধ্যে গুলীবর্ষণ শুরু হলো এবং যারা উলটানো গাড়ী, গাছের গুড়ি, আসবাব, কংক্রীটের নল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করার চেষ্টা করেছিল তারা নিহত হলো।

শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোনে সাবধান করে বলা হলো, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি তাঁর বাসা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। গ্রেফতার এড়িয়ে আসা একজন দলীয় কর্মীকে তিনি বলেছিলেন, ''যদি আমি লুকোতে যাই তবে তারা আমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে পুরো ঢাকা জ্বালিয়ে দেবে।''

ছাত্রদেরও সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তখনও সেখানে যাঁরা ছিলেন পরে জানিয়েছেন যে, তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের শুধু গ্রেফতার করা হবে মাত্র। আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এম.-২৪ ট্যাংকের পিছু পিছু একদল সৈন্য মধ্যরাতের কিছু পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা হয়। সৈন্যরা বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী দখল করে নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় শেল-নিক্ষেপের জন্যে ঐ জায়গাকে 'ফায়ার-বেস' হিসেবে ব্যবহার করে।

আমাকে বলা হয়েছে যে, সরকার বিরোধী চরমপন্থী ছাত্রদলের কেন্দ্রস্থল ইকবাল হলে আচমকা হানা দিয়ে দু'শো ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। দু'দিন পর দেখা গেল, পোড়া ঘরগুলোতে পড়ে আছে কিছু দেহ, কিছু বাইরে ছড়িয়ে, কিছু ভাসছিলো কাছের এক পুকুরে, শিল্পী এক ছাত্রকে দেখা গেল ইজেলের কাছে পড়ে আছে লুটিয়ে।

মাত্র ৩০টি মৃতদেহ ইকবাল হলে দেখা যায়। কিন্তু হলের করিডোরে যতো রক্ত দেখা গেল তা থেকে মনে হয় না যে নিহতের সংখ্যা এতো অল্প। সেনাবাহিনী বহুসংখ্যাক মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে।

আরেকটি হলে, পাক সৈন্যরা তাড়াহুড়ো করে গণকবর খুঁড়ে মৃতদের কবর দিয়ে ট্যাংক দিয়ে সমান করে দেয়। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাস করতেন তাঁরাও এই আক্রমণের শিকার হন। রেল লাইনের পাশে দু'শো গজ জুড়ে যে বস্তি এলাকা ছিল তা ধ্বংস করে দেয়া হয়।

নিকটবর্তী বাজার এলাকাও সৈন্যরা গুড়িয়ে দেয়। দু'দিন পর যখন ঘর থেকে বের হয়ে এ-সব দেখা সম্ভব হলো—তখন দেখা গেল, বাজারের কিছু দোকানের মালিক তখনও শুয়ে আছে—যেন ঘুমোচ্ছে, কাঁধের ওপর পর্যন্ত তাদের কম্বল টানা। একই এলাকায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজে সরাসরি বাজুকা আক্রমণ করা হয়।

একদল সৈন্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালাচ্ছিল তখন অন্য আরেকটি দল শহরের অন্যপাশে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের কেন্দ্র রাজারবাগের দিকে রওয়ানা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ট্যাংক থেকে প্রথম গুলীবর্ষণ করা হয়; তারপর সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে তাদের আস্তানাগুলো সমান করে দেয়, সাথে সাথে আশেপাশের বিল্ডিংগুলোতে এলাপাথারি গুলী চালায়। অপরদিকে—আশেপাশে বসবাসকারী লোকেরাও জানে না সেখানে কতোজন মারা গেছে—তবে সেখানে অবস্থানরত ১,১০০ জন পুলিশের ভিতর খুব বেশী কেউ পালাতে পারেনি।

একদিকে যখন এ–সব ঘটছে তখন অন্যদিকে শেখের বাসস্থান ঘেরাও করা হয়েছে। রাত একটার কিছু আগে যখন টেলিফোনে তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, যে কোন মুহূর্তে তিনি আক্রমণ আশংকা করছেন এবং শুধু দেহরক্ষী এবং চাকর ছাড়া সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একজন প্রতিবেশী বললো যে, রাত ১–১০ মিনিটে একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া গাড়ি এবং সৈন্যভর্তি ট্রাক গুলি করতে করতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসে। ''শেখ নীচে নেমে আসুন,'' বাইরে থেকে একজন অফিসার ইংরেজীতে চিৎকার করে বলে উঠলো। মুজিবুর তাঁর ব্যালকনিতে বের হয়ে এসে বললেন, ''আমি তৈরী, গুলি করার দরকার নেই। তোমরা এতো কিছু না করে আমাকে টেলিফোন করলেই আমি চলে আসতাম।''

অফিসারটি তখন প্রাঙ্গণের ভিতর গিয়ে মুজিবকে বললো, ''আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'' তিনজন চাকর, একজন পার্শ্বচর ও একজন দেহরক্ষীশুদ্ধ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো; দেহ রক্ষীটি অফিসারকে অপমান করা শুরু করলে তাকে বেদম পেটানো হলো। পাশের বাড়ীর প্রাচীরের আড়ালে লুকোনো একজন নৈশ–পাহারাদারকে হত্যা করা হলো।

শেখকে যখন সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সৈন্যরা তাঁর বাড়ীর ভিতরে ঢুকে সমস্ত নথি–পত্র নিলো, সামনে যা পেলো তাই চূর্ণ–বিচূর্ণ করলো, বাগানের দরজায় তালা ঝোলালো, সবুজ লাল এবং হলুদ ''বাংলাদেশের'' পতাকাকে ভূপাতিত করে চলে গেল।

শহরের চারদিকে আগুন জ্বলছিল এবং সৈন্যরা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন জায়গাটুকু দখল করে নিয়েছিল। কোন কোন অঞ্চলে তখনও প্রচণ্ড শেলিং হচ্ছিল, তবে যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ নিথর হয়ে আসছিল। ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের উল্টোদিকে ''দি পিপল'' পত্রিকার শূন্য অফিস এবং তৎসংলগ্ন প্রায় সমস্ত বাড়ী–ঘর পুড়িয়ে দেয়া হলো এবং নৈশ–পাহারাদারও রেহাই পেলো না।

ভোরের কিছু আগে গুলিবর্ষণ প্রায় থেমে গেল এবং সূর্য ওঠার সাথে সাথে এক ভীতিজনক নিঃশব্দতা শহরের উপর চেপে বসলো; ফিরে আসা দু'তিনটে ট্যাংকের শব্দ, মাঝে মাঝে কনভয়ের শব্দ ও কাকের চিৎকার ছাড়া সম্পূর্ণ শহর মনে হচ্ছিল পরিত্যাক্ত এবং মৃত।

দুপুরের দিকে, আবার কোন রকম সাবধানবাণী না জানিয়ে শহরের পুরনো অঞ্চলে সৈন্যরা ঢুকতে লাগলো—যেখানে ছড়িয়ে–ছিঁটিয়ে থাকা গলি–ঘুজির মধ্যে একলক্ষ লোক বাস করে।

পরবর্তী এগারো ঘন্টা ''পুরনো শহর'' নামে পরিচিত এ অঞ্চলের বিরাট অংশটুকু তারা ধ্বংস করলো—যেখানে শেখ মুজিবের সমর্থনকারীদের সংখ্যা ছিল বেশী। ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নাজিরা বাজার, নয়াবাজারকে জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো।

''হঠাৎ তাদের রাস্তার প্রান্তে দেখা গেল,'' জানালো নাজিরাবাজার এলাকার এক বৃদ্ধ, ''তারপর তারা এগিয়ে এলো প্রত্যেক বাড়ীতে গুলি করতে করতে।''

গ্যাসোলিনের টিন হাতে সৈন্যরা অগ্রবর্তী ইউনিটকে অনুসরণ করতো—যারা পালাবার চেষ্টা করতো তাদের গুলি করা হতো। যারা থাকতো তারা পুড়ে মারা যেতো। সেদিন দুপুর থেকে রাত দু'টোর মধ্যে প্রায় সাতশো পুরুষ, মহিলা এবং শিশু মৃত্যুবরণ করেছে বলে আমাকে জানানো হয়েছে।

আধা বর্গমাইল বা তার চেয়েও বেশী কমপক্ষে তিনটি এলাকায় একই রকম 'প্যাটার্ণ' অনুসরণ করা হয়েছে। পুরনো শহরের পুলিশ-থানাগুলোকেও আক্রমণ করা হয়েছে।

''আমি আমার কনষ্টবলদের খুঁজছি''-শনিবার সকালে একটি বাজার এলাকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বললেন জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর, ''আমার এলাকায় ছিল ২৪০ জন, এবং এ-পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি ৩০ জনকে—এবং সবাই মৃত।''

পুরনো শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সৈন্যরা লোকদের জোর করে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করেছে এবং এ-এলাকাকেও সবশেষে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে

পুরনো শহরে, ২৬শে মার্চ, শুক্রবার রাত এগারোটা পর্যন্ত সৈন্যরা ছিল এবং স্থানীয় বাঙালি 'ইনফরমারদের' নিয়ে ঘুরছিল। সৈনিকেরা অগ্নিগোলক জ্বালিয়ে দিতো আর চরেরা দেখিয়ে দিত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ঘরবাড়িগুলো। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, তখন ঐ বাড়িটিকে হয় সরাসরি ট্যাংক বা রিকয়েলেস রাইফেল থেকে গুলি করে বা এক টিন গ্যাসোলিন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হতো।

ইতিমধ্যে শহরবতলি থেকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা, শেখের সমর্থনের কেন্দ্র থেকে দশমাইল দূরে শিল্প এলাকার দিকে চলে যাচ্ছিল।

এ-সব এলাকায় রোববার ভোর পর্যন্ত গুলিবর্ষণ চললো—কিন্তু শুক্রবার রাতে অর্থাৎ শুরু হওয়ার ঠিক ২৪ ঘন্টা পর শহরে অভিযানের আসল পর্যায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

বাংলা সংবাদপত্র ''ইত্তেফাক'' ছিল অভিযানের একটি বিশেষ লক্ষ্য। অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রায় চারশো লোক ঐ অফিসে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা গেছে। শুক্রবার, বিকেল চারটায় বাইরের রাস্তায় চারটি ট্যাংক দেখা গেল। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, সাড়ে চারটার দিকে অফিসটি নরক হয়ে গেল। শনিবার সকালবেলা কতগুলো ভস্মীভূত লাশ পেছনের কামরাগুলোতে পড়ে থাকলো।

যে-ভাবে দ্রুত সৈন্যরা নেমে এসেছিল রাস্তায়—ঠিক তেমনিই তারা আবার ফিরে গেল। শনিবার সকালে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো—সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কার্ফু শিথিল করা হবে। এরপর রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে সামরিক আইনের ধারাগুলো পুনর্বার ঘোষণা করা হলো। প্রেস-সেন্সরশীপ জারী করা হলো এবং সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে আদেশ করা হলো। সমস্ত ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে বলা হলো।

অলৌকিকভাবে শহরে জীবন ফিরে এল এবং সেই সঙ্গে দেখা গেল আর্তি, ভয়, আশংকা। দশটার দিকে দেখা গেল রাস্তাগুলো লোক-জনে ভরে গেছে। সবাই শহর ত্যাগ করছে। অন্যদিকে তখনও পুরনো শহরের অনেক এলাকা এবং দূরে শিল্প এলাকার উপরে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যাচ্ছিল। গাড়ি এবং রিকশা করে, বেশির ভাগ পায়ে হেঁটে, জিনিষপত্র হাতে নিয়ে ঢাকার লোকেরা পালাচ্ছিল। দুপুরতক শরাণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ালো গিয়ে লক্ষাধিকের ওপর। ''আমি বুড়ো লোক—আমাকে একটু পৌছে দেবেন,'' ''আল্লার ওয়াস্তে আমাকে একটু সাহায্য করুন'',''আমার ছেলেটাকে আপনার সাথে নিয়ে যান।''

সৈন্যদের কীর্তি নিঃশব্দে এবং কঠিন মুখে দেখতে দেখতে তারা যাচ্ছিল।

সরকারী অফিসগুলো প্রায় শূন্য রইলো। কাজে ফেরার আদেশকে উপক্ষো করে বেশিরভাগ কর্মচারীই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিল। যারা পালাচ্ছিল না তারা ধূমায়িত ধ্বংসাবশেষে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরছিল আর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কালো করগেটেড টিন

(প্রায়ই বস্তি এলাকায় ছাদের জন্যে ব্যবহার করা হয়) তুলে কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা দেখছিল।

প্রায় প্রত্যেকটি গাড়িই হয় লোকজন নিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল নয় রেডক্রসের পতাকা উড়িয়ে মৃত এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল।

তারিমধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সৈন্যদের কনভয়গুলো দেখা দিত। কনভয়গুলোতে সৈন্যরা চোখ মেলে দেখছে, হাসির লেশমাত্র নেই, বোবা, স্তব্ধ জনতার দিকে, বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরে।

শনিবার বিকেল চারটায় রাস্তা-ঘাট আবার খালি হয়ে গেল। সৈন্যরা আবার বেরিয়ে এলো আর নিস্তব্ধতা আবার ডানা মেলে দিলো ঢাকার ওপর। কিন্তু প্রায় সাথে সাথে আবার গুলিবর্ষণ শুরু হলো। ''চারটের পর যে বের হবে তাকেই গুলি করা হবে'' সেদিন আরো রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল।

কার্ফুর দু'মিনিট পর ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ছোট ছেলে দৌড়ে যাচ্ছিলঃ তাকে থামিয়ে একজন অফিসার গালে চার বার চড় কষালো—তারপর জীপে করে নিয়ে গেল।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে স্থাপিত 'বার' ঢাকা-ক্লাবের নৈশ পাহারাদারকে গুলি করা হয়—যখন সে ক্লাবের গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল। একদল হিন্দু পাকিস্তানী বাস করতো রেস-কোর্সের মধ্যেকার মন্দিরে। তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। মনে হয় তারা বাইরে ছিল বলেই প্রাণ হারায়।

বাস্তুত্যাগীরা ফের শহরে ফিরে আসতে লাগলো—কারণ বের হওয়ার পথগুলো সেনাবাহিনী আটকে দিয়েছিল। তারা এসে জানালো সৈন্যদের এড়িয়ে গ্রামে যাওয়ার সময় কতোজনকে হত্যা করা হয়েছে।

বহুলোক রাস্তা ছেড়ে নদী পথে রওয়ানা হয়েছিল—কিন্তু তাদের সামনে অন্য বিপদের ঝুঁকি ছিল। যখন কার্ফুর সময় হতো তখন নৌকা না পেয়ে অনেকে আটকে যেত। শনিবার বিকেলে তখন এক দল আটকে গিয়েছিল—পরদিন সকালে সেখানে শুধু রক্তের দাগ খুঁজে পাওয়া গেছে।

কোথাও শৃংখলাবদ্ধ প্রতিরোধের চিহ্ন নজরে পড়ছে না।

''ঐ সব হারামীরা''—বললো একজন পাঞ্জাবী লেফটেন্যান্ট ''চেষ্টা করলেও আমাদের মারতে পারবে না''। ''অবস্থা এখন অনেক ভালো'' —জানালো একজন অফিসার ''কেউ কথা বলতে পারছে না বা বের হতে পারছে না। আর তারা যদি তা' করে তবে তাদের হত্যা করবো—তারা অনেক বকেছে—তারা সব বিশ্বাসঘাতক; আমরা নই। আমরা আল্লাহ্ এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে যুদ্ধ করছি।''

পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের
এখনও পদানত রাখতে চায়

নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর সংবাদদাতা সিডনি. এইচ. শ্যানবার্গ উপরোক্ত শিরোনামে ১৯৭১ সালে ১৪ই জুলাই তাঁর পত্রিকায় লেখেনঃ

এখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীর প্রায় শূন্য রাস্তায় সেনাবাহিনীর ট্রাক গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। ঐ-সব ট্রাকে ভর্তি বন্দীরা। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কঠিন শ্রম করবার

জায়গাগুলোতে। তাদের মাথা কামানো—তাদের পায়ে কোন জুতো নেই—পরনে শুধু জাঙ্গিয়া—সব মিলিয়ে পালানোটা দুরুহ।

প্রতিদিন রাজধানী ঢাকার বিমান বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্লেনগুলো উড়ে আসতো। প্লেনগুলো সৈন্য ভর্তি—পরনে তাদের উপজাতীয়দের মত ঢোলা পাজামা—যাতে করে তারা সহজে ধরা না পড়ে।

বাঙালি সংস্কৃতিকে দখল করার অভিযানের একটি অংশ হিসেবে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুদের নামাংকিত রাস্তাগুলোর নাম পাল্টে দেয়া হচ্ছে। শাঁখারী বাজার এখন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্ণর ও লেফটেন্যান্ট জেনারেলের নামানুসারে ''টিক্কা খান রোড'' যাকে বাঙালিরা নাম দিয়েছে ''কসাই'' বলে।

অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে এগুলো হলো কয়েকটি—যেগুলো এই সংবাদদাতা পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক সফরের সময় দেখেছেন। পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা এই অঞ্চল তাদের দখলে রাখতে এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পদানত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পঙ্গু অর্থনীতি, সরকারী প্রশাসনের ভাঙ্গণ, বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতা-ক্রমবর্ধমান সৈনিকদের মৃত্যু এবং বিচ্ছিন্ন বিষন্ন জনসধারণের নীরব প্রতিবাদ সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা অমন করছে। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে সরকার দু'টি ৭০৭ বোয়িং ভাড়া নিয়েছিল এক বছরের জন্যে-কোন একটি আইরিশ মালিকানাধীন বিমান সংস্থা থেকে। ঐ বিমান সংস্থার নাম 'ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজ'। বিমান দুটো ভাড়া করা হয়েছিল সত্তর হাজার থেকে আশী হাজার সৈনিক বৃদ্ধি এবং হতাহতদের স্থান পূরণের জন্যে।

প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর আগমন ছাড়াও, কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানীদের জায়গায় কাজ করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আনছে। দায়িত্বশীল কাজের জন্যে কোন বাঙালিকে বিশ্বাস করা হচ্ছে না, এমনকি ঢাকা বিমান বন্দরে যে লোকটি ঘাস কাটে সেও অবাঙালি।

বাঙালি ট্যাক্সি ডাইভার প্রায় নাই। তাদের চাকুরিগুলো দেয়া হয়েছে ভারত থেকে আগত অবাঙালি মুসলমান বাস্তুত্যাগীদের—যেমন বিহারী, যারা নিজেদের পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে একাত্ম মনে করে। সরকারের পক্ষাবলম্বনও করছে তারা এবং খোঁজ-খবর দিয়ে সামরিক বাহিনীর বেসামরিক কাজ চালাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলা ভাষা ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করছে এবং বাংলার পরিবর্তে নিজেদের ভাষা উর্দুকে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছে। সৈন্যরা অবজ্ঞাভরে বাঙালিদের বলে—তাদের ভাষা সভ্য জাতির ভাষা নয়—এবং তারা যদি ঠিক-ঠাক মতো বেঁচে-বর্তে থাকতে চায় তবে তাদের ছেলে মেয়েদের উর্দু শেখানো উচিত। ব্যবসায়ীরা ভয়ে তাদের বাংলা সাইনবোর্ড ইংরেজীতে পাল্টিয়ে নিচ্ছে; তারা উর্দু জানে না।

সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী নতুন এক প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে যাকে সহজ কথায় বলা যায় ''অনুগত'' নাগরিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার শান্তি কমিটির সদস্য। বিহারী এবং অন্যান্য অবাঙালি, উর্দুভাষী মুসলমান ছাড়াও এই কমিটিতে আছে অল্পসংখ্যক বাঙালি মুসলমান—যারা বহুদিন থেকে সামরিক বাহিনী অনুরাগী ডানপন্থী ধর্মীয় দল, যেমন মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক।

বাংলাদেশের প্রতি অনুগত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাথমিক স্তরের প্রতিরোধ সংগ্রাম স্বল্পকালের মধ্যেই স্তব্ধ করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম বর্তমানে

নবশক্তি সঞ্চয় করছে ভারতীয় সীমানার আশ্রয়স্থল থেকে। নতুন লোক এবং সরবরাহ নিয়ে ভিয়েতনামী কায়দায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করছে বাঙালিরা এখন, যা সামরিক বাহিনীতে ক্রমবর্ধমান ত্রাসের সঞ্চার করছে।

পূর্ব পাকিস্তানের দূরাতিগম্য জায়গায় যে-সব বিদেশী মিশনারীরা আছেন তাঁরাও প্রতিদিন নতুন নতুন হত্যাযজ্ঞের কাহিনী জানাচ্ছেন। জনৈক মিশনারী জানিয়েছেন—দক্ষিণে বরিশাল জেলায় সম্প্রতি সেনাবাহিনী একদিনে এক হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছে। আরেকটি বিবরণীতে বলা হয়েছে—উত্তর পূর্বে সিলেট জেলায় একটি শান্তি কমিটি কোন এক অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার নাম করে জনসভার আহ্বান জানায়। সবাই যখন সভায় উপস্থিত হলো—তখন তিনশো জন হিন্দুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গুলি করে হত্যা করা হলো।

যখনই একজন বাঙালি প্রকাশ্যে একজন বিদেশীর সাথে কথা বলছে তখনই ধরে নিতে হবে সে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে। ফেরী পার হবার সময় বাঙালিরা এই সাংবাদদাতার গাড়ির কাছে এসে চুঁপি চুঁপি সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার সংবাদ দিয়েছে, অথবা মৃদু হেসে মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের অভিযানের সংবাদ জানিয়েছে।

যখনই ছ'সাত জন লোক একত্রিত হয় তখনই সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী একজন সৈন্য বা পুলিশ এসে বাঙালিদের গালি-গালাজ করে ও তারাও সরে পড়ে।

সামরিক বাহিনী ও তাদের চরদের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাঙালিরা বিদেশীদের গাড়ীতে একটুকরো কাগজে 'নোট', লিখে ফেলে দিয়ে বা গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে তাদের কাহিনী শোনাবার পথ করে নিচ্ছে।

ঢাকা থেকে অনতিদূরে এক শহরে এমনি এক সাক্ষাতকারে এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন যে—তাঁকে একদিন বিনা কারণে সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়, তাঁর টাকা-পয়সা এবং ঘড়ি কেড়ে নেয় ও অলৌকিকভাবে মুক্তি পাওয়ার আগে তাঁকে পুলিশ থানায় নিয়ে রাত্রির জন্যে জেলে রাখে।

ব্যবসায়ীটি জানিছেন, সারা রাত তিনি প্রার্থনা করে ও দেয়ালে পূর্ববর্তী বন্দীদের লেখা পড়ে কাটিয়েছেন। লেখাগুলো, তিনি জানিয়েছেন. সব একই রকমের; নিজের নাম ও বন্দীর ঠিকানা ও তার গ্রেফতারের তারিখ দেয়া আছে এবং সাথে লেখা আছে, ''আমি হয়ত নাও বাঁচতে পারি। দয়া করে আমার পরিবার-পরিজনকে বলবেন আমার ভাগ্যে কি ঘটেছিল।''

এখন পর্যন্ত তাদের একজনেরও খবর পাওয়া যায়নি—ব্যবসায়ীটি বললেন।

সেনাবাহিনী গণহত্যার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে ধ্বংসকরণও সাধন করেছে বিষয়-সম্পত্তির। গ্রামের দিকে কখনও কখনও এক টানা মাইলের পর মাইল রাস্তার দু'পাশের গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে মাটির সাথে সমান করে দেয়া হয়েছে। শহরের এবং নগরের বিরাট এলাকা প্রবলভাবে গুলি বর্ষণ করে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছে।

বাঙালিরা বলছে, সেনাবাহিনী শুধু শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে ধ্বংস করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী বলছে—তাদের দিকে গুলি ছোঁড়া না হলে তারা গুলি ছোঁড়ে না, কিন্তু কিছু কিছু ফিল্ড কমাণ্ডাররা গর্ব করে বলেন—প্রায় শহরগুলোতে হয় সামান্য প্রতিরোধ ছিল নয় ছিল প্রতিরোধহীন।

কেন এই ধ্বংসযজ্ঞ?—তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়। তাদের বাঁধাধরা জবাব, এ-সব কিছু করছে ''দুস্কৃতিকারীরা।''

যদিও অনেক বাঙালি জনবহুল অঞ্চলগুলোতে ফিরে আসছেন, প্রায় শহরগুলোতে আসল জনসংখ্যার হয় অর্ধেক নয় অর্ধেকেরও কম লোক আছে এবং কিছু কিছু অঞ্চলে যেমন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে—লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে।

অযত্নের ফলে ধানের ক্ষেতগুলোকে আগাছা ঢেকে দিচ্ছে। পাট ক্ষেতে যেখানে আগে দিনে ডজন খানেক মজুর কাছ করতো এখন সেখানে কয়েকটি নুয়ে পড়া পিঠ মাত্র নজরে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের পাট দিয়ে মজবুত থলে প্রস্তুত করা হয় এবং ঐ পাট হলো জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন ও একমাত্র প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রব্য। যে সব চিহ্ন এখন পরিস্ফুট তাতে দেখা যায় সামনের ফসল আশংকাজনকভাবে কম হবে।

আর ফসল যদি ভালোও হয় তবুও পাটের কারখানাগুলো কাজ করতে পারবে না, কেননা তাদের অধিকাংশ দক্ষ শ্রমিক পালিয়ে গেছে। তাদের উৎপাদন অত্যন্ত কম।

নদীপথে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অব্যাহতঃ নৌ চলাচল বন্ধ ও উৎপাদিত পাট মিলে যাতে পৌঁছাতে না পারে তার জন্যে তারা সচেষ্ট। যশোর-খুলনা অঞ্চল বা পাটে সমৃদ্ধ এলাকাগুলো—সেখানে ইতিমধ্যে তারা কয়েকটি পাটের বার্জ ডুবিয়ে দিয়েছে।

কিছু কিছু অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি ক্রমশঃই চরম আকার ধারণ করছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে—সামরিক বাহিনী যদি বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার জোড়া লাগাতে না পারে তবে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা বোধ হয় সম্ভব হবে না। কেননা বাঙালিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ক্রমেই দুর্বার আকার ধারণ করছে। যদিও ঐ প্রতিরোধ এখনও বিশৃংখল তবুও মনে হচ্ছে—ভারতের আশ্রয় সাহায্য এবং কোন কোন সময় সহায়ক গোলাবর্ষণের সুযোগে ঐ প্রতিরোধ ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছে।

হাজার হাজার তরুণ বাঙালিকে ভারতীয় সীমানার ভিতর গেরিলা যুদ্ধ ও ধ্বংসকরণের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ভারতীয়রা এ ব্যাপারে অনেক প্রশিক্ষক দিয়ে সাহায্য করছে। নতুন গেরিলাদের প্রথম দল এখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসছে।

রাস্তা ও রেলসেতু এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্রগুলো উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এই সব ধ্বংসকরণের কাজে গেরিলারা সবিশেষ নৈপূণ্য প্রদর্শন করছে। রাস্তায় মাইন একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাদসতর্ক সেনাবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করার জন্যে স্থানীয় ঠিকাদারদের পাচ্ছে না— সুতরাং তারা শ্রমিকদের জোর করে ধরে এনে কাজ করাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে ফল হচ্ছে না।

কুমিল্লার বাইরে, কিছুদিন আগে গেরিলারা একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর প্রহরায় একটি মেরামতকারী ট্রেন পাঠানো হয়। গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ ট্রেন আক্রমন করে—ফায়ারম্যানকে হত্যা করে—এবং একজনকে বন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। ট্রেনটি দ্রুত শহরের দিকে ফিরে আসে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক গ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

২. একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭।

৩. একাত্তরের স্মৃতি, বাসন্তি গুহ ঠাকুরতা, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১।

৪. মুক্তিযুদ্ধঃ আগে ও পরে, পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।

৫. স্মৃতিঃ ১৯৭১, রশীদ হায়দার সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

৬. ১৯৭১ঃ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, রশীদ হায়দার সম্পাদিত, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।

৭. একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের বিচার, মোস্তাক হোসেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত নিবন্ধ।

৮. একাত্তরের ঘাতক জামাতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান, শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৯।

৯. বাংলা নামে দেশ, অভীক সরকার সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৭২।

১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা, শাহ আহমেদ রেজা কতৃক রচিত ও সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত নিবন্ধ।

১১ বাংলাদেশঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'বাংলাদেশ' স্মারক গ্রন্থ ১৯৭২-এ প্রকাশিত।

১২. বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলন, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, 'বাংলাদেশ' স্মারক গ্রন্থ ১৯৭২-এ প্রকাশিত।

১৩. জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ এণ্ড ওয়ার্লড প্রেস, ফজলুল কাদের কাদরী।

১৪. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ভলিউম ১,২, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, নয়াদিল্লী।

১৫. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন।

১৬. বাংলাদেশে গণহত্যা—বিদেশীদের চোখে, সংকলন ও সম্পাদনা, খোন্দকার গোরাম মুস্তফা, মুনতাসির মামুন অনুদিত।